বক্তৃতা

অর্থাৎ

হিন্দুধর্ম্মের অদ্বিতীয় বক্তা,

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর

বক্তৃতা সংগ্রহ।

৫ নং মদন দত্তের লেন হইতে

শ্রীভূদেব কবিরত্ন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

ও প্রকাশিত।

৫ম সংস্করণ।

(১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড একত্রে)

কলিকাতা,

৩৮ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, "সিদ্ধেশ্বর-যন্ত্রে"

শ্রীসিদ্ধেশ্বর পান দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৭।

সূচিপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা
অন্ধের যষ্টি	১
তৃষ্ণার জল	২২
প্রবৃত্তিমার্গ	৪৫
ভারতে উৎসব	৬০
নিজনিকেতন যাত্রা	৮১
আঁধারের মাণিক	১০২
ভিখারির সম্পত্তি	১২৩
বিসর্জ্জন	১৫৪
সাজ ও কায	১৬৩
মা আমার মাতা কি পিতা?	২০২

অন্ধের যষ্টি।

চক্ষুষ্মান্ ও অন্ধের প্রভেদ এ জগতে চিরদিনই আছে। চক্ষুষ্মানের কাছে অন্ধ চিরদিনই পদানত। চক্ষুষ্মান্ স্বয়ং চক্ষে দেখিয়া বস্তু বিচার করেন, অন্ধ কেবল শোনা কথায় ভরসা রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হন। সুতরাং প্রভেদ বিস্তর। চক্ষুষ্মানের কথা অদ্য আমরা বলিব না। আমরা নিজে অন্ধ, তাই আমাদের নিজের শ্রেণীর কথাই বলিব। কত কাল ধরিয়া, কত দিন ধরিয়া, কত যুগ যুগান্ত ধরিয়া এ জগতে অন্ধ হইয়া আমরা ঘুরিতেছি, তাহা জানি না। কেহ কেহ বলেন, মাতৃগর্ভেই আমরা অন্ধ ছিলাম, এখন চক্ষুষ্মান্ হইয়াছি, আমি তাহার বিপরীত বুঝি। আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলেন, মাতৃগর্ভে শয়িত হইয়া শিশু অন্তশ্চক্ষুঃ উন্মীলন করিয়া, পরম দেবতার দিকে তাকাইয়া থাকে। তবে তখন শিশু অন্ধ কেমন করিয়া? যে দিন হইতে মাতৃগর্ভস্খলিত হইয়াছি, আমরা সেইদিন হইতেই অন্ধ, ইহাই ঠিক কথা। আমার গুরুদেব বলিয়াছেন, যদি দেখিতে চাও, ত চক্ষু মুদিত কর, আর যদি অন্ধ হইতে সাধ যায়, তাহা হইলে চক্ষুরুন্মীলন কর। ইহাই চক্ষুষ্মান্ ও অন্ধের লক্ষণ। দেখিবার বস্তু চক্ষু খুলিলে দেখা যায় না, কিন্তু মুদিলে দেখা যায়, এ বড় বিষম প্রহেলিকা। কথাটা তলাইয়া বুঝিতে হইবে। আমাদের চক্ষুর

সম্মুখে যাহা পড়িতেছে, তাহা মুহুর্মুহুঃ পরিণামী, মুহুর্মুহুঃ বৈষম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, ইহা দার্শনিক সত্য। প্রাকৃতিক জগৎ কখনই এক অবস্থায় স্থির থাকিয়া দাঁড়াইতে পারে না, পলে পলে পরিণামের ঘর্ঘরচক্রে কেবলই বিভিন্ন বিভিন্ন অবস্থায় ঘুরিতেছে। এই যাহা ছিল, পরক্ষণে তাহা নাই, কল্য যাহা ছিল, তাহা অদ্য নাই। অতীতে যাহা ছিল, তাহা বর্ত্তমানে নাই, বর্ত্তমানে যাহা রহিয়াছে, তাহা ভবিষ্যতে থাকিবে না। এই ছিল এই নাই। এই দেখিতে দেখিতে এই অন্যরূপ হইয়া গেল। কেবলই নূতন, কেবলই নূতন, কেবলই চঞ্চল, কেবলই চঞ্চল। এখন দেখুন, বিস্ফারিত চক্ষু যে বাহ্যজগৎকে দেখিবে, তাহার অবিরল পরিবর্ত্তন তাহাকে স্থিরভাবে দেখিতে পারে কৈ? এই যাহাকে দেখিল, পরক্ষণে আর তাহা নাই। এই বিদ্যুতের ন্যায় দেখিতে দেখিতে তাহা অদৃশ্য হইল, বিভিন্ন বস্তু আসিল, আবার তাহাও অদৃশ্য হইল। আবার আসিল, আবার অদৃশ্য। ইহার নাম কি দেখা? বাজিকরের অঙ্গুলির উপর কোন গোলাকার পদার্থ তীব্রতেজে ঘুরিলে দৃষ্টি যেমন তাহাকে স্পষ্টরূপে ধরিতে পারে না, কেবল একটা রেখার মত তাহাকে অস্পষ্টভাবে দেখে, সেইরূপ কুহকী বিরাট-ঐন্দ্রজালিকের নখাগ্রে পরিণাম-চক্রে বিঘূর্ণিত এ ব্রহ্মাণ্ডের বস্তুর যথার্থস্বরূপ স্পষ্টরূপে আমাদের চক্ষুর গোচরীভূত হইতেই পারে না। ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক বিকাশ দর্শনে যেমন তৃপ্তিলাভ হয় না, সেইরূপ অবিরত পরিবর্ত্তনময় পদার্থ দর্শনে নেত্র তৃপ্ত হইতে পারে কৈ? চক্ষু যাহাকে সুন্দর দেখিয়া আবার দেখিতে গেল, অমনি তাহা পরিণতির নিয়ম-কৌশলে

অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইল। চক্ষু যাহা ভাল বলিয়া দেখিয়াছিল, তাহা আর সেরূপ রহিল না; চক্ষুর সাধ মিটিল না। একটা গল্প মনে হইতেছে—কোন একটি নবাবের বাড়ীতে একটি ফকির উপস্থিত হইয়াছিলেন। নবাব বিশেষ সৎকারপূর্ব্বক তাঁহার আদর অভ্যর্থনা করিলেন। অনন্তর ভোজনের সময় নবাব তাঁহার সহিত একসঙ্গে বসিলেন। নবাবী চাল এক অদ্ভুত ব্যাপার। ফকিরকে খাওয়াইবার জন্য অতি উপাদেয় তিন শত রকমের ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা হইযাছে। বাবুর্চ্চি এক একটী ব্যঞ্জনের পাত্র ফকিরের থালের কাছে দেয়, যাই ফকির তাহা একবার খান, আর অমনি তাহা নবাবী রীতি অনুসারে উঠাইয়া নূতন ব্যঞ্জন-পাত্র রাখিয়া দেয়। এইরূপ তিনশত রকমের ব্যঞ্জন এক একবার চাকিতে চাকিতে ফকিরের উদব পুরিয়া গেল। ফকির ভোজন সমাপ্ত করিয়া, আচমন করিলেন। আচমনান্তে নবাব ফকিরকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, কেমন, ভোজন করিয়া তৃপ্তি হইল ত? ফকির উত্তব করিলেন, এমন দুঃখের ভোজন আর আমি কখনও করি নাই। যে ব্যঞ্জনটিই খাই; তাহাই উপাদেয়, যাই তাহা পুনরায় খাইতে ইচ্ছা হয়, আর অমনি তাহা উঠাইয়া নূতন ব্যঞ্জন দেওয়া হয়। আশা মিটাইয়া কোনটিই খাইতে পাইলাম না। সুতরাং ভোজনে তৃপ্তি হইল না। ফকিরের এ কষ্টময় ভোজনে এ অবিরত ব্যঞ্জন পরিবর্ত্তনে যেমন কিছুমাত্র তৃপ্তি নাই, সেইরূপ জগতের পদার্থপুঞ্জের অবিরত পরিবর্ত্তনে একটার পরক্ষণেই আর একটার দর্শনে নেত্রের কিছুমাত্র তৃপ্তি নাই। যাহাতে স্থৈর্য্য নাই, অস্পষ্টভাবের কুয়াসা যাহাকে ঘিরিয়া আছে,

তৃপ্তির পরিবর্ত্তে যাহা অতৃপ্তির ফোয়ারা খুলিয়া দেয়, সে দেখা দেখাই নয়। যে দেখা দেখিলে আর দেখিবার সাধ থাকে না, তাহাই প্রকৃত দেখা। যেখানে পরিণামে কণিকা নাই, চাঞ্চল্যের ছায়া নাই, প্রাণ ভরিয়া বুক পূরিয়া, স্থিরভাবে চিরদিন যাঁহাকে দেখিতে পাইব, যাঁহার দর্শনের বিচ্ছেদ নাই, বিরাম নাই, অনবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় যে সুধাধারা হৃদয়মন্দিরে প্রবাহিত হইতেছে, সেই নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় নিথর নিস্তরঙ্গ দিব্য পুরুষের দুর্লভ দর্শনই প্রকৃত দেখা। তাই যোগী বলিয়াছেন, যদি দেখিতে হয়, ত চক্ষুযুগল মুদিত কর। আমাদের চক্ষু চিরদিনই বিস্ফারিত, মুদিত করিয়া কি দেখিতে হয় তাহা জানি না। সুতরাং যাহা দেখিবার, তাহা ত দেখা হইল না। আর যাহা (বাহ্যজগৎ) দেখিতেছি, তাহা ত প্রাণ ভরিয়া সাধ মিটাইয়া স্থিরভাবে দেখিবার যো নাই। অতএব আমরা অন্ধ। চক্ষু থাকিতে অন্ধ। জগতের চারিদিকে মনোমোহন পদার্থের ডালি সাজন আছে, ইহার মধ্যে যাহা দেখিলে আর দেখিতে হইবে না, দেখিবার সাধ মিটিয়া যায়, পিপাসা ছুটিয়া যায়, কামনা পূরিয়া যায়, হায়! তাহা না দেখিয়া অন্য সামগ্রী দেখিয়াই সময় কাটাইলাম। এ বড় পরিতাপ! যাত্রা শুনিতে আসিয়া যদি গল্প করিয়া সময় কাটাই, তাহা হইলে যাত্রা শুনা হয় কৈ? সময় বৃথা যায়, সেইরূপ আমাদের চক্ষু দুইটি বৃথা। সুতরাং আমরা অন্ধ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা নিজে অন্ধ। সুতরাং অন্ধের কথাই বলিব। চক্ষুষ্মান্‌দিগকে এ মণ্ডলীতে টানিয়া আনি-

না। সৎসঙ্গ ও বিবেকরূপ দুইটি জলন্ত চক্ষু দিয়া যাঁহারা দেখেন, তাঁহারা মহাত্মা মহাপুরুষ।

"সৎসঙ্গশ্চ বিবেকশ্চ নির্ম্মলং নয়নদ্বয়ম্।
যস্য নাস্তি নরঃ সোঽন্ধঃ কথং নাপুত্মার্গগঃ॥"

সে সমস্ত ঋষিদের যাহা আশ্রয়, যাহা করণীয় কার্য্য, অন্ধ সে দিকে যাইতে পারে না। এ ঘোর কলিযুগে সৎসঙ্গ ও বিবেক উভয়ই আমাদের দুর্ল্লভ। সৎসঙ্গের কথা মুখে বলি বটে, কিন্তু কাজে হওয়া বড় কঠিন। কথাটা কাটিয়া কুটিয়া দেখা যাক্। প্রকৃত সাধুকে চেনা বড় সহজ নয়। আমি লেখা পড়া শিখিয়াছি, তর্কাভিমান আমার বিলক্ষণ আছে। সাধুকে চিনিতে তর্কই আমার প্রধান অবলম্বন। তর্কের দ্বার দিয়াই আমি তাঁহাকে বুঝিতে চাই, কিন্তু সাধু তর্ক করিতে নারাজ, তাঁহার কি দায় পড়িয়াছে, যে তিনি আমার সহিত বৃথা বকিয়া মরিবেন। খানিকক্ষণ বকিয়া তিনি নীরব হইলেন। আমি বুঝিলাম, তিনি আমার কাছে পরাস্ত হইয়াছেন, সুতরাং তিনি আমা হইতে অসাধু। এইরূপে হয়ত কত পরম সাধুকে অসাধু বোধে ছাড়িয়া শেষে এক পরম ভণ্ডকে সাধু বলিয়া ধরিয়া বসি। পুষ্করিণীতে কাঁকড়া ধরিতে গিয়া হয়ত সাপের গর্ত্তে হাত দিয়া ফেলি। সুতরাং সাধু চেনা বড় বিভ্রাট। সাধুর কাছে হয়ত গেলাম, কিন্তু তাঁহার কোন্‌টুকু সৎ, তাহা বুঝা বড় শক্ত কথা। সাধুর রক্তমাংসময় শরীর, বুদ্ধি, জ্ঞানোপদেশ, সাধনা, শাস্ত্রকথা, এ সমস্তের মধ্যে কোন্‌টুকু সৎ, তাহা বাছিয়া লওয়া আমাদের মত অন্ধের সামর্থ্যবহির্ভূত। হয়ত গোটাকতক শুষ্ক জ্ঞানোপদেশ লইয়াই সাধুর কাছ

হইতে ঘরে ফিরিলাম। ভাবিলাম ইহারই নাম সাধুসঙ্গ। তাহা ভুল। গোটাকতক জ্ঞানোপদেশই যদি তাহার ফল হয়, তাহা ত পুস্তকেও আছে। সুতরাং সাধুসঙ্গ বিভিন্ন বস্তু; শাস্ত্র, মহিষের দৃষ্টান্তে প্রকৃত সাধুসঙ্গ বুঝাইয়াছেন। কতকগুলা মহিষ মশকের—দংশকের দংশনে অস্থির হইয়া জলে গিয়া পড়ে। জলে গা ডুবাইয়া পুনরায় মাটিতে উঠে। ভাবে, দংশকের কামড় হইতে বুঝি পরিত্রাণ পাইলাম। কিন্তু যাই গায়ের জল শুকাইয়া যায় আর পুনরায় দংশকে ছাঁকিয়া ধরে। যে জ্বালায় পূর্ব্বে জ্বলিতেছিল, সেই জ্বালাতেই জ্বলিতে থাকে। কিন্তু যে সমস্ত মহিষ চতুর, তাহারা পুষ্করিণীর জলে কেবল গা ডুবাইয়াই ক্ষান্ত হয় না, পুষ্করিণীর কর্দ্দমে লুটোপুটি খাইয়া নিজ অঙ্গে কর্দ্দম লিপ্ত করে। মশক সে পঙ্কলিপ্ত অঙ্গে বসিয়াও দংশন করিয়াও তাহার কিছু করিতে পারে না। তাহারই জ্বালা মিটে যন্ত্রণা ছুটে। সেইরূপ সংসারের জ্বালামালায় পরিতপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি শীতল সাধুসঙ্গ-সরোবরে অবগাহন করিয়া সাধুর ভাব-কর্দ্দমে আপ্লুত হইতে পারেন, তাঁহারই প্রাণের জ্বালা মিটে, তিনিই প্রকৃত সাধুসঙ্গী। অচতুর মহিষের মত যিনি সাধুর পবিত্র শক্তিতে মাখা চোকা না হইতে পারেন, দিব্য তেজে অনুপ্রাণিত না হইতে পাবেন, তাঁহাব সাধুসঙ্গ ব্যর্থ। তাঁহার জ্বালা চিরদিনই সমান, ত্রিতাপের অগ্নিশিখা চিরদিনই তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকে। সাধু যেখানে বাস করেন, সেখানকার স্থানীয় প্রকৃতি পবিত্র, সেখানকার যে আকাশমণ্ডল, তাহা দিব্যতেজে পরিপূর্ণ। সেখানে যে বাতাস বয় তাহাতে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, শরীর জুড়াইয়া যায়। গৌরাঙ্গ-

দেব বলিয়াছিলেন, "আয় রে মাধাই কাছে আয়, হরিনামের বাতাস লাগুক গায়।" সেইরূপ সাধুর গায়ের বাতাস লাগিলে জীবন ধন্য হয়। নিদাঘের নিদারুণ রৌদ্রে বিশুষ্ক হইয়া বৃক্ষ যখন জিয়ন্তে মরার মত দাঁড়াইয়া থাকে, এমন সময়ে বসন্তের প্রাণ মনোমোহন মলয় মারুত বহিলে বৃক্ষের চারিদিকে পুট পুট করিয়া ফল ফুল পল্লব যেমন গজাইয়া উঠে, সেইরূপ সাধুর পবিত্র সমীরণ লাগিয়া জীবের বিশুষ্ক হৃদয়-তরুর গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে সন্ধিতে সন্ধিতে যদি নব নধর ফুলরাজি ফুটিয়া উঠে, তবেই তাহার নাম প্রকৃত সাধুসঙ্গ। সাধুর যে উপদেশ পাইলে আর উপদেশ দিতে ইচ্ছা হয় না, তর্ক প্রবৃত্তি, জিগীষা, অভিমান চূর্ণ বিচূর্ণ হইযা যায়, বিরলে বসিযা নীরবে প্রকৃত কার্য্যের দিকে দৃষ্টি হয়, তাহাই প্রকৃত সাধুর উপদেশ। একটা গল্প বলিতেছি। রেওয়া রাজ্যের কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। সেই রাজ্যেব অধিপতির একজন কুলগুরু পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র কাশী হইতে গীতাদি শাস্ত্র পড়িয়া দেশে আসিলেন। রাজসভায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমি গীতাদি সম্বন্ধে পণ্ডিতদিগের সহিত বিচার করিতে চাই। যদি কেহ এ বিষযে ইচ্ছুক থাকেন, তিনি আসুন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কাশীতে কাহার কাছে গীতা পড়িয়াছেন? উত্তর হইল, কোন দার্শনিক পণ্ডিতেব কাছে। রাজা বলিলেন, আপনি প্রথমে কোন ভাল সাধুর কাছ হইতে গীতা পড়িয়া আসুন, তবে আপনার শাস্ত্রার্থ শুনিব। ব্রাহ্মণযুবক মনে মনে বিরক্ত হইয়াও কি করেন, রাজ-আজ্ঞা বলিয়া পুনরায় কাশীতে পড়িতে চলিলেন। পড়িয়া শুনিয়া পুনরায় দেশে আসিয়া রাজসভায়

বিচারের জন্য গেলেন? রাজা তখনও বলিলেন, আপনি পুনর্ব্বার পাঠার্থ গমন করুন। কোন প্রকৃত সাধুর কাছ হইতে আরও একটু ভাল করিয়া পড়িয়া আসুন। ব্রাহ্মণযুবক আবার পড়িতে চলিলেন, এবার পড়িয়া যখন দেশে ফিরিলেন তখন আর রাজসভায় গেলেন না। বাড়িতে বসিয়া আপনারই মনে আপনারই তানে তিনি গীতা অধ্যয়নে মগ্ন রহিলেন। বহুদিনান্তে রাজা সেই ব্রাহ্মণযুবকের পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার পুত্র এখনও পড়া সাঙ্গ করিয়া বাড়ি আসেন নাই কি? ব্রাহ্মণ বলিলেন, হাঁ বাড়ি আসিয়াছে বটে, কিন্তু সে রাজসভায় আসিতে চাহে না। ঘরে বসিয়া সে কেবল গীতাপাঠই করে। রাজা মনে মনে বুঝিয়া বলিলেন, আচ্ছা তিনি না আসুন, আমিই তাঁহার সহিত অদ্য দেখা করিতে যাইব। রাজা গুরুগৃহে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, গুরু-পুত্র তগদ্গতচিত্তে গীতাপাঠে নিমগ্ন। রাজার দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি যে সাগরে ডুবিয়াছেন, যে রসে মজিয়াছেন, যে অমৃতধারা পান করিতেছেন তাহা ছাড়িয়া বাহিরের দিকে তাঁহার চিত্ত যাইবে কেন? রাজা অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, এবার আপনি রাজসভায় বিচারের জন্য যান নাই কেন? উত্তর হইল, আমি যে এবার সাধুর নিকট হইতে ভাল করিয়া গীতা পড়িয়া আসিয়াছি। রাজা পরিতৃপ্ত হইয়া বলিলেন, এতদিনে আপনার ঠিক গীতা পড়া হইয়াছে। রাজা সন্তুষ্টচিত্তে একখানি জায়গীর তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণযুবক যে সাধুসঙ্গ করিয়াছিলেন, সাধুর কাছ হইতে যে উপদেশ পাইয়াছিলেন, সাধুর নিকটে থাকিয়া পড়িবার সময় সাধুর যে পবিত্র শক্তির

সঞ্চার তাঁহাতে হইয়াছিল, তাহাই প্রকৃত সাধুসঙ্গ, তাহাই প্রকৃত সাধুর উপদেশ। সাধুর কাছ হইতে গোটাকতক জ্ঞানের ভুয়া উপদেশ শুনিলেই আর সাধুসঙ্গ হয় না। এ সাধুসঙ্গ বড় কঠিন। আর প্রকৃত বিবেকজ্ঞানও এ কলিযুগে দুর্লভ ব্যাপার। আমরা সৎসঙ্গ ও বিবেকজ্ঞান এই দুইটি চক্ষু হইতেই বঞ্চিত। সুতরাং আমরা অন্ধ। আমরা সাধ করিয়াই অন্ধ হইয়াছি—সাধ করিয়াই দুটি চক্ষুর মাথা খাইয়াছি। একটা মাতালের গল্প মনে হইতেছে। ইংলণ্ডের কোন একজন মাতালের অতিরিক্ত মদ্যপান জন্য চক্ষের পীড়া হয়। মাতাল ডাক্তারের কাছে ঔষধের ব্যবস্থা চায়। ডাক্তার বলিলেন, তোমাকে নূতন কিছু ঔষধ সেবন করিতে হইবে না। তোমার নিজ হইতে কিছু ছাড়িলেই হইবে। তোমাকে মদ্যপান ত্যাগ করিতে হইবে। মাতাল বলিল, মদ্যপান না ছাড়িলে ঔষধ সেবনে চক্ষুর পীড়া আরাম হইবে না? উত্তর হইল, কিছুতেই না। মাতাল বলিল, Then Good bye to my eyes. চোখ যায় যাক,' মদ ছাড়া এ হাড়ে হইবে না। মাতাল অতিরিক্ত মদ্যপানে চক্ষু দুটি হারাইল। আমরাও সেইরূপ মোহ-মদিরায় উন্মত্ত হইয়া চক্ষু দুইটি (সৎসঙ্গ ও বিবেক) হারাইয়াছি।

"পীত্বা মোহময়ীং প্রমাদ মদিরামুন্মত্তভূতং জগৎ।"

সাধারণ মাতালের মধ্যে কেহ বা দুই বৎসর কেহ বা দশ বৎসর কেহ বা চিরজীবন মদ খায়, ইহার বেশী নহে। কিন্তু আমরা তাহা অপেক্ষাও ঘোর মাতাল। আমরা জন্ম জন্মান্তর হইতে মদ খাইতেছি। চতুরশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া আমরা মোহ-মদিরায় হাবুডুবু খাইতেছি।

এই অতিরিক্ত মত্ততার জন্য আমাদের চক্ষু দুইটি গিয়াছে। আমরা জন্মান্ধ। এ জন্মান্ধের উপায় কি? আশা ভরসার স্থল কি? অবলম্বন কি? অন্ধ কাহারও উপদেশ চাহে না। যাঁহারা চক্ষুষ্মান্, তাঁহারা কোন কথা বুঝিয়া সুঝিয়া দেখিয়া শুনিয়া কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে পারেন, কিন্তু অন্ধের সে সামর্থ্য নাই। যদি কেহ কোন জিনিষ প্রস্তুত করিয়া অন্ধকে দেয়, অন্ধ তাহার জন্য হাত পাতিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু কোন জিনিষ করিয়া কর্ম্মিয়া লইবার ক্ষমতা অন্ধের নাই। ভাত রাঁধিতে হইলে আগুন, কাঠ, উনুন, জল, তণ্ডুল, এ সমস্ত চাই। এ সমস্ত যোগাড় করিয়া ভাত রাঁধিয়া খাইতে অন্ধ পারিবে না। কিন্তু যদি কেহ দয়া করিয়া তৈরি অন্ন অন্ধের হাতে তুলিয়া দেন, অন্ধ তাহা তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করিবে। জ্ঞানীর কাছে, যোগীর কাছে অন্ধের আশা নাই। তাঁহারা করিয়া কর্ম্মিয়া লইতে বলেন, অধিকারী হইতে বলেন। অন্ধ তাহা পারিবে না। অন্ধ বড় গরীব, পথের ভিখারী। যদি কোন মাহাত্মা দয়া করিয়া অন্নশালা নির্ম্মাণ করিয়া দেন, ভিখারীর জন্য সদাব্রতের দ্বার খুলিয়া দেন, তবে অন্ধের আশা মিটিতে পারে, কামনা পূরিতে পারে।

আমরা যখন বাহিরের অন্ধের দিকে তাকাই, তখন দেখি, তাহার আশ্রয় যষ্টি। খাইতে শুইতে বসিতে অন্ধের তাহা পরমোপকারী বন্ধু। জগতে তাহার মত সম্বল অন্ধের আর কিছুই নাই। আজ পিতা মাতা আদি কেহ না থাকিলেও যষ্টির আশ্রয়ে অন্ধ জীবন ধারণ করিতে পারে। কিন্তু যষ্টির অভাবে সে এক পাও চলিতে পারে না। সুতরাং জগতে অন্ধের এমন

আত্মীয় আর কেহ নাই। যষ্টি হয়ত হাতির দাঁতের দ্বারা নির্ম্মিত না হইতে পারে, কিন্তু তাহা অমূল্য। সেই সামান্য বংশখণ্ড অল্প মূল্যের হইলেও অন্ধের পক্ষে আঁধারের মাণিক। আমরা অন্ধ। আমাদেরও অন্ধের মত এইরূপ একটা যষ্টি চাই। যে যষ্টি জীবন্ত প্রাণীর মত আপনা আপনি রাস্তা বাঁকিয়া, আপনা আপনি মোড় ফিরিয়া এ অন্ধকে পরিচালিত করিতে পারিবে, সেইরূপ যষ্টি চাই। অন্ধ কোন্ দিকে যাইতে হয়, তাহা জানে না, শুনে না, বুঝে না, এ পথহারা পথিককে সুপথে আপনা আপনি লইয়া যাইতে পারে, এইরূপ একটা অবলম্বন চাই। বাহিরের অন্ধ যষ্টি ধরিয়া আপনার মত আপনার পথে আপনি চলে; কিন্তু আমার মত অন্ধের সেরূপ হইলে চলিবে কেন। আমর এমন কলের যষ্টি চাই, যে যষ্টি নিজগুণে আমাকে চালাইবে। অপথ কুপথ আমি দেখিতে পাই না, কলের যষ্টি আপনিই আমাকে সেদিক্ হইতে ঘুরাইয়া দিবে, যে দিকে গর্ত্ত (নরক), সেদিকে যাইতে বাধা দিবে। যষ্টি আমাকে আমার চির-বিশ্রাম-ভবনের দিকে অর্থাৎ যে ধামে গমন করিলে আর আমাকে পথে পথে ঘুরিতে হইবে না—"যগত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম" কলের যষ্টি নিজগুণে আমাকে সেই দিকে লইয়া যাইবে। কাঙ্গালের ঠাকুর দয়াময়ের অতুল ভাণ্ডারে এ যষ্টি পাওয়া গিয়াছে। ইহা কি? ইহা **হরিনাম**। ইহাই অন্ধের বাঁশের যষ্টি। 'যোগ, জ্ঞান, বিজ্ঞানরূপ সুবর্ণময় যষ্টির মত ইহা হয় ত মূল্যবান্—কারুকার্য্য-খচিত না হইতে পারে, কিন্তু অন্ধের পক্ষে ইহা পরমোপকারী বন্ধু। কেননা ইহার জন্ম

বেদগর্ভে। বেদের গুহ্য গর্ভ মথিত করিয়া যিনি এ সারধনকে জগতে বিলাইয়াছেন, তিনি দয়াবান্। মূর্খ আমি, জ্ঞান কোথায় পাইব, চঞ্চল আমি, যোগ কিরূপে সাধন করিব, পাষাণ হৃদয় আমি, অহঙ্কৃত আমি, ভক্তি কোথায় পাইব, তাই আসুন প্রাণ ভরিয়া বলি, "হরি বোল হরি বোল।" পাপ তাপ কাটিয়া যাইবে, জীবন ধন্য হইবে। অধিকারী হইতে হয়, "নাম" আপনি আমাকে অধিকারী করিয়া লইবে। স্বয়ং আমাকে কিছু করিয়া কর্ম্মিয়া লইতে হইবে না। নামের গুণে সকলই হইবে। স্বয়ং গৌরাঙ্গদেব জ্ঞানের জলন্ত কুণ্ডে প্রেমের ক্ষীরে পরমান্ন প্রস্তুত করিয়া, অন্নের স্থালী হাতে লইয়া অন্ধকে ডাকিতেছেন, আর বলিতেছেন—

"নাম সুধারস কে নিবি রে আয়।
এ যে, দেবের দুর্লভ হরিনাম, নামে ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে যায়,
নামের গুণে বোবায় বলে, পঙ্গু চলে, অন্ধে চখে দেখ্‌তে পায়॥"

তাই বলিতেছি, এমন জিনিষ আর নাই, এমন মাধুরী আর নাই, এমন আশার কথা আর নাই। আজ হয় ত যোগী অনধিকারী বলিয়া দুয়ার হইতে অন্ধকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবেন, হয় ত জ্ঞানী সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন নহে বলিয়া, অন্ধকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিবেন, কিন্তু যিনি দয়াবান্, অনাথের জন্য যাঁহার প্রাণ কাঁদে, তিনি তাহা পারিবেন না। তাই অনাথবান্ধব পুরাণ-বক্তাগণ জ্ঞানের গুহ্য-ভাণ্ডার বেদগর্ভ হইতে নামের যষ্টি বাহির করিয়া, অন্ধের জন্য অন্ধশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক সদাব্রতের দ্বার খুলিয়া জগতে মধুর নাম বিলাইয়াছেন। যদি কেহ অন্ধ থাক, তবে এই দিকে আইস।

এমন যষ্টি আর নাই, এমন আশ্রয় আর নাই, এমন পরমাত্মীয় আর নাই। আজ তোমার ব্রত তপস্যা আদি কিছু না থাকিলেও এই যষ্টিই তোমাকে সুপথে চালাইয়া লইয়া যাইবে। ঘোর অন্ধকারে জলন্ত আলোকের ন্যায় এই হরিনামই পথ দেখাইয়া আপনা আপনি মোড় বাঁকিয়া তোমায় লক্ষ্যস্থানে পৌঁছাইয়া দিবে। তুমি পাপী হও, তুমি পাষণ্ড হও, হবিনামই তোমায় ধীবে ধীরে পুণ্যবানের বাজ্যে, জ্ঞানীব আনন্দনিকেতনে, যোগীর নির্ম্মল ধামে, ভক্তের প্রেম-নিকুঞ্জে লইয়া যাইবে। হরিনামের রাজ্যে অধিকারী অনধিকারীব বিচাব নাই, যে আছে ক্ষুধিত, সেই এই হরিনাম-সুধারস পান করুক, তৃপ্তি পাইবে। তুমি আমি পাপী বলিযা এ বাজ্যে নিরাশ হইবাব কোন প্রয়োজন নাই। আমরা পাপী, আমরা অন্ধ, এই জন্যই ত হরিনাম আমাদের অবলম্বন। আমরা পীড়িত; এই জন্যই ত ঔষধ আমাদের ভরসা স্থল। পাতকীরাই ত জগতে অধিক হরিনামের প্রচার করিয়াছে। যাঁহারা ভক্ত, তাঁহাবা পারেন নাই। গৌরাঙ্গদেব "হ" এই অক্ষরটি উচ্চারণ করিতে করিতেই প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া আসিত, আর "বি" উচ্চারণ হইত না। সুতবাং তিনি জীবনে কয়টা হরিনাম উচ্চারণ কবিয়াছেন। যবন হরিদাসই ত লক্ষ লক্ষ বার হরিনাম জপিয়া বজ্রনির্ঘোষে জগতে হরিনামের মাহাত্ম্য প্রচার কবিয়াছেন, পাপী জগাই মাধাই তো ভৈরব নিনাদে হরিবোল বলিয়া দেশকে সচেতন করিয়াছিল। তাই বলিতেছি, হরিনাম পাপীরই আশা-ভরসা স্থল, কেননা ইহা "পতিতপাবন।" "হরি" শব্দেবই এমনি

গুণ যে উচ্চারিত হইলেই ইহা 'দেহ, মন, আত্মাকে পবিত্র করে। এ মধুর শব্দ হৃদয়ের কোন্ তন্ত্রীতে বাজিয়া কিরূপ স্নায়ব প্রক্রিয়ার ভিতরে গিয়া ক্রিয়া করে, সে গুরু গভীর শব্দবিজ্ঞানের কথা আজ আলোচনা করিব না। তবে সংক্ষেপে কয়েকটি আশঙ্কার নিরাস করিব। কেহ কেহ বলেন, কেবল মুখে হরি হরি বলিলে যদি জগতের সদ্গতি হইত, তবে চিনি চিনি বলিলেও মুখ মিষ্ট হইত। যদি মুখ মিষ্ট করিতে হয়, যদি উদর পূর্ত্তি করিতে হয়, তবে "চিনি" না খাইলে কেবল "চিনি চিনি" বলিলে কিছু হইবে না। যদি দেহ মন আত্মাকে পবিত্র করিতে হয়, তবে "হরি" এই শব্দের প্রতিপাদ্য পদার্থকে অনুভব কর, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার কর, নহিলে কেবল বাহিরে শব্দোচ্চারণ করিলে কি হইবে। চিনি থাকিল দূরে, হরি থাকিলেন বাহিরে, তাঁহার সহিত তোমার কোন সম্বন্ধই নাই, তবে তোমাতে কেমন করিয়া ক্রিয়া হইবে? এ কথা যাহারা বলেন, আমি তাঁহাদের সংক্ষেপে উত্তর দিব। প্রথমে বলা উচিত যে, দৃষ্টান্ত দ্বারা পদার্থ সিদ্ধ হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি কেবল বুঝিবার সুবিধা হয়। পদার্থসাধনে যুক্তি চাই, প্রমাণ চাই। যদি কোন প্রমাণ না দিয়া যুক্তি না দিয়া কেবল দৃষ্টান্তের বলেই হরিনামোচ্চারণের অসারতা প্রতিপন্ন করা হয়, তাহা হইলে সে চেষ্টা বৃথা। আমিও ঠিক তাহার বিপরীত দৃষ্টান্ত দিয়া নামোচ্চারণের সারবত্তা বুঝাইব। যেমন দেখ, তোমার সম্মুখে একটি তেঁতুল গাছ রহিয়াছে। তেঁতুল গাছে বসিয়া বানরে তেঁতুল খাইতেছে, তুমি কিছু তেঁতুল খাই-তেছ না, তোমার সহিত তেঁতুলের কোন সম্বন্ধই নাই, তথাপি

বানরের তেঁতুল খাওয়া দেখিয়া তোমার মুখে জল আসে কেন? তোমার কাছে কেহ যদি কুলের আচার, আমের আচারের কথা বলে, তবে তোমার মুখে জল আসে কেন? তুমি ত আচার খাইতেছ না, তোমার মুখে ত আচার নাই, তবে আচার এই শব্দ শুনিয়া তোমার মুখ জলপূর্ণ হয় কেন? বাহিরে থাকিল আচার, কেবল শব্দোচ্চারণে তোমাতে ক্রিয়া হইল কেন? কি জানি আচার এই শব্দের কি গুণ, যে শুনিলে বা বলিলেই মুখে জল আসে। তেঁতুল ও আচার তুমি কখন না কখন আস্বাদ করিয়া থাকিবে, তাই আজ তাহা স্মরণ বা দর্শন-মাত্রে তোমার অস্থিমজ্জা ও ভাবগত পূর্ব্বসংস্কার জাগ্রত হইয়া নৃত্য করিয়া উঠিল। অমনই শক্তির আবেগে স্নায়ুরাশি স্বভাবসূত্রে ক্রিয়া করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাই তোমার মুখে জল আসিল। এ দৃষ্টান্তে আমি বিরুদ্ধ পক্ষ নিরাশ করিলাম বটে, কিন্তু মনের কথা—কাজের কথা বলা হইল না। মনে কর তুমি কখনও সিংহের ভীম গর্জ্জন শুন নাই, সুতরাং তাহার সংস্কারও নাই; কিন্তু অকস্মাৎ যদি গিরিগহনে সেই ধ্বনি তুমি শুনিতে পাও, তবে অমনি ভয়ে বিকল ও মূর্চ্ছিত হও কেন? সেই শব্দকারী সিংহকে স্মরণ করিয়া? (না, তুমি তো কখন সিংহ দেখ নাই, সিংহের কথাও শুন নাই) অথবা শব্দের কোন অর্থ বুঝিয়া? না, তাহাও নহে, কেননা তাহার কোন অর্থই নাই। প্রত্যুত সিংহ-রবের স্বভাবগত শক্তির দ্বারাই তোমার শরীর-মনের ধর্ম্ম লক্ষণ ও অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তোমার বুদ্ধি তাহা বুঝে না বটে, কিন্তু তোমার শরীর-মন আদির তন্মাত্রগতির সহিত বাহিরের উৎকট শব্দের পরিচয় আছে।

সেইরূপ জানিবে, হরি এই শব্দেরই কি মহিমা যে, উচ্চারণ করিলেই শুষ্ক মুখে জল আসে, তাপিত প্রাণে শীতল শান্তিময় বারিধারা প্রবাহিত হয়। পাষাণ ভেদ করিয়া অমৃতের ফোয়ারা খুলিয়া যায়। তাই নাম সাধক গাহিয়াছেন—

হরিনাম কি মধুর নাম।
নাম শুনে যে জুড়ালো রে প্রাণ॥
ও সে হরিনামের মোহন গুণে গ'লে যায় কঠিন পাষাণ;
আর বল্‌ব কি নামের মহিমা মর ভূমে ডাকে বাণ॥

কেহ কেহ বলিবেন ভক্তিপূর্ব্বক হরিনাম না করিলে কোন ফল হয় না, তাঁহারা ভ্রান্ত। ভক্তি বহু দুরারাধ্য তপস্যার সাধ্য ফলস্বরূপ। তাহা কখনও হরিনামে গোজামিলনস্বরূপ হইতে পারে না। হরিনাম দ্বারাই ভক্তিকে পাওয়া যায়। যদি ভক্তিই থাকিল, তবে হরিনামের প্রয়োজন কি। অতএব ভক্তি পূর্ব্বকই হউক, আর অভক্তি পূর্ব্বকই হউক "হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা" হরিনাম করিলেই পাপীর উদ্ধার হইবে। হরি শব্দেরই এমনি প্রকৃতিনিহিত গুণ আছে, যাহাতে পাপ তাপ আপনা আপনিই ছুটিয়া যায়। অনেকেই ভাবিতে পারেন, এ ক্ষুদ্র অক্ষর দুইটির এমন কি শক্তি আছে, যাহাতে জন্মজন্মান্তর-সঞ্চিত পুঞ্জীকৃত পাপ তাপ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে। ইহা ত কখনই সম্ভব নহে। ইহার উত্তরে আমি বলি, বস্তুর আকারের উপরে দৃষ্টি না রাখিয়া তাহার শক্তির উপর দৃষ্টি রাখা উচিত। "হরি" এই কথাটির আকার ক্ষুদ্র হইতে পারে, কিন্তু তাহার শক্তি মহা-তেজস্বিনী। নাম ব্রহ্ম স্বরূপ। একটা দৃষ্টান্ত দেখ। রাত্রি-কালে প্রকাণ্ড অট্টালিকার মধ্যে নিবিড় অন্ধকার জমিয়াছে।

তাহার বিনাশ সাধন করিতে যদি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্থূলকায় হস্তীযূথ নিযুক্ত কর, তথাপি তাহার এক কণিকাও বিনষ্ট হইবে না। কিন্তু একটি ক্ষুদ্র দীপশলাকা জ্বাল দেখি, দেখিবে, সেই ক্ষুদ্র দীপশিখা সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকাব্যাপী অন্ধকার-স্তূপকে কোথায় দূরীভূত করিয়া দিয়াছে। দীপশিখার আকার ক্ষুদ্র হইলে কি হইবে, তাহার প্রকাশ-শক্তি নাকি মহাতীব্র, তাই অন্ধকার কোথায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। সেইরূপ হরিনামের দীপশিখায় পাপান্ধকার কোথায় উড়িয়া যায়। হরিনামের জ্বলন্ত অগ্নিতে পাপ তাপ পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায়। কেননা হরিনাম অপৌরুষেয় সিদ্ধ শব্দ। তাই বলি হরিনামের আকার ক্ষুদ্র হইলেও তাহার শক্তি মহীয়সী। আমরা নাকি স্থূলবুদ্ধি; তাই হরিনামের সূক্ষ্ম শক্তি না বুঝিয়া তাহার সাফল্যের প্রতি অবিশ্বাস করি। হোমিওপ্যাথিক গ্লোবিউল (বটিকা) ক্ষুদ্র হইলেও তাহা যে মহারোগবিনাশন, তাহা আমরা বুঝি না। তাই এলোপ্যাথির প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বোতলের তরল ঔষধ আমরা ঢগ ঢগ করিয়া গিলিতে চাই। তাহা তিক্ত হউক, কষ্টকর হউক, তথাপি তাহা সাধ করিয়া গিলিব, কেন না তাহার বোতল প্রকাণ্ড, তাহার ঔষধের পরিমাণ প্রকাণ্ড, সে বোতলে যে লেবেল আছে তাহাও প্রকাণ্ড, তাহার সকলই প্রকাণ্ডতাময়, সকলই আড়ম্বরময়। তাই তাহার উপর বিশ্বাস আছে। তাই এমন সুখদ সুমিষ্ট হোমিওপ্যাথির বড়ি ছাড়িয়া ঐ ঔষধগুলা গিলিতে চাই। আমরাও সেইরূপ ভব-রোগাক্রান্ত। হরিনামের ক্ষুদ্র বটিকাই আমাদের পক্ষে এখন সুখ-সেব্য ও উপকারী। জ্ঞান, যোগ, এলোপ্যাথির মত বড় কৃচ্ছ্রসেব্য।

অতএব তাহা উপকারী হইলেও যাহা সুখ-সাধ্য উপায় তাহা ছাড়ি কেন ?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শব্দের প্রকৃতিগত এমন কোন শক্তি আছে, যে অর্থ না বুঝিলেও ভাবে না ডুবিলেও সে শক্তি মনে ক্রিয়া করে, মনকে মাতাইতে পারে, গলাইয়া তাহাকে ছাঁচে ঢালিতে পারে। অর্থ ছাড়া শব্দের এ স্বাভাবিক গুণ আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য। তোমার সম্মুখে যদি রণবাদ্য বাজিয়া উঠে, তুমি মহা দুর্ব্বলসিং হওনা কেন, শব্দের গুণে তোমার শিরায় শিরায় রক্ত উষ্ণ হইয়া উঠিবে, তোমাকে যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা দিবেই দিবে। ভীমদর্শন বিষধর তোমাকে গর্জ্জিয়া কামড়াইতে আসিতেছে, এমন সময় যদি মোহনস্বরে বাঁশি বাজাও, সর্প স্তব্ধ হইয়া শুনিবে। তাহার হিংসাপ্রবৃত্তি কোথায় উড়িয়া যাইবে। সর্প কিছু আর তান্‌সানের প্রপৌত্র নহে যে, বংশীধ্বনির সুর তাল লয় বুঝিয়া সে মোহিত হইতেছে। কোন ভাব সে বুঝিল না, কিন্তু শব্দের প্রকৃতিনিহিত এমনই শক্তি, যে তাহাতেই সে মুগ্ধ পাগল হইয়া গেল। সামান্য বংশী-ধ্বনিতে যদি সর্পের হিংসাপ্রবৃত্তি উড়িতে পারে, তবে হরি-নামের জগদ্‌ভুলান উন্মাদময় বাঁশরী বাজিলে হৃদয়ের সাংসারিক দুষ্প্রবৃত্তিরাজি ছিন্ন ভিন্ন হইবে না কেন ? উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিৎ স্বরে হরিনামের মধুর গীতি পাষণ্ডকে ভুলাইতে পারে, লৌহকে গলাইতে পারে, শ্মশানে জীবনীশক্তির তুফান ছুটাইতে পারে। তাই বলিতেছি এই হরিনামই অন্ধের যষ্টি। "হরি" এই কথাটি বাধাস্বরের মত সিদ্ধ শব্দ। সহস্র সহস্র সাধকের হৃদয়সরোবর ভেদ করিয়া এ অপূর্ব্ব কমল ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাধকের যাহা হৃদয়ের

সামগ্রী, বিরলে বসিয়া যে গুপ্ত ধনের মাধুরীধারা সাধক পান করিতেন, প্রেমে বিভোর হইয়া নারদ ঋষি যে গাথা গাহিয়া আপনার রসে আপনি মাতিয়া ত্রিজগৎ মাতাইয়া গিয়াছেন, মহাদেব পঞ্চমুখে গান করিয়া যে অনন্ত সঙ্গীত-স্রোতে মগ্ন হইয়া অকাণ্ড তাণ্ডব নৃত্য করিতে করিতে ত্রিতাপতপ্ত জীবকে শান্তির রসে ডুবাইয়াছিলেন, সে পরম গুহ্য ধন আজ আমাদের মৃত অন্ধের জন্য জগতে প্রচারিত হইয়াছে। তুমি জ্ঞানী, তোমার কথা হইতেছে না, তুমি যোগী, দূরে সরিয়া দাঁড়াও, তুমি পরম ভক্ত, দুর্লভ পরা ভক্তি তুমি পাইয়াছ, তুমিও পথ ছাড়িয়া দাও, ঐ যে গরীব, ঐ যে জন্মান্ধ, ঐ যে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কন্থা কাঁধে লইয়া দীনবেশে দুয়ারে দুয়ারে ফিরিতেছে, উহাকে দীননাথের দরবারে আসিতে দাও, সদাব্রতের অন্নসত্রে প্রাণ ভরিয়া তৈয়ারি অন্ন খাইতে দাও, চিরবিশুষ্ক হৃদয়কাননে বসন্তের মল্লিকা মালতী ফুল ফুটিতে দাও, বাধা দিও না, বুদ্ধি-ভেদ করিও না।

বুঝিলাম ভগবানের নামই অন্ধের যষ্টি। এমন যষ্টি আর নাই। ইহা কলের লাঠি। ইহা আপনা আপনি মোড় বাঁকিয়া অন্ধকে সুপথে লইয়া যায়। যেমন শিক্ষিত ঘোড়ার উপর কোন একটি বালককে বসাইয়া দিলে, সে আপনা আপনি ঠিক রাস্তা দিয়া গন্তব্য স্থানে পৌছাইয়া দেয়, সেইরূপ এ লাঠিও অন্ধকে লক্ষ্যস্থানে উপস্থাপিত করিবে। পশ্চিমোত্তর দেশে আপনারা বড় বড় কূপ দেখিয়াছেন। সেই কূপ হইতে যখন ক্ষেত্রে জল লইয়া যাইবার প্রয়োজন হয়, তখন কূপ হইতে ক্ষেত্র পর্য্যন্ত একটা জলপ্রণালী কাটিতে হয়। সেই

পয়ঃপ্রণালী দিয়া কূপোদ্ধৃত জল প্রবাহিত হইয়া ক্ষেত্রে পড়ে। ক্ষেত্রে পতিত হইয়া সে জল ক্ষেত্রে রোপিত শস্যের পুষ্টিসাধন করে সত্য, কিন্তু প্রণালী দিয়া যাইবার সময় প্রণালীর ধারে যে সমস্ত তৃণাদি থাকে, তাহাদেরও মূলদেশে রসসিঞ্চন না করিয়া যাইতে পারে না। সেইরূপ হরিনামও অন্ধ পথিককে হরিপাদপদ্মরূপ লক্ষ্যস্থলে ধীরে ধীরে লইয়া যাইবার সময় পথস্থিত কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, সাধনা, এ সমস্তের পাদমূলেও রস সিঞ্চন করিয়া যান। রসের পরিপুষ্টিতে যেমন ঘাসগুলি নব নধরভাবে গজাইয়া উঠে, সেইরূপ হরিনামের শীতল বারি পাইয়া নিষ্কাম কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ আদিও ধীরে ধীরে ফুটিতে থাকে। তাই বলি নামের বল বড় বল। নামই বস্তুর প্রাপক। বড়লোকের নাম শুনিয়াই দীন দুঃখী তাঁহার কাছে যায়। নাম ধরিয়াই লোকে তাঁহার বাড়ি চিনিয়া লয়। "রামনামের" বলেই হনুমান্ সাগর লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, কিন্তু সাগর পার হইতে স্বয়ং রামচন্দ্রকে কষ্টসাধ্য সেতু বাঁধিতে হইয়াছিল। তাই বলি নাম প্রভু অপেক্ষাও বড়। তাই রুক্মিণীর তুলাদণ্ডে তুলসীপত্রে লিখিত হরিনাম সমস্ত দ্রব্যসম্ভার অপেক্ষা গুরু হইয়াছিল। নাম বস্তু হইতেও ব্যাপক। বস্তুর নাম যতদূর ছুটিতে পারে, বস্তু ততদূর যাইতে পারে না। আমার এই তুচ্ছ শ্রীকৃষ্ণানন্দ নাম সংবাদপত্রে পড়িয়া হয় ত অনেকেই চেনেন, কিন্তু এ ব্যক্তিকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কয় জন লোক চিনেন? তাই বলি নাম বস্তু হইতেও ব্যাপক—বড়। কাতর-কণ্ঠে নাম ডাকিলে প্রভুর আসন টলে, নামের বলেই নিভৃত গুহ্যগুহাশায়ীকে টানিয়া বাহির করিতে পারা যায়। নামের তেজেই

বৈকুণ্ঠপুরী ভেদ করিয়া তাঁহার দিব্যবিভা এ জগতে বিকীর্ণ হয়। যাঁহার সহিত কখনও পরিচয় নাই, কখনও জানা শুনা নাই, কেবল নামের পরিচয় পাইয়াই উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতেছি, জগতের পরিচিত বন্ধু বান্ধব পরিত্যাগ করিয়া সেই অচেনা অজানা পথে ছুটিতেছি, তিনি কি আশা ভরসা দিবেন না? যিনি করুণার গঙ্গাজলে অন্ধ বিল্বমঙ্গলের দুইটি চক্ষু ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন, সেই পদ্মপলাশলোচন যে কাহাকেও নিরাশ করিবেন, এমন ত মনে হয় না। তাই বলি অন্ধ! তোমারও আশা আছে। যিনি হরিনামামৃতবিহ্বল অন্ধ বিল্বমঙ্গলের হস্ত ধরিয়া নিত্য বৃন্দাবনধামে লইয়া গিয়া নিজ নিত্য রূপ দেখাইয়াছিলেন, জীব! বিল্বমঙ্গলের ন্যায় তোমাকে অন্ধ দেখিয়া তিনি কৃপাপূর্ব্বক নামের যষ্টি দান করিয়াছেন; উহা অবলম্বন কর। তুমি দেখিতে পাও আর নাই পাও, ঐ যষ্টির অগ্রভাগ ধরিয়া বিল্বমঙ্গলের রাখাল বালকের ন্যায় তিনি তোমাকে তাঁহাব নিত্যধামে লইয়া যাইবেন। হরি বলিতে আলস্য করিও না, সময় থাকিতে নাম অবলম্বন কর। নামই "অন্ধের যষ্টি।" প্রাণ ভরিয়া বল "হরিবোল" সাধ মিটাইয়া বল, "হরিবোল", বদন ভরিয়া বল "হরিবোল", বাহু তুলিয়া বল, "হরিবোল", আনন্দে মাতিয়া বল, হরিবোল, সকলে মিলিয়া বল, হরিবোল, বল হরি হরি বোল, হরি হরি হরি বোল, হরি বোল!

ওঁ হরি ওঁ।

তৃষ্ণার জল।

(কাশী ধর্ম্মসভার উৎসবের শেষ দিনে প্রদত্ত বক্তৃতা)

নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী উদর পূরিয়া উত্তমরূপে ভোজন কর না কেন, ভোজনের শেষে কিন্তু তৃষ্ণানিবারণার্থ জলের ব্যবস্থা থাকা চাই। আমাদের এই ধর্ম্মসভার বিগত কয় দিন ধরিয়া ধর্ম্মবক্তাগণ শ্রোতৃবৃন্দকে বহুবিধ সুরসাল সুস্বাদু ধর্ম্ম-তত্ত্বরূপ মিষ্টান্ন ভোজনে আনন্দিত করিয়াছেন, এক্ষণে উৎসবের এই শেষ দিনে—ভোজনের অবসানে তাঁহাদের তৃষ্ণানিবারণার্থ সুশীতল সলিল চাই। মিষ্টান্নাদির মধুর আস্বাদে জিহ্বায় যে রসটুকু সঞ্চিত হয়, জানি জল পান করিলে সে রসটুকু জিহ্বা হইতে ধুইয়া পরিষ্কার হইয়া যায়, জানি জলনিষেকে সে রসময়ী রেখা মুছিয়া যায়, কিন্তু তথাপি লোকে ভোজনান্তে জল পান করিতে ব্যস্ত হয় কেন? জলপান না করিলে তাহার নাকি পরিতৃপ্তি হয় না, তাহার প্রাণের পিপাসা নাকি মিটে না, তাই তাহার জন্য "তৃষ্ণার জল" চাই। আজ আমার এ তৃষ্ণার জল বাস্তবিকই পিপাসার উপশম করিতে সমর্থ কি না তাহা আমি এখন বলিতে চাহি না, তবে ইহা স্থির কথা যে পার্থিব জীবের কাছে তৃষ্ণার জল বড় মধুর—বড় রমণীয়। পৃথিবীর জীব তৃষ্ণা পাইলেই জলের কাছে দৌড়িয়া যায়। দৌড়িয়া গিয়া পিপাসা-বিশুষ্ক তালুদেশে জলের অমৃতময় পরমাণু কণারাশি পূর্ণ করিয়া লয়। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম।

সৃষ্টিতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চতন্মাত্র হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী এইরূপ পরম্পরাক্রমে পদার্থসমূহ সৃষ্ট হইয়াছে। অনুলোম ভাবে সৃষ্টিতত্ত্ব এইরূপ বুঝিতে হয়। কিন্তু প্রলয়তত্ত্ব বিলোম ভাবে অর্থাৎ ঠিক বিপরীতরূপে বুঝিতে হয়। পৃথিবী জলে, জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ তন্মাত্রে, তন্মাত্র অহঙ্কারতত্ত্বে, অহঙ্কারতত্ত্ব বুদ্ধিতত্ত্বে, বুদ্ধিতত্ত্ব প্রকৃতিতত্ত্বে বিলীন হয়, ইহাই প্রলয়ের ধারা। এই অনুলোম কিম্বা বিলোম ভাবে যে দিক্ দিয়াই দেখা যাউক না কেন, পূর্ব্বোক্ত পদার্থ সমূহের মধ্যে যে একটা সম্বন্ধ আছে, একটা আশ্রয়াশ্রয়ি ভাব, একটা পরস্পর-মুখপ্রেক্ষিতার ভাব আছে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। আকাশ বায়ুর সহিত, বায়ু তেজের সহিত, তেজ জলের সহিত, জল পৃথিবীর সহিত সম্বন্ধ। পঞ্চ-পদার্থ-সম্বন্ধরূপ একটা শৃঙ্খলে আবদ্ধ। তবে কেহ বা মুখ্যভাবে, (সাক্ষাৎরূপে) কেহ বা গৌণভাবে (পরম্পরারূপে)। পৃথিবী পঞ্চ পদার্থের মধ্যে শেষ-সৃষ্ট পদার্থ। পৃথিবী জল হইতে সৃষ্ট হইয়াছে এবং জলেতেই বিলীন হয়, এই জন্য পৃথিবীর সঙ্গে জলের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। আর অন্যান্য গুলির সহিত গৌণ সম্বন্ধ। পৃথিবীর সহিত জলের এতটা নিকট সম্পর্ক, এতটা মাখামাখি ভাব আছে বলিয়াই পার্থিব জীব জলের জন্য লালায়িত। আকাশাদি জগতের সঙ্গে জলের দূর-সম্পর্ক, সুতরাং তাহাদের মধ্যে পরস্পর ততটা আকাঙ্ক্ষার ভাব না থাকিলেও পার্থিব জগৎ ও জলীয় জগতের

মধ্যে ঘনিষ্টতা টুকু আছে বলিয়াই একটা তীব্র লালসার ভাব উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। পৃথিবীর সঙ্গে জলের এই অধিকতম নিকট-সম্বন্ধ আছে বলিয়াই, তৃষ্ণাতুর পার্থিব জীবের পক্ষে জলের অধিক প্রয়োজন। এক আধ বিন্দু জল তাহার পক্ষে ততটা পিপাসার শান্তিকর হইবে না। তাই তাহার তৃষ্ণানিবারণার্থ শীতল সলিলের ধারা প্রবাহ হওয়া চাই। তাহার বিশুষ্ক মরম-মাঝারে অনবচ্ছিন্ন পীযুষময়ী বর্ষার বারিধারা বৃষ্টি হওয়া চাই। তবেই তাহার পিপাসা মিটিতে পারে, তাহার তৃষ্ণাগ্নির জ্বালা-মালা নির্ব্বাণ হইতে পারে।

আধিভৌতিক তৃষ্ণা ও জলের কথা এতক্ষণ বলিয়া আসিলাম। এখন আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা ও জলের কথাই বলিব। জলন্ত মরুভূমে দিশাহারা পথহারা পথিক যেমন নিদারুণ পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠে ছট্ ফট্ করিতে থাকে, সেইরূপ এই সংসারের মরুময় প্রান্তরে দাঁড়াইয়া সংসার-পথের পথিক নানাবিধ আশা আকাঙ্ক্ষা বাসনা তৃষ্ণায় জর্জ্জরিতপ্রাণে চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে। তাই বেদান্তের চক্ষে তৃষ্ণা বড় নিকৃষ্ট ও হেয় পদার্থ। বেদান্তের জ্ঞান বিজ্ঞানময়ী তুলিকায় তৃষ্ণার বিকট-মূর্ত্তি অতি বীভৎসভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। বেদান্ত বলিতেছেন—

"ভীরয়ত্যপি ধীরেহং অন্ধয়ত্যপি সেক্ষণং,
খেদয়ত্যপি শান্তেহং তৃষ্ণা কৃষ্ণেব শর্ব্বরী।
ক্ষণমায়াতি পাতালং ক্ষণং যাতি নভস্তলং,
ক্ষণং ভ্রমতি দিক্‌কুঞ্জে তৃষ্ণা হৃৎপদ্ম ষট্‌পদী।
সংসারমরুমধ্যে হি তৃষ্ণৈকা সর্ব্বদুঃখদা,
অন্তঃপুরস্থামপি যা যোজয়ত্যপি সঙ্কটে।" যোগবাশিষ্ঠ।

"তৃষ্ণা ধীরচেষ্টকেও ব্যথিত করে, দৃষ্টিশক্তিমান্ পুরুষকেও অন্ধীভূত করে, কেননা তৃষ্ণা ভাল করিয়া কোন পদার্থের স্বরূপ দেখিতে দেয় না। মুহুর্মুহুঃ জীবকে একটির পর আর একটিতে লইয়া যায়। সুতরাং তৃষ্ণা জীবের পক্ষে ঘোর অন্ধকারময়ী নিশীথিনীর ন্যায় ভয়ঙ্করী। তৃষ্ণা জীবকে পৃথিবী হইতে পাতালে লইয়া যায়, আবার পাতাল হইতে আকাশের দিকে প্রধাবিত করে। আবার মুহূর্ত্ত মধ্যে দিগ্‌দিগন্তের পথে তাহাকে উধাও করিয়া কোথায় লইয়া যায়। তৃষ্ণা ঠিক নাক-ফোঁড়া বলদের মত জীবকে অবিরত বিঘূর্ণিত করিতেছে। তৃষ্ণা হৃদয়রূপ পদ্মের ভ্রমরী স্বরূপ। ভ্রমরী যেমন বিকশিত পদ্মের মধুটুকু চুষিয়া পান করিয়া তাহাকে ফোঁপরা করিয়া ফেলে, সেইরূপ তৃষ্ণাও হৃদয়-পদ্মের শমদম বিবেকাদি মধুধারা নিঃশেষিত করিয়া তাহাকে শূন্যগর্ভ করিয়া তুলে। তৃষ্ণা অন্তঃপুরবাসিনী কামিনীকেও ত্রিভুবন ঘুরাইয়া আনে। সুতরাং তৃষ্ণাকে বিশ্বাস নাই, তৃষ্ণা ভয়ের সামগ্রী। তাই বেদান্ত পরামর্শ দিতেছেন, বৈরাগ্যের তীক্ষ্ণ ছুরিকা তৃষ্ণার গলদেশে বসাইয়া তাহার কণ্ঠচ্ছেদ করিতে হইবে। আমি কিন্তু বলি, বেদান্তের কথায় হঠাৎ তৃষ্ণার উপর চটিলে চলিবে না। তৃষ্ণা বেদান্তের চক্ষে যাহাই কেন হউক না আমাদের পক্ষে কিন্তু পরম সুন্দর। পিতা মাতার আদরের ধন কালো মেয়েটি অপরের চক্ষে কুৎসিত—কদাকার হইতে পারে, পিতামাতার চক্ষে কিন্তু তাহা কালো মাণিক—কষিত কাঞ্চন। তৃষ্ণা নাকি আমাদের নিজস্ব, নিজের সামগ্রী, তাই তৃষ্ণাকে বড় ভালবাসি। বিরাগী বেদান্তীর জ্ঞান বৈরাগ্যই নিজধন, তৃষ্ণা তাঁহার নিজস্ব

নহে, তাই তাঁহার কাছে তৃষ্ণা উপেক্ষিত—পদদলিত, আমরা কিন্তু তৃষ্ণাকে কোলে লইয়া জুড়াইতে চাই। কেননা তৃষ্ণা আমাদের ঘরের মেয়ে, আদরের বালিকা, সাধের সোহাগময়ী দুহিতা। আমি বেদান্তের সহিত বিরোধ করিতেছি না। আমাদের উভয়ের মত বিভিন্নতা হইতেছে মাত্র। বিরোধ আর বিভিন্নতা দুইটি স্বতন্ত্র পদার্থ।

অধিকারতত্ত্বের স্তর উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি, বেদান্ত যে শ্রেণীর জন্য তৃষ্ণার কলঙ্কময়ী মূর্ত্তি আঁকিয়াছেন, আমরা সে শ্রেণীর অনেক নিম্নে। সুতরাং সে শ্রেণীর পক্ষে যাহা উপদেশ, আমাদের পক্ষে তাহা খাটিতে পারে না। প্রকৃত জ্ঞানী বৈরাগ্যবান্ পুরুষের পক্ষে তৃষ্ণা কালভুজঙ্গিনী হইতে পারে, আমাদের পক্ষে কিন্তু তাহা বিকশিত কুসুমমালা। আমাদের মত দুর্ব্বল অধিকারীগণ এই তৃষ্ণার দ্বার দিয়াই বিশ্বপতির দরবারে যাইতে পারে। তাঁহার দরবারে গিয়া তাঁহার সুচারু চরণতলে এই কামনা তৃষ্ণার ললিত পুষ্পাঞ্জলি ঢালিয়া দিতে পারে। সুতরাং তৃষ্ণাই আমাদের ভরসা। অনাথনাথ ভগবান্ জাগতিক জীব প্রকৃতিতে যে বীজরাশি ছড়াইয়া দিয়াছেন, প্রকৃতির শিশুসন্তান মনুষ্যকে যে নৈসর্গিক সাজে সাজাইয়া সংসার-নাট্যশালায় পাঠাইয়া দিয়াছেন, সে বীজ, সে সাজ সমস্তই যদি কুৎসিত হইত, তাহা হইলে তিনি তাহা আমাদিগকে দিবেন কেন? কেননা তিনি যে দয়াময়, তিনি যে করুণার অনন্ত সাগর। তাঁহার করুণার ধারা কোন সূত্র অপেক্ষা না করিয়াই আপনা আপনিই যে প্রবাহিত হয়। সুতরাং সেই দয়ার ঠাকুর করুণার টানে পড়িয়া আবদ্ধ জীবের

উদ্ধারার্থ তাহাকে যে সুবৃত্তিগুলি দিয়াছেন, যে বৃত্তিমালারূপ মুক্তামালা তাহার গলদেশে ঝুলাইয়া দিয়াছেন, তাহা সমস্তই সুন্দর, তাহার প্রভা চির-সমুজ্জ্বল। তাহার ভিতরে একটিও কৃত্রিম মুক্তা নাই। সমস্তই সাচ্চা, ঝুটার লেশ মাত্রও নাই। তাই বলিতেছি, তৃষ্ণা যদি বাস্তবিকই কালসর্পিনী হইত, তাহা হইলে তিনি তাহা আমাদিগকে দিতেন না। পিতা কি কখনও হাতে করিয়া দারুণ হলাহল পুত্রকে দিতে পারেন? জগৎপিতা আমাদিগকে যে সমস্ত দীপ্তিময়ী সাজসজ্জা দিয়াছেন, আমরা ব্যবহার-দোষে তাহাকে মলিন করিয়া ফেলিতেছি। জগতের খেলাধূলায় মজিয়া তাহার সে সুবর্ণের ন্যায় বরণীয় কান্তি ধূলিধুসরিত করিতেছি। সুতরাং দোষ আমাদের, তাঁহার নহে।

তৃষ্ণাতত্ত্ব এখন একটু পরিস্ফুটভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা যাক্। তৃষ্ণা জগতের সর্ব্বত্র বিরাজিত। জড়-জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই, সেখানেও তৃষ্ণার অপূর্ব্ব লীলা। ঐ যে একটি পরমাণু অপর পরমাণুটির সহিত মিশিয়া পদার্থপিণ্ডের সৃষ্টি করিতেছে, উহাদেরও ভিতরে তৃষ্ণার অচ্ছেদ্য বন্ধন বিদ্যমান রহিয়াছে। একটি পরমাণু অপর পরমাণুকে দৌড়িয়া আলিঙ্গন করিতে যায় কেন, সেই পরমাণুটির সহিত মিলিত হইলে তাহার কি পিপাসা দূর হইবে, তাহা তুমি আমি বুঝি আর না বুঝি, পরমাণু তাহা বুঝে, তাই সে ছুটিয়া তাহার কাছে যায়। ঐ অনন্ত আকাশে নক্ষত্রমণ্ডলী আকর্ষণী শক্তিরূপ তৃষ্ণার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, উহাদের পরস্পর মিলনে যে তৃষ্ণা নিবারিত

হইতেছে, তাহা তুমি আমি বুঝি আর না বুঝি, উহারা তাহা বুঝে, তাই উহাদের মধ্যে একটিও দলবিচ্যুত হইতে চাহে না। এই মনুষ্য-সমাজও তৃষ্ণাশক্তির ফল। কি জানি কোন্ অলক্ষিত তৃষ্ণাশক্তির আবেগে মনুষ্য পরস্পর সম্মিলিত হইয়া, এই মনুষ্য-সমাজ প্রস্তুত হইয়াছে। অদ্যকার এই সভায় যে মনুষ্য-সংহতি, ইহাও তৃষ্ণাশক্তির পরিণাম। কেননা কোন-রূপ তৃষ্ণা দূর করিবার জন্য জগতের প্রত্যেক জীব অবিরত চেষ্টা করিতেছে। এই তৃষ্ণাশক্তিকে ইংরাজিতে Sympathetic cord আসঙ্গলিপ্সা বা সহানুভূতিসূত্র বলে। এই শক্তিই সৃষ্টি-তত্ত্বের মূলভিত্তি। এ শক্তির বিলয় হইলে এখনই এই জগৎ-বিপ্লবকারিণী শক্তি দ্বারা উপপ্লুত—বিধ্বস্ত—বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইতে পারে, জগতের প্রত্যেক অণু পরমাণু সঙ্গচ্যুত হইয়া, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে পারে। কোন একটি পুষ্পমালার সূত্র ছিঁড়িয়া গেলে ফুলগুলি যেমন চারিদিকে ছত্রাকার হইয়া ছড়াইয়া পড়ে, সেইরূপ জগতের এই পরস্পর সহানুভূতি সূত্রের ধ্বংস হইলে পরমাণুসমষ্টি বিশীর্ণ হইয়া পড়িবার সম্ভব। তাহারই নাম জগতের ধ্বংস অথবা মহাপ্রলয়। তাই বলিতেছি, তৃষ্ণাশক্তি আছে বলিয়াই জগৎ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তৃষ্ণার অভাবে জগৎ একক্ষণমাত্রও স্থির থাকিতে পারে না। তৃষ্ণা-শক্তির হ্রাস হইলে এই বিশ্বমণ্ডল এখনই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া রেণু রেণু হইয়া কোথায় উড়িয়া যায়। সুতরাং তৃষ্ণার মাহাত্ম্য অসীম। এ তৃষ্ণা বৈদান্তিকের পদধূলি হইতে পারে, কিন্তু আমাদের মত সৃষ্টির গণ্ডীস্থ জীবের পক্ষে মাথার মণি। ইহাকে আমরা কিছুতেই ছাড়িতে পারিব না।

তৃষ্ণার স্বরূপ কি তাহা বলিলাম। এক্ষণে ইহার প্রকার-ভেদের কথা বলিব। তৃষ্ণা জগতে নানাপ্রকার। সুতরাং তৃষ্ণার জলকেও নানাবিধ মূর্ত্তিতে জগতে দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত লইয়া কথাটা বুঝিতে হইবে। তোমার গায়ে একটি লৌহনির্ম্মিত ছুঁচ ফুটিয়াছে। ইহাকে তুলিবার জন্য যদি তুমি তাহার কাছে সুবর্ণ বা রজতখণ্ড রাখিয়া দাও, তথাপি তাহা উঠিবে না। কিন্তু একটা চুম্বক পাথর তাহার কাছে ধর দেখি, দেখিবে, মুহূর্ত্তমধ্যে সেই লৌহ-শলাকা সমুত্থিত হইয়া চুম্বক পাথরকে দৌড়িয়া গিয়া আলিঙ্গন করিবে। আজ সুবর্ণের টুকটুকে ফুটফুটে বর্ণে ভুলিয়া কৈ লৌহ ত সুবর্ণের দিকে ছুটিল না। রজতের তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে সুন্দর কায়া দেখিয়াও কৈ লৌহ ত তাহার দিকে ঢলিল না। কিন্তু কাল কিট্‌কিটে চুম্বককে দেখিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে তাহার কোলে গিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল কেন? লৌহ নাকি চুম্বকের বাস্তবিকই "তৃষ্ণার জল", সহানুভূতির সূক্ষ্ম সূত্রে লৌহ নাকি চুম্বকের সহিত দৃঢ় আবদ্ধ, তাই লৌহ কি জানি কি ইঙ্গিত পাইয়া চুম্বকের কাছে দৌড়িয়া গেল। সুবর্ণ বা রজত এ ইঙ্গিত দিতে পারে নাই। তাই তাহারা লৌহকে আকৃষ্ট করিতে সক্ষম হয় নাই। এই এক তৃষ্ণার জল। আর একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। স্নায়ু, মেদ, মজ্জা, মাংস, রক্তাদির সমবায়ে এই মনুষ্য-শরীর গঠিত হইয়াছে। এই শরীরের পোষণার্থ ভোজন নিতান্ত আবশ্যক। ভুক্ত অন্ন স্নায়বপ্রক্রিয়ায় যখন শরীরের মধ্যে ক্রিয়া করিতে থাকে, তখন শরীরস্থ স্নায়ু মেদ মজ্জাদি ঐ ভুক্ত অন্নরস হইতে যাহার যেটুকু অংশ, যাহার যেটুকু

পাইলে পরিপুষ্টি হয়, সে সেই টুকুই বাছিয়া লয়। স্নায়ু অন্ন-রস হইতে যে অংশটুকু বাহির করিয়া লয়, তাহাই তাহার পক্ষে "তৃষ্ণার জল।" মেদ বা মজ্জা সে অংশ কাড়িয়া লইতে ছুটিবে না। কেননা তাহার পিপাসা তাহার জন্য লালায়িত নহে। এইরূপে যেদিকে তাকাই সর্ব্বত্রই দেখি, তৃষ্ণার সূক্ষ্ম সূত্রজাল স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। বৃক্ষ জাতির মধ্যেও সতৃষ্ণ দৃষ্টি আছে। যেখানে কোন গাছপালা নাই, এমন উজাড় ময়দানে তুমি খুব যত্নের সহিত একটি পুষ্প-বৃক্ষ রোপিত কর। দেখিবে, সে বৃক্ষে তত তেজ ধরিবে না, তাহা দিন দিন তেজমরা হইয়া যেন দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। কিন্তু তাহাকেই যদি সেই সমান যত্নের সহিত কোন ফুল-বাগানে রোপিত কর, দেখিবে তাহা শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠিবে, নব নধর ফুল পল্লবে তাহা গজাইয়া উঠিবে। কেন এমন হয়? সেই ফুল গাছটিকে তাহা জিজ্ঞাসা কর, সে তাহার পবনসঞ্চা-লিত মৃদুল কিশলয়ের ইঙ্গিতে তোমাকে উত্তর দিবে। তুমি যদি তাহার ভাষার মর্ম্মে প্রবেশ করিতে পার, তাহা হইলে তাহার প্রাণের কথা শুনিয়া বুঝিবে, এ জগৎ তৃষ্ণার টানে পাগল—তৃষ্ণার মদিরায় মাতোয়ারা। উজাড় ময়দানের নিঝুম প্রান্তরে কোন সঙ্গী সাথীকে দেখিতে না পাইয়া, তরু-শিশুর প্রাণ ভয়ে যেন আঁতকাইয়া উঠিয়াছিল। তাই সে তথায় বাড়িতে না পারিয়া ভয়ে জড় সড় হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু বাগানে আসিয়া সে যখন তাহার সঙ্গী সাথীদের প্রাণভরা হাঁসিমুখ দেখিল, তখন সহানুভূতি-শক্তির মধুর স্নিগ্ধ বসন্ত-বায়ু প্রাপ্ত হইয়া তাহার ভয়শুষ্ক দেহে ফল ফুল পল্লব পুট পুট

করিয়া গজাইয়া উঠিল। তরুশিশুর এই যে বৃক্ষদের সহিত মিলনেচ্ছা, ইহারই নাম আসঙ্গলিপ্সা বা তৃষ্ণা। এই তৃষ্ণার বিজয়-বৈজয়ন্তী চারিদিকে পত পত রবে উড়িতেছে। জগতের কেন্দ্রে কেন্দ্রে কক্ষে কক্ষে প্রতি অণু পরমাণুতে এ তৃষ্ণার নির্ঝরিণী প্রবাহিত হইতেছে। কোথাও বা সূক্ষ্মভাবে ক্ষীণ হইতেও ক্ষীণতর হইয়া ইহার প্রবাহরেখা চলিয়া গিয়াছে, কোথাও বা তর তর বেগে খরতর তরঙ্গমালা উৎক্ষিপ্ত করিতে করিতে ইহার গতি হইয়াছে। এ তৃষ্ণানদীর গতি বুঝা বড় শক্ত। জড়-জগতে যেমন তৃষ্ণার বিভিন্নতা, জীব-জগতেও সেইরূপ তৃষ্ণার বিচিত্রতা। তুমি যাহা চাও, আমি তাহা চাহি না। সুতরাং আমার তৃষ্ণা কি তাহা তুমি বুঝ না। আবার তোমার তৃষ্ণা কি তাহাও আমি বুঝি না। মায়ের কোলে শিশু যখন কাঁদিয়া উঠে, তখন বাহিরের লোকে মনে করে, ঘুম হইতে উঠিয়া শিশু কাঁদিতেছে। অথবা হয় ত কোন ভয় পাইয়া কাঁদিতেছে। কিন্তু শিশুর কান্নার প্রকৃত মর্ম্ম কি, মাতা ভিন্ন তাহা কেহ বুঝিতে পারে না। শিশু ক্ষুধায় কাতর হইয়া কাঁদিতেছে, তাই মাতা তাহার মুখে দুগ্ধ ঢালিয়া দিলেন। আর অমনি শিশু চুপ করিল। আবার সেই শিশুর যখন ব্যারাম হইয়া বিকার উপস্থিত হয়, বিকারের জ্বালায় রোগী শুষ্ককণ্ঠে যখন জল চায়, তখন সেই জল-তৃষ্ণা মাতা ও চিকিৎসক দ্বিবিধ ভাবে বুঝিয়া থাকেন। মাতা তাহার বাহিরের তৃষ্ণা শান্ত করিবার জন্য তাহার মুখে জল দিতে যান, চিকিৎসক তাহা বারণ করেন। চিকিৎসক বুঝেন, জল দিলে তাহার তৃষ্ণা আরও বাড়িয়া উঠিবে। বার বার রোগী

জল চাহিবে। সুতরাং রোগীর বাহিরের তৃষ্ণার দিকে না তাকাইয়া, তিনি তাহার আন্তরিক তৃষ্ণার দিকে দৃষ্টিপাত করেন। রোগীর রুগ্ন-বিকারগ্রস্ত শারীর প্রকৃতি যে জল চাহে না, জল পান করিলে তাহার ব্যাধি আরও বাড়িয়া উঠিবে। তাহার ব্যাধি হইতে বিমুক্ত হইবার জন্যই তৃষ্ণা। তাই রুগ্ন শরীর-প্রকৃতি ব্যাকুল হইয়া যেন বলিতেছে, "আমার ব্যাধির শান্তি করিয়া দাও।" তাহার এ মরমের ভাষা চিকিৎসক ঠিক বুঝেন। তাই তিনি জলের পরিবর্ত্তে এক ডোজ ঔষধ দেন। ঔষধের গুণে ব্যাধি আরাম হইয়া আসে। তৃষ্ণাও মিটিয়া যায়। তাই বলিতেছি, তৃষ্ণার গতি বড় দুরবগাহ। এ সংসারক্ষেত্রে বিকারগ্রস্ত রোগীর জলতৃষ্ণার মত মায়াবিকার-জড়িত মনুষ্যের বাহিরের তৃষ্ণা প্রকৃত তৃষ্ণা নহে। তাহার অন্তঃপ্রকৃতি যাহা চায়, তাহাই তাহাকে দিলে তাহার সমস্ত তৃষ্ণা মিটিতে পারে। মানুষের প্রকৃতি যাহা চায়, মানুষ তাহা না বুঝিয়া অনেক সময়ে খেয়ালের ঘোরে পড়িয়া তাহার বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া ফেলে। খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া সংসার ছাড়িয়া কেহ কেহ সন্ন্যাসী হয়। আবার সন্ন্যাস ছাড়িয়া পুনরায় বিষয়কার্য্যে লিপ্ত হয়। যদি তাহার প্রকৃতি সন্ন্যাস-তৃষ্ণায় বাস্তবিক আকুল হইত, তবে পুনরায় বিষয়-প্রেমে মজিল কেন? তাই বলি কোন্ বস্তু প্রাপ্ত হইলে মানুষের তৃষ্ণা মিটিতে পারে, মানুষ তাহা না বুঝিয়া অনেক সময় ভ্রান্তিতে ডুবে। যাহা তৃষ্ণানিবারক মনে করিয়া আশ্রয় করে, তাহাতে তৃষ্ণা হয় ত আরও বাড়িয়া যায়। তাই একজন কবি রহস্য করিয়া বলিয়াছেন—

"তৃষ্ণায় আকুল হ'য়ে চাহিলাম জল।
হেন কালে আনি দিল দিব্য একটি বেল॥"

বুদ্ধির বিপাকে অদৃষ্টের দোষে মানুষ এ তৃষ্ণাবিভ্রাটের হাত হইতে এড়াইতে পারিতেছে না।

মাতা ভিন্ন অপরে শিশুর কান্নার মর্ম্ম যেমন বুঝে না, চিকিৎসক ভিন্ন রোগীর আন্তরিক তৃষ্ণার মর্ম্ম গাথা অপর কেহ যেমন অনুভব করিতে পারে না, সেইরূপ প্রকৃতিতত্ত্বজ্ঞ সাধক ভিন্ন মনুষ্যপ্রকৃতির তৃষ্ণা স্থূলদর্শী বুঝিতে পারে না। মনুষ্য প্রকৃতিতে যে অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহ প্রচ্ছন্নভাবে লুকাইয়া আছে, মনুষ্য তাহা বুঝিতে পারে না। তাই অপথে কুপথে ঘুরিয়া বেড়ায়। রাজার পুত্র গায়ে ধূলা কাদা মাখিলে তাহাকে যেমন নীচ-কুলোদ্ভব বলিয়া মনে হয়, সেইরূপ রাজ-রাজেশ্বরের পুত্র হইয়াও মনুষ্য নরকের কীট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গায়ের ধূলা কাদা ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া দিলে সে আবার রাজদরবারে বসিবার অধিকারী হইতে পারে, কেননা তাহার বসিবার শক্তি আছে, সামর্থ্য আছে। সমস্ত দিন শিশুটি যখন খেলা ধূলায় উন্মত্ত থাকে, তখন তাহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন বাড়ির কথা—মায়ের কথা সমস্তই সে ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক সে ভুলে নাই। তাহার প্রাণের ভিতরে বাড়ি যাইবার তৃষ্ণা লুকাইয়া থাকে। তাই যখন সন্ধ্যা হয়, শিশু তখন বাড়ি ফিরিয়া যায়। বাড়ি গিয়া মায়ের কোলে ঘুমাইয়া পড়ে। সেইরূপ এই মনুষ্যপ্রকৃতি যে জগজ্জননী মহামায়া মূল প্রকৃতির শিশুসন্তান, তাঁহার চারু চরণচুম্বন করিবার জন্য প্রাণে প্রাণে তাহার পিপাসা জাগিতেছে। সংসারের খেলা

ধূলায় যদি চ সে বিব্রত, কিন্তু তাহার অন্তর হইতেও অন্তরতম প্রদেশ হইতে তৃষ্ণা যেন অবিরত বলিয়া দিতেছে জীব! মায়ায় মজিয়া খেলা ধূলা করিতেছ কর, কিন্তু বাড়ী যাইবার কথা যেন মনে থাকে। জীবনের সন্ধ্যাকালে বাড়ী ফিরিয়া গিয়া মা মা বলিয়া মায়ের কোলে গিয়া যেন ঝাঁপাইয়া পড়িতে পার, তাহার সদুপায় করিয়া যাইও। এই যে তৃষ্ণা, এই যে জীব-প্রকৃতির মূল প্রকৃতির সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছা, এ সূক্ষ্ম তৃষ্ণা-শক্তির মরম কাহিনী মনুষ্য অনুভব করিতে পারে না। তাই তৃষ্ণা-নিবারণের প্রকৃত উপায়ও খুঁজিয়া পায় না। তাই মানুষ মরুমরীচিকায় দৌড়িয়া যায়। জলন্ত দীপশিখার দাহ-শক্তি বুঝে না বলিয়াই পতঙ্গ তাহাতে ঝাঁপ দিয়া পড়ে। তাই তৃপ্তির পরিবর্ত্তে অতৃপ্তি, শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তি, শীতল সলিলময়ী ধারার পরিবর্ত্তে অগ্নিময়ী জ্বালামালার ভিতরে জীব দিন দিন প্রবেশ করিতেছে। জীব কেবল বুদ্ধির দোষে তৃষ্ণার জল খুঁজিয়া পাইতেছে না। এই মহামায়ার রাজ্যে সর্ব্বত্রই ত তৃষ্ণার জল বিদ্যমান রহিয়াছে। তুমি গৃহস্থ হও, বানপ্রস্থ হও, সন্ন্যাসস্থ হও, সকলের জন্যই মহামায়া তাঁহার অনন্ত ভাণ্ডারে তৃষ্ণার জলের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। এই সংসার-রূপ অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর উপরে বালুকাস্তূপ দেখিয়া নিরাশ হইও না। বালুকা স্তর সরাইয়া ফেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখ, তৃষ্ণাজলের নদী ঝির ঝির করিয়া বহিয়া যাইতেছে। এ সংসারে সদর মফস্বল দুইই আছে। সদর পরিত্যাগ করিয়া জড়তাময় স্তূপ পরিহার করিয়া অন্দরমহলে চল দেখি, দেখিবে, তথায় চিন্ময়ী মূর্ত্তি দিক্ আলো করিয়া বিরাজ করিতেছেন। এই

সংসারের ভস্মাবরণ উন্মোচিত করিয়া দেখ, থরে থরে স্তূপে স্তূপে সমুজ্জ্বল রত্নরাজি সাজান রহিয়াছে।

জগৎ বাহ্য আবরণ লইয়াই বিব্রত। আবরণের অন্তরালে যাহা থাকে, তাহার অন্বেষণ কেহ করে না। নারিকেল ফলের ছোব্ড়া চুষিতেই জগৎ ব্যস্ত। সেই ছোব্ড়ার ভিতরে যে সুস্বাদু সুমিষ্ট জল আছে, তাহার আস্বাদ পাইতে চাহে না। আবরণ উন্মোচন করিতে যে কষ্টটুকু, তাহা সহ্য করিতে জগৎ প্রস্তুত নহে। তাই "তৃষ্ণার জল" জগদ্ব্যাপক হইলেও তাহার কপালে ঘটিতেছে না। সরোবরে বাস করিয়াও মীনের তৃষ্ণা যেমন ছুটে না, সেইরূপ ভগবৎ-সত্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়াও জগতের তৃষ্ণা মিটিতেছে না।

এতক্ষণ ধরিয়া তৃষ্ণার কথাই বলিয়া আসিলাম। এখন তৃষ্ণার জলের কথাই বলিব। **ভগবচ্চরণারবিন্দই** তৃষ্ণা-জলের সাগর, আর ভগবচ্চরণে ভক্তিই উহার বারিকণিকা। উহাই পিপাসু জীবের একমাত্র আশা ভরসা স্থল। যাঁহারা ভগবচ্চরণকে ভবার্ণব পার হইবার নৌকাস্বরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন, আমি তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারি না। উপায় আর উদ্দেশ্য কখনও এক হইতে পারে না। ভগবচ্চরণই যখন জীবের লক্ষ্যস্থল, তখন তাহাকে নৌকারূপ উপায় বলা যাইতে পারে না। ঐ তৃষ্ণার জল পান করিলে জীবের সমস্ত কামনাই মিটিয়া যায়, সমস্ত তৃষ্ণাই দূর হইয়া যায়। কেননা উহা প্রাপ্ত হইলে আর অন্য কোন বস্তু পাইবার ইচ্ছা থাকে না। আর কিছু চাহিবার থাকে না। ঐ অনন্ত সাগরে অবগাহন করিলে জীবের ত্রিতাপানল শান্ত হয়, আধ্যাত্মিক ময়লা মাটি

ধুইয়া পরিষ্কার হইয়া যায়। আকাশে পূর্ণিমার চন্দ্র উদিত হইলে সমুদ্রের জল উদ্বেলিত হইয়া যেমন দিগ্‌দিগন্ত ভাসাইয়া দেয়, সেইরূপ গৌরাঙ্গদেবের ন্যায় নবদ্বীপচন্দ্র উদিত হইলে ঐ সাগর হইতে প্রেম-ভক্তিসলিলের ধারা উচ্ছলিত হইয়া জগতে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। ঐ তৃষ্ণার জল উঠাইবার জন্য আমাদিগকে পরিশ্রম করিতে হইবে না, চন্দ্রের সাহায্যে স্রোতোমুখে প্রবাহিত হইয়া ঐ জল আপনা আপনিই আমাদের সম্মুখে আসিবে। ঐ প্রবাহিত জলে আপাদ মস্তক ডুবাইয়া প্রাণ ভরিয়া স্নান করিব। চিরদিনের সঞ্চিত কামনারাশি ঐ তরঙ্গাবেগে ভাসিতে ভাসিতে কূল কিনারা হারা হইয়া কোথায় চলিয়া যাইবে।

সভ্যগণ! আপনারা বোধ হয় দেখিয়াছেন, পশ্চিমোত্তর প্রদেশে এক প্রকার বড় বড় কূপ আছে। তদ্দেশবাসীরা ঐ কূপ হইতেই লোটা (ঘটি) ও দড়ির সাহায্যে জল উঠাইয়া থাকে। কোন কোন সময়ে সেই কূপের মধ্যস্থলের গর্ত্তে চোর লুকাইয়া থাকে। তৃষ্ণার্ত্ত পথিক যাই জল উঠাইবার জন্য লোটাটি কূপ-মধ্যে নিক্ষেপ করেন, আর অমনি দুষ্ট চোর কাঁচি দ্বারা দড়িটি কুচ করিয়া কাটিয়া লোটাটি আত্মসাৎ করে। তখন অভাগা সহায়বিহীন পথিকের মাথায় হাত দিয়া ক্রন্দন ছাড়া আর কোন উপায়ই থাকে না। সেইরূপ বেদান্তাদি শাস্ত্ররূপ গভীর কূপে বুদ্ধিরজ্জুর সাহায্যে মনরূপ লোটাটি যখন আমরা নিক্ষেপ করি, তখন লুক্কায়িত অভিমানরূপ চোর কোথা হইতে বাহির হইয়া দড়িটি কাটিয়া লয়। বেদান্ত পড়িয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া কোথায় অভিমান চূর্ণ হইবে, তাহা না হইয়া অহং বেদান্তী অহং

জ্ঞানী ইত্যাকার অভিমানই দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়ায়। এমন অবস্থায় তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের মত কাতর ক্রন্দন ছাড়া আর আমাদের কোন গতিই থাকে না। তাই বলি আমরা নিজে কোথাও হইতে জল উঠাইতে পারিব না। কেননা আমরা অচতুর, সামর্থ্য-বিহীন পঙ্গুর মত অকর্ম্মঠ (অনধিকারী), যে জল আপনা আপনিই ক্ষরিত হইয়া মুখে আসিয়া পড়ে, আমরা সেই জলের আশায় বসিয়া থাকিব। চাতক যেমন ভূমি-অসংস্পৃষ্ট মেঘ-জলের আশায় বসিয়া থাকে, আমরাও সেইরূপ উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া থাকিব। আমরা পৃথিবীর জলের ভিখারী নহি। কূপের জল বা সরোবরের জলে আমাদের এ পিপাসা মিটিবে না। যে জল-ধারা ঐ প্রেমমন্দাকিনী হইতে ক্ষরিত হইয়া গগনতল ভাসাইয়া মহাত্মাগণের উন্নত হৃদয়রূপ পর্ব্বতশৃঙ্গ প্লাবিত করিয়া আমাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িবে, আমরা তাহাই পান করিব। যে অমৃত-ধারা প্রবাহিত হইলে ভগবচ্চরণস্পর্শে কালীয়হ্রদের ন্যায় এ বিষময় সংসারহ্রদও অমৃতময় হইয়া উঠে, আমরা তাহারই আশায় বসিয়া থাকিতে চাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তৃষ্ণার জল সর্ব্বত্র বিদ্যমান। কেননা তিনি সর্ব্বব্যাপী। সুতরাং তৃষ্ণার জল ত সম্মুখে রহিয়াছে, তবে পান করিতে পাওয়া যায় না কেন? আমি বলি জল ত রহিয়াছে, কিন্তু প্রকৃত তৃষিত কৈ? পৃথিবী তাপদগ্ধ-হৃদয়ে জল চাহিলে ইন্দ্রদেব তৎক্ষণাৎ অবিরল বারিধারা বর্ষণে তাহাকে শান্ত করেন। কেননা পৃথিবী যে বাস্তবিক তৃষিত। সেইরূপ তৃষ্ণাকুলিত প্রাণে জল চাহিলে মেঘ হইতে জলধারা আপনা আপনিই ক্ষরিত হইবে। সে জলধারায় জীবের অনন্ত-

কালের তাপিত জীবন জুড়াইয়া যাইবে। এই প্রকৃত তৃষ্ণা হইবার উপায় কি? ইহার সহজ উপায় "নাম সাধন।" নামের বল বড় বল, নামের শক্তি বড় শক্তি। তাই ভক্ত বলিয়াছেন—

"হরিনামের এম্‌নি শক্তি, জন্মে ভক্তি,
মুক্তি দেয় সে জোর করে।"

নামের গুণেই প্রকৃত তৃষ্ণা ফুটিবে। প্রকৃত তৃষ্ণার উদয় হইলে, তৃষ্ণার জল আপনা আপনিই আমাদের কাছে দৌড়িয়া আসিবে। গোবৎস দুগ্ধ পান করিবার জন্য নিজ মাতা গাভীর স্তনে যখন মুখ দেয়, তখন দুগ্ধধারা আপনা আপনিই ক্ষরিত হইয়া তাহার মুখে আসিয়া পড়ে। গোবৎস নাকি বাস্তবিক তৃষিত, তাই সে তৃষ্ণার সূক্ষ্ম শক্তি দুগ্ধকে আকর্ষণ করে। এইরূপ তৃষ্ণাপরায়ণ হইয়া, জগতের যিনি মাতা, সেই মহামায়ার চরণতলে লুটাইয়া পড়িলে প্রেম ভক্তির দুগ্ধ ধারা আপনা আপনিই নিঃসৃত হইয়া আসিবে। এইরূপ তৃষ্ণা হইলে তবে তৃষ্ণার জলের আশা করা যাইতে পারে। প্রকৃত তৃষ্ণার টান হইলে এই মরুময় প্রান্তরেই পুণ্যসলিলা স্রোতস্বিনী বহিতে পারে, প্রকৃত প্রাণের আবেগ হইলে পাষাণ ভেদ করিয়া—গিরিগহ্বর বিদীর্ণ করিয়া শীতল সলিলের ফোয়ারা খুলিতে পারে। ভক্তকুলচূড়ামণি প্রহ্লাদ তৃষ্ণার্ত্ত-হৃদয়ে চাতকের ন্যায় প্রকৃত প্রাণের ডাক ডাকিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই স্ফটিক-স্তম্ভ ভেদ করিয়া ভীম-গর্জ্জনে মেঘের জলধারা বাহির হইয়া আসিয়াছিল। মহাত্মা ধ্রুব, নিবিড় গহন কান্তারের প্রান্তরে দাঁড়াইয়া তৃষ্ণাব্যাকুলিত প্রাণে মেঘকে যে ভাষায় ডাকিয়া-

ছিলেন, মেঘের দিকে তাকাইয়া যে মরমের কান্না কাঁদিয়াছিলেন, সে ভাষা সে শব্দ জগতের লোক শুনিল না, পার্থিব জীব সে ভাষার মর্ম্ম বুঝিল না, কিন্তু পার্থিব জগতের গণ্ডি ছাড়াইয়া আকাশমণ্ডল ভেদ করিয়া আকাশবিহারী মেঘের কাছে সে শব্দ পৌঁছিয়াছিল। তাই সে মেঘ—সে নব-জলধর-শ্যামসুন্দর প্রাণমনোমোহন দেবতা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অমনি করুণার অমৃত নির্ঝরিণী হইতে প্রেমময় উৎস প্রবাহিত করিয়া তাপিত ভক্তের বিশুষ্ক শূন্য হৃদয়মাঝারে ঢালিয়া দিলেন। ভক্তের সমস্ত বাসনা সমস্ত তৃষ্ণা মিটিয়া গেল।

নারদ একদিন ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, প্রভু! কত ঋষি, কত তপস্বী, কত যোগী তোমাকে ডাকিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের ডাক তুমি শুন না কেন। আজ একটি সামান্য বালক ধ্রুব তোমাকে ডাকিল, আর অমনি তুমি চঞ্চল হইলে কেন? ভগবান্ উত্তর করিলেন, নারদ! তুমি বুঝ না! যাহারা বাস্তবিকই আমাকে ডাকে, আমি তাহাদের উত্তর না দিয়া থাকিতে পারি না। অন্যান্য লোকে আমাকে প্রকৃত ডাক ডাকে না, তাই তাহাদের জন্য চঞ্চল হই না। ধ্রুব যে আমাকে প্রাণের ডাক ডাকিতেছে। কেননা সে যে তৃষিত চাতক। কাজেই স্থির থাকিতে পারিতেছি না। তাই বলি, তৃষিত চাতকের ন্যায় তাঁহাকে ডাকিলে তিনি উত্তর দেন, তৃষ্ণার জল দেন। মুখের ডাকে কিছু হইবে না। বাহিরের ডাকে তিনি সাড়া দিবেন না। প্রাণের নিভৃততম কেন্দ্রস্থল হইতে ডাক দেখি, তোমার আশা পূর্ণ হইবে। তাই একজন নাম-সাধক বলিয়াছেন—

"ডাক্ দেখি মন ডাকার মতন, কেমন মা তোর থাক্‌তে পারে।"

আমরা ব্যাকুল প্রাণে ডাকিতে জানি না। একান্ত নির্ভর হৃদয়ে কাঁদিতে পারি না। তাই দগ্ধপ্রাণে শীতল শান্তিবারি পাই না। বহু তপস্থায় যাহা পাওয়া যায় না, নিদারুণ কৃচ্ছ্র সাধনাতেও যাহার সাধন হয় না, এমন যে দেবদুর্লভ সাধের সামগ্রী, তাহাকে একটিবার প্রাণ ভরিয়া ডাকিলে পাওয়া যায় ইহা অপেক্ষা আর কি সুলভ উপায় আছে? মহাত্মা ভগীরথ যখন কপিলশাপে ভস্মীভূত নিজ পিতৃপিতামহগণের উদ্ধারার্থ গঙ্গার আরাধনা আরম্ভ করিলেন, তখন নারদ আসিয়া বলিলেন, বৎস! ওরূপ কৃচ্ছ্রসাধনা শত বৎসর করিলেও জাহ্নবীর দর্শন পাইবে না। যদি তাঁহাকে পাইতে চাও, তবে তপস্থা ছাড়িয়া একটিবার আকুলপ্রাণে তাঁহাকে ডাক দেখি। সুধু মুখের ডাকে ডাকিলে চলিবে না, হৃদয় খুলিয়া অন্তস্তল উদ্ভিন্ন করিয়া তাঁহাকে ডাক। বালক যেমন ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের কাছে আব্দার করে, তুমিও সেইরূপ ঐ পর্ব্বতের শিখরদেশে উত্তপ্ত কঙ্করস্তূপে লুটাপুটি খাইতে খাইতে তাঁহার জন্য কাঁদ, তবে তাঁহার দর্শন পাইবে, তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে। নারদের এ উপদেশে ভগীরথ প্রবুদ্ধ হইয়া তাহাই করিলেন। তাঁহার সে মর্ম্মভেদী কাতর-ক্রন্দনে জাহ্নবী কি আর স্থির থাকিতে পারেন? অমনি ব্রহ্মার কমণ্ডলু ভেদ করিয়া মহাদেবের জটাল মস্তকতল দিয়া প্রবাহিত হইয়া পতিতপাবনী গঙ্গা পৃথিবীতে আসিয়া পড়িলেন। ভগীরথ গঙ্গাকে বলিলেন, মা! এত দিন ধরিয়া তোমাকে ডাকিতেছি, তোমার জন্য কৃচ্ছ্র তপস্থা করিয়া শরীর জীর্ণ শীর্ণ

হইয়া গেল, অস্থি পঞ্জর খসিয়া গেল, তবু ত তোমার শীঘ্র দয়া হইল না! মাগো তোমার কি কঠিন প্রাণ! পুত্রের প্রতি এই-রূপ নিষ্ঠুর আচরণ মায়ের কি উচিত? ভাগীরথী উত্তর করিলেন কৈ বৎস! তোমার ডাক ত এতদিন আমি শুনিতে পাই নাই। এই মাত্র যে তুমি আমাকে ডাকিলে, আর অমনি তাহা শুনিতে পাইয়া আমি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়াছি। এক তিলার্দ্ধও বিলম্ব হয় নাই। আজ ভগীরথের শতকৃচ্ছ্র সাধনাতেও যাঁহার দর্শন লাভ হয় নাই, তাঁহাকে একটিবার মা মা বলিয়া ডাকিবামাত্র তিনি ছুটিয়া আসিলেন। ধন্য ভগীরথ! আজ তোমারই সার্থক জন্ম! তোমারই মত কুলভূষণ পুত্রের গুণে আজ জাহ্নবীর পবিত্র প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে সগরসন্তানগণ নবজীবন লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়া গেল। তাই বলিতেছি ভগীরথের মত ব্যাকুল হৃদয়ে ডাকিতে পারিলে ভগবচ্চরণার-বিন্দ হইতে প্রেমভক্তির ধারা স্খলিত হইয়া মহাপুরুষগণের হৃদয় দিয়া প্রবাহিত হইয়া, এই মর্ত্ত্য জগতে আপনা আপনিই আসিয়া পড়িবে। ঐ ধারাপ্রবাহে অবগাহন করিয়া আমাদের মত অনধিকারী পতিত দগ্ধ জীবগণ চরিতার্থ হইয়া যাইবে। চির-অশান্ত প্রাণ চির-শান্তিসাগরে নিমগ্ন হইবে। চির-বিশুষ্ক জীবন প্রফুল্ল সহস্রদল কমলের মত হাসিয়া উঠিবে। তখন দেখিব, জগতের কোথাও কিছুই নাই, অশান্তি নাই, অপ্রেম নাই, নিরানন্দ নাই। চারিদিক্ শান্তিময়, চারিদিক্ আনন্দময়, চারি-দিক্ জলময়। অকূল অনন্ত পাথার যেন কেবল চারিদিকে তক্-তক্ করিতেছে। এই দিনেই তৃষ্ণা মিটিবে, সমস্ত কামনার শেষ হইবে।

ভগবান্‌কে যে যে ভাবে চাহে, তিনি সেই ভাবেই তাহার কামনার পূরণ করেন। কেহ বা ধনরূপে কেহ বা স্ত্রী পরিবারাদিরূপে কেহ বা যশরূপে কেহ বা বিদ্যারূপে কেহ বা অন্য কোন গুণরূপে তাঁহাকে চায়। যে যে ভাবে চাহুক না কেন, তিনি তাহাই তাহাকে দেন। কিন্তু যিনি প্রকৃত ভক্ত, তিনি তাঁহার কাছে আর কিছুই চাহেন না। কেননা তিনি তাঁহাকেই চান। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকাপুরীর কাছে প্রভাসযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তখন তিনি কল্পতরুরূপে অনেকেরই মনোবাঞ্ছা পূরণ করিয়াছিলেন। কত লোকে ধন সম্পত্তি ঐশ্বর্য্য তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিয়া লইয়া গেল। তিনি কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই। এক দিন গোকুলধাম হইতে যশোদা কতকগুলি স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে তাঁহার প্রভাস যজ্ঞক্ষেত্রের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। প্রহরীরা তাঁহাদিগকে প্রবেশ করিতে দিল না। তাহারা স্ত্রীলোকগুলিকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কি চাও? তাঁহারা বলিলেন, শুনিয়াছি তোমাদের প্রভু নাকি কল্পতরু হইয়াছেন। তাই তাঁহার কাছে আসিয়াছি। আমরা আর কিছুই চাহি না। আমরা তোমাদের প্রভুটিকেই চাই। দ্বারপালেরা ভগবানের কাছে গিয়া বলিল, প্রভো! কতকগুলি স্ত্রীলোক দ্বারদেশে আসিয়াছে। তাহারা ধন, জন, ঐশ্বর্য্য এ সমস্তের কিছুই চাহে না। তাহারা কেবল আপনাকে চায়। ইহার মর্ম্ম ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। অন্তর্য্যামী ভগবান্ সমস্ত বুঝিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা চল, আমি তাঁহাদের কাছে যাইতেছি।

যশোদা আর কিছু না চাহিয়া ভগবান্‌কেই চাহিয়াছিলেন।

তাই ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু দৌড়িয়া মায়ের কাঁছে আসিলেন। আজ সংসারের সহস্র সহস্র মনোরম প্রলোভনময় সামগ্রী একদিকে পড়িয়া রহিল, যশোদা তাহা প্রার্থনা করিলেন না। সে দিকে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। কেননা যশোদা যে তাঁহাকে চান। যশোদা যে তাঁহার জন্য ভিখারিণী। আজ আসুন আমরাও সেইরূপ ঐ কৃপাকল্পতরুর দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া বলি, প্রভো! ধন, জন, সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য্য এ সমস্ত কিছুই চাহি না। চাহি কেবল তোমার ঐ চরণসাগরনিঃসৃত ভক্তি প্রেমরূপ এক বিন্দু "তৃষ্ণার জল।" শুনিয়াছি তুমি নাকি সুধাসিন্ধু, এক বিন্দু সুধা দান করিলে তোমার ও অক্ষয়ভাণ্ডার শূন্য হইবে না। তাই প্রভো! তোমার দুয়ারে দাঁড়াইয়াছি। অশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া কোথাও তৃষ্ণার জল পাই নাই। তাই এ মনুষ্যদেহে দেব! তোমার চরণে শরণ লইয়াছি। তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়া যাইতেছে, নাথ! এক বিন্দু জল দাও! এ পিপাসাশুষ্ক-কণ্ঠে এক বিন্দু শান্তি-সলিল ছিটাইয়া দাও! জানি প্রভো! তুমি যোগীর কাছে যোগীশ্বর, জ্ঞানীর কাছে সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি, আজ দেখিব, আমার মত দীন দুঃখী কাঙ্গালের কাছে তুমি দয়ার ঠাকুর কি না! এ অনাথ কাঙ্গালকে তোমার দুয়ার হইতে তাড়াইয়া দিও না। তুমি জল দাও আর নাই দাও, তোমার দুয়ারেই পড়িয়া রহিব। আজ তোমার দ্বারদেশে জলাভাবে তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়া যদি মরিয়া যাই, তথাপি অন্যত্র নড়িব না। জগৎকে দেখাইয়া যাইব, তৃষ্ণার জল তোমারই কাছে পাওয়া যায়। আর কোথাও পাওয়া যায় না। প্রভো! ঋদ্ধি চাহি না, সিদ্ধি চাহি না, স্বর্গ অপবর্গ এ সমস্ত কিছুই চাহি না। এ

সংসার মরুভূমে এক বিন্দু জল তোমার কাছে চাই। সংসারের শত সহস্র বৃশ্চিকদংশনে উপেক্ষা করিতে পারি, শত সহস্র বজ্রাঘাত তুচ্ছ বলিয়া গণিতে পারি, যদি ঐ এক বিন্দু জল পাই। যদি জল নিতান্তই না দাও, তাহা হইলে একটিবার জল পাইবার আশাও ত দাও, ক্লান্ত অবসন্ন পথিক নিকটে যদি জলপূর্ণ সরোবর দেখিতে পায়, তাহা হইলে তাহার আশার সঞ্চার হয়, সে জল পান করুক আর নাই করুক, সরোবর দেখিয়াও ত তার প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। আমরাও সেইরূপ জলপান করিতে পাই আর না পাই, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তোমার ঐ নবজলধর শ্যামসুন্দর মোহন মুরলীধর মূর্ত্তিটি যেন দেখিতে পাই। তাহাতেই আমাদের তাপিত জীবন সুশীতল হইবে, সমস্ত তৃষ্ণা—সমস্ত আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া যাইবে।

বক্তৃতার উপক্রমে বলিয়াছি পৃথিবীর সহিত জলের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাই পৃথিবীর জীব জলের জন্য লালায়িত। আকাশাদি জগতের সঙ্গে জলের তত সম্পর্ক নাই, সুতরাং আকাশীয় বা বায়ব জীব জলের জন্য তত ভিখারী নহে। সেইরূপ যাঁহারা জ্ঞান যোগাদি জগতের জীব, তাঁহাদের জলের (ভক্তিরূপ বারিবিন্দুর) আকাঙ্ক্ষা না থাকুক, কিন্তু আমাদের মত পার্থিব—তৃষ্ণাকাতর জীবের পক্ষে "তৃষ্ণার জল" বড়ই মধুর—বড়ই সুন্দর। আমরা জ্ঞানযোগাদি পথের পথিক হইতে পারিব না। কেননা তেমন সামর্থ্য, তেমন বল আমাদের নাই। আমরা কলিযুগের দুর্ব্বল অধিকারী জীব, আমাদের মত দীন দুঃখীর পক্ষে দীননাথের চরণাম্বুজই ভরসা। জ্ঞানের চর্চ্চাই কর, আর যোগের চর্চ্চাই কর, ভক্তি ভিন্ন প্রাণে শান্তি মিলিবে না, নীরস

জীবন সরস হইবে না। উদর পূরিয়া নানাবিধ মিষ্টান্ন ভোজন করনা কেন, ভোজনের শেষে কিন্তু জলপান না করিলে পরিতৃপ্তি হইবে না, প্রাণের পিপাসা ছুটিবে না। চির জীবন ভরিয়া জ্ঞানযোগের সুস্বাদু আস্বাদ গ্রহণ করনা কেন, এ স্বাদু খাদ্য ভোজনের পর ভক্তিবারি পান না করিলে আত্মার পিপাসা ছুটিবে না, পরিতুষ্টি হইবে না।

প্রবৃত্তিমার্গ।

নানাদেশের নানাবিধ দ্রব্যসম্ভার যখন কোন মহামেলায় পুঞ্জীকৃত ও সুসজ্জিত হয়, তখন সেই উত্তম উত্তম পদার্থরাশি দেখিয়া দরিদ্রের চিত্ত লোভে বিমুগ্ধ হয়, মহামেলার সমস্ত মনোরম সামগ্রী একটি একটি করিয়া কিনিতে তাহার সাধ যায়। সুবিশাল মহামেলার সুন্দর বিপণিতে সুসজ্জিত পণ্যরাশি সমস্তই আত্মসাৎ করিতে তাহার প্রাণ যেন আকুলি বিকুলি করিতে থাকে। সেইরূপ এই সংসারক্ষেত্রে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময়ীর অদ্ভুত মহামেলায় আমাদের মত লোভে ক্ষোভে অভাবে অভিভূত দীন দরিদ্র জীবগণ সমবেত। মহামায়ার মহামেলার এ অনন্ত ভাণ্ডারে প্রাণমনোমোহন বিচিত্র পুণ্যরাশি থরে থরে সাজান রহিয়াছে। তাঁহার সত্তায় সত্তাবান্ এই মূল্যবান্ সামগ্রীসম্ভারের দিব্য চমকে আমরা আকৃষ্ট। এ উত্তমোত্তম সমস্ত পদার্থই লইবার জন্য প্রাণ যেন লালায়িত।

আমরা উত্তম বস্তু চাই বটে, কিন্তু উত্তম বস্তু চেনা বড় শক্ত। সময়বিশেষে অবস্থাবিশেষে স্থানবিশেষে লোকবিশেষে যাহা উত্তম, অন্যের পক্ষে তাহাই হয়তো মন্দ বোধ হয়, শৈশবে যাহা ভাল লাগে, যৌবনে তাহা হেয়, আবার যৌবনে যাহা হেয় তাহাই বার্দ্ধক্যে আবার উপাদেয় বলিয়া বোধ হয়। হয় তো তোমার অবস্থাদির অনুকূল হওয়ায় তোমার পক্ষে যাহা ভাল, তাহাই আমার অবস্থাদির প্রতিকূল হওয়ায় আমার পক্ষে মন্দ। দেশ, কাল, পাত্র, অবস্থানির্ব্বিশেষে যাহা উত্তম তাহা চিনিয়া লওয়া বড়ই কঠিন। অনেক সময় আমরা মন্দকে ভাল বলিয়া বুঝি, এবং ভালকে মন্দ বলিয়া পরিত্যাগ করি। অনাদি কাল হইতে এই ভ্রান্তিরূপ অবিদ্যাবেশের বশীভূত হইয়া জীব এ মহামেলা-ক্ষেত্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

এই সুবিস্তীর্ণ সংসার-মহামেলায় জীবের সম্মুখে অনন্ত কর্ত্তব্য পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু এই অসীম কার্য্যস্তরের মধ্যে কোন্‌টি আমাদের অপরিহার্য্য নিজ কর্ত্তব্য তাহা প্রথমে বুঝিতে হইবে। দোকানে থরে থরে সাজান জিনিষের মধ্যে যেটি আমাদের মনোমত ও অতি প্রয়োজনীয় উত্তম জিনিষ, তাহাই বাছিয়া লইতে হইবে। আমাদের পরমায়ু অল্প, আমাদের শক্তি সামর্থ্য নিতান্তই ক্ষীণ, সুতরাং আমরা দীন দরিদ্র পথের কাঙ্গাল। অনন্ত শাস্ত্রের বিশালগর্ভে অনন্ত মূল্যবান্ তত্ত্বরূপ পণ্যরাশি নিহিত আছে। সে সমস্তই ক্রয় করিবার সাধ্য আমাদের নাই। সুতরাং সে সমস্তের দিকে লোভলোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার প্রয়োজন কি? যাহা আমাদের নিজের পক্ষে প্রয়োজনীয়, যাহা আমাদের নিজের উপকারে আসিতে

পারে, তাহাই আমাদিগকে বাছিয়া লইতে হইবে। কিন্তু বাছিয়া লইবার উপায় কি? আমাদের স্বেচ্ছা আমাদিগকে যে দিকে লইয়া যায়, আমাদের প্রবৃত্তি আমাদিগকে যে পথে পরিচালিত করে, তদনুসারে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণই কি ঠিক? কিন্তু তাহাই বা কেমন করিয়া হইতে পারে? আমাদের প্রবৃত্তি যাহা চায়, তাহাই যে আমাদের পক্ষে উত্তম, তাহাই যে আমাদের হিতকারী, তাহা কে বলিল? অনেক সময়ে স্বেচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা সুপথ ভাবিয়া কুপথে গিয়া পড়ি। প্রবৃত্তির তাড়নায় অনেক সময়েই কু সু বিচার করিবার শক্তি থাকে না। সুতরাং স্বেচ্ছামত 'উত্তম' বস্তু নির্ব্বাচন করা বড়ই দুষ্কর! কিন্তু জগতের জীব স্বেচ্ছাভিমত উত্তম বস্তু পাইবার জন্যই লালায়িত। প্রবৃত্তি-রাগরঞ্জিত উত্তম পদার্থের প্রত্যাশায় জীব আকুলিত। যাহা প্রবৃত্তির অনুকূল, অথচ "উত্তম", তাহাই পাইবার জন্য জীবের অন্তরাত্মা পিপাসু। বৈদান্তিক প্রবৃত্তির মস্তকে পদাঘাত করেন, আমাদের মত অনধিকারী জীব কিন্তু প্রবৃত্তির দাস সুতরাং প্রবৃত্তিকে আমরা ছাড়িতে পারিব না। যে প্রবৃত্তি নিজ প্রকৃতির প্রতিকূল, তাহা অবশ্যই পরিহার্য্য। কিন্তু যে প্রবৃত্তি স্বভাবসূত্রে চালিত হইয়া প্রকৃতির চারু চরণ চুম্বন করিতে পারে, তাহা কখনই জীবকে কর্ত্তব্যপথ-ভ্রষ্ট করে না। প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ দূষিত পদার্থ নহে। এ আবর্জ্জনাময় সংসারে পড়িয়াই ময়লা-মাটিমাখা হইয়া প্রবৃত্তি দূষিত বা মলিন হইয়া পড়িয়াছে। শাস্ত্র-আজ্ঞা পরিপালনরূপ পবিত্র গঙ্গাজলে তাহাকে ধুইয়া পরিষ্কার ঝর্ঝরে করিয়া লইতে হইবে। তাহার সাংসারিক কালিঝুলি মাখা মূর্ত্তি পরিমার্জ্জিত করিয়া সুঠাম সুন্দর করিয়া

লইতে হইবে। প্রবৃত্তির গতি অবিদ্যা-বিকৃতির মুখ হইতে ফিরাইয়া প্রকৃতির সম্মুখীন করিয়া লইতে হইবে। পরিমার্জ্জিত প্রবৃত্তিই নিবৃত্তির প্রসূতি।

অনেকে সন্দেহ করিতে পারেন, প্রবৃত্তিকে নিজ ঈপ্সিত পথে যাইতে না দিয়া তাহাকে সংযত—নিয়মিত করিলে তাহাতে সুখ কি? প্রবৃত্তির গতি সঙ্কুচিত করিলে তাহাতে যে অশান্তি আরও বাড়িয়া উঠে। এ সন্দেহ নিতান্তই ভ্রমাত্মক। পঞ্চম বর্ষীয় বালক রৌদ্রে দৌড়াদৌড়ি করিতে চায়! পিতা তাহার দৌড়ান-প্রবৃত্তি সংযত-করিয়া তাহাকে ধীরগমন শিক্ষা দিলেন। এইরূপ প্রবৃত্তির সংযমনে বালকের আপাততঃ একটু অতৃপ্তি জন্মিল বটে, কিন্তু তাহার পরিণামফল যে মঙ্গলময়, তাহা বালক এখন বুঝিল না, কিন্তু পরে বুঝিবে। সুতরাং প্রবৃত্তির সংযমনে আপাততঃ একটু দুঃখ হয় বটে, কিন্তু তাহার পরিণাম ফল সুখময়। স্বেচ্ছাচারী আপনার ক্রিয়াকেই ভালবাসে, বুদ্ধিমান্‌গণ ক্রিয়ার পরিণাম-ফলের দিকে তাকাইয়া ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন। অপরিণামদর্শী বিমূঢ়চেতাগণ ক্রিয়ার ফল-সন্ধানে অসমর্থ হয়, তাই প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে পারে না—চায়ও না।

আমাদের যাহা মনোরঞ্জনকর—আশুসুখকর, প্রবৃত্তি আমা-দিগকে সেইদিকে লইয়া যাইতে চায়, কিন্তু তাহাতে পরম কল্যাণলাভের আশা সুদূরপরাহত। আমাদের যাহাতে প্রকৃত মঙ্গল হয়, যাহাতে নিত্য নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভ হয়, প্রবৃত্তিকে সেই পথের পথিক করা উচিত। মহামেলায় গ্রহণোপযোগী নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত থাকে। চক্‌চকে খেলেনা দেখিয়া

বালকের মন ভুলিয়া যায়। সুতরাং তাহা লইবার জন্য বালক চঞ্চল হয়। কেননা অপরিপক্ক বালকবুদ্ধিজন্য তাই তাহার ভাল লাগে। কিন্তু বুদ্ধিমান্ বহুদর্শী ব্যক্তি খেলেনার চমকে ভুলেন না, তিনি তেমন জিনিষ বাছিয়া গ্রহণ করেন, যাহা তাঁহার প্রয়োজনীয়, যাহাতে তাঁহার ভাল হয়, যাহা তাঁহার নিজের উপকারে আসিতে পারে। এ সংসার-মহামেলায় যিনি সুচতুর, তিনি টুকটুকে মাকালফলের সৌন্দর্য্যে ভুলেন না, তিনি তেমন জিনিষ প্রবৃত্তির অনুকূল করিয়া লন, যাহাতে তাঁহার মঙ্গল হয়। সুতরাং প্রবৃত্তির সকল কথাই শুনিলে চলিবে না। স্থলবিশেষে প্রবৃত্তির বল্গা সংযত করিতে হইবে। গুরুজনের নির্দেশানুসারে, শাস্ত্রের ইঙ্গিতানুসারে প্রবৃত্তিকে সুগঠিত ও সুপথে চালিত করিতে হইবে। কিন্তু অভিমানে পরিপূর্ণ জীব নিজ প্রবৃত্তিকে এতই অভ্রান্ত মনে করেন যে, তিনি কাহারও কথা না শুনিয়া স্বেচ্ছার স্বাধীনতাই দিতে চাহেন। অভিমানই যাহার সর্ব্বস্ব, তাহার পদতলে শাস্ত্র-আজ্ঞা, গুরুবাক্য, সাধুদিগের সদুপদেশরাশি বিমর্দ্দিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যাহার দোকানে যে বস্তু অধিক, সে তাহাই সম্মুখে সাজাইয়া রাখে। ক্রেতাকে তাহাই দিয়া সে পরিতৃপ্ত করিতে চায়। সেইরূপ যাহার সাধুতা বিন্দু-মাত্র নাই অভিমানই অধিক; সে নিজের দোকানে অভি-মানের পশরাই সাজাইয়া রাখে। সুতরাং তাহার কাছে অভিমান ছাড়া আর কি পাওয়া যাইতে পারে? যে যে দরের লোক, সে সেইরূপ দরের লোকের মণ্ডলীতেই ঘুরিয়া থাকে। যাহার মর্য্যাদা নীচ, সে নীচ শ্রেণীর মণ্ডলীতেই যাইতে সুখ

বোধ করে। অভিমানের সঙ্কীর্ণ মর্য্যাদা যাহার সম্বল, তাহার নিরভিমান অনন্ত মর্য্যাদার আধার পরব্রহ্মের দিকে কেমন করিয়া গতি হইতে পারে? তাই বলিতেছি, অভিমান পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্র-আজ্ঞা অনুসারে প্রবৃত্তিকে সংযত—সুমার্জ্জিত করিয়া লইতে হইবে। ঘরকন্নার কোন সামান্য জিনিষ ব্যবহার করিতে হইলে আমরা তাহা ধৌত করিয়া—মার্জ্জিত করিয়া লই। আর অনন্ত ব্রহ্মের উচ্চ দরবারে যাইবার জন্য যে প্রবৃত্তিকে আমরা ব্যবহার করিতে চাই, তাহাকে ধৌত করিয়া লইতে হইবে না, এ কোন্ কথা? স্বভাবসূত্রে প্রবৃত্তিকে আমরা পাইয়াছি, সুতরাং তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিব না, ইহা ঠিক। কিন্তু তাহাকে পরিমার্জ্জিত করিয়া নিজ জীবনের অবশ্য কর্ত্তব্য সাধনোপযোগিনী করিবার ক্ষমতা আমাদের আছে। যাহা আমাদের স্বাভাবিক, তাহা ত্যাগ করা অসম্ভব। আমরা স্বভাবসূত্রে চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি পাইয়াছি। স্ফীতালোকে উন্মুক্ত চক্ষুর সম্মুখে পদার্থ আসিলেই দৃষ্টিশক্তির তাহা গোচর হইবেই হইবে। শত চেষ্টা করিলেও এ দৃষ্টিশক্তির গতি কেহ রুদ্ধ করিতে পারিবে না। সেইরূপ স্বভাবসূত্রে কতকগুলি সংস্কার আমরা স্ব স্ব কর্ম্মসূত্রে পিতা মাতার কাছ হইতে ও অন্যান্য নানা কারণে পাইয়াছি। স্নেহ, মায়া, মমতা, প্রীতি প্রবৃত্তি আদি সমস্তই পাইয়াছি। এই স্বাভাবিক বৃত্তিগুলিকে একেবারেই পরিহার করিব কেমন করিয়া? স্বভাবসূত্রে শরীরের শ্যামবর্ণ লইয়া যে জন্মিয়াছে, শত চেষ্টা করিলেও তাহার সে বর্ণ একবারে উঠাইতে পারা যায় কি? উঠাইতে পারা যায় না, কিন্তু মাজিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া

লওয়া যাইতে পারে। সেইরূপ স্বভাব-সিদ্ধ সংস্কারকে শত শিক্ষা দিলেও উঠাইতে পারা যাইবে না, কিন্তু শিক্ষার গুণে মার্জ্জিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। বৈদান্তিক প্রবৃত্তিকে তুচ্ছ—নিকৃষ্ট—আবর্জ্জনা বলিয়া পরিত্যাগ করিতে চাহেন, আমরা কিন্তু তাহা চাহি না। যে মাটি—যে কর্দ্দমকে তোমরা আবর্জ্জনা বলিয়া পরিত্যাগ করিতে চাও, যিনি উপাসক, তিনি সেই মাটিতে শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া নিজের সাধের উপাস্য দেবতার প্রতিষ্ঠা করেন। যে সংস্কার—যে প্রবৃত্তিকে তোমরা আবর্জ্জনা—সংসারবন্ধনের হেতুভূত বলিয়া ত্যাগ করিতে চাও, আমরা তাহাকে শিবলিঙ্গের ন্যায় সদাকারাকারিত করিয়া ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইতে চাই—সংসারবন্ধন মোচন করিতে চাই। সুবর্ণ যখন পিণ্ডাকারে থাকে, তখন তাহার ব্যবহার হয় না সত্য, কিন্তু তাহা যখন স্বর্ণকারের হাতে পড়ে, তখন অলঙ্কার-রূপে পরিণত হইয়া সে সুবর্ণবরণীয় কান্তিময় দিব্যমূর্ত্তিতে উদ্ভাসিত হয়। সেইরূপ ভগবৎ-প্রসাদে এই মনুষ্যদেহে অনেক সুবর্ণ লইয়া আমরা জন্মিয়াছি। প্রকৃত শিল্পনিপুণ স্বর্ণকারের সাহায্যে সে সুবর্ণে বিচিত্র অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে হইবে। সে অলঙ্কাররাশি অঞ্জলি পুরিয়া জগন্মাতার অলক্তকুঙ্কুমদামরঞ্জিত চরণাম্বুজে যে দিন উপহার দিব, সেই দিনই সাধ মিটিবে, প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইবে। তখন প্রবৃত্তি নিবৃত্তিকে নিরাশ করিয়া নিত্য নির্ম্মল নিকেতনে তোমার নিবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রবৃত্তিকে মূল প্রকৃতির অনুকূল করিয়া লইতে হইবে। জীবের ক্ষুদ্র প্রকৃতি নীরবে মূল প্রকৃতির দিকে মুখ ফিরাইয়া সতৃষ্ণভাবে যাহা চায়, সেই প্রার্থনা পূরণ করিবার

জন্য প্রবৃত্তি সর্ব্বদা পরিচর্য্যা করিতে থাকিবে। মূল প্রকৃতিকে উন্মুখ করিয়া প্রবৃত্তি যাহাতে তদভিমুখীন হয়, সেইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভূমিষ্ঠ হইয়া শিশু প্রথমে ক্ষুধায় কাতর হইয়া যখন কাঁদিয়া উঠে, সে তখন বুঝিতে পারে না কিসের জন্য সে কাঁদিতেছে, তাহার কি ক্লেশ হইতেছে। কি পাইলে তাহার কান্না নিবৃত্ত হইতে পারে, সে তাহা জানে না। তাহার শারীরপ্রকৃতি কি অভাবগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা সে বুঝিতেছে না। অপরকে মুখ ফুটিয়াও বুঝাইতে পারিতেছে না। তাহার প্রাণ কিসের জন্য ব্যাকুল সে তাহা না বলিতে পারিলেও তাহার ক্ষুধাবিহ্বল শারীরপ্রকৃতি নীরবভাষায় তাহা বলিয়া দিতেছে। সেই প্রকৃতির জননী মূলপ্রকৃতি অর্থাৎ বালকের মাতা শারীর-প্রকৃতির সেই গুহ্য মর্ম্মগাঁথা বুঝিতে পারেন। তাই তিনি স্তন লইয়া বালকের মুখে দেন, সে স্তন চুষিয়া দুগ্ধপান করিবার জন্য শিশুর প্রবৃত্তি স্বত এব ফুটিয়া উঠে। শিশুর ক্ষুধাবিশুষ্ক শারীর-প্রকৃতি দুগ্ধধারায় পরিতৃপ্ত হইয়া প্রফুল্ল হয়। শিশুর শারীর-প্রকৃতির ক্ষুধারূপ তাৎকালিক অভাব যেমন মাতার স্তন্যপানে পূর্ণ হয়, সেইরূপ জীবপ্রকৃতির অন্তস্তলে যে অভাব-রেখা—যে প্রাণের মজ্জাগত ক্ষুধা—যে অতৃপ্তি অনাদিকাল হইতে অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মত সূক্ষ্মরূপে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, সে অভাব—সে অতৃপ্তি জগন্মাতা মূলপ্রকৃতি মা অন্নপূর্ণার স্তন্যপানে যেদিন পরিতৃপ্ত হইবে, সেই দিনই জীবের কান্না থামিবে, কোলাহল—কলরব বন্ধ হইবে, ইন্দ্রিয়-চাপল্য, মনশ্চাঞ্চল্য স্তম্ভিত হইয়া আসিবে, হৃদয় সুশীতল হইবে, দুঃখ দুর্ব্বিপত্তি বিনিবৃত্ত হইয়া যাইবে। মায়ের কোলে

মায়ের ছেলে চিরদিনের জন্য ঘুমাইয়া পড়িবে। সচেতনে শান্তিসুধাপানে অচেতন হইয়া থাকিবে। শিশুর শারীরপ্রকৃতি ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতর হইয়া মায়ের দিকে তাকাইয়া যেমন কাঁদিয়া উঠে, সেইরূপ জীবপ্রকৃতি গুরুদত্ত উপদেশে নিজের চিরদিনের মজ্জাগত অভাব—প্রাণের মর্ম্মগত ক্ষুধা জাগ্রত করিয়া মূলপ্রকৃতি জগন্মাতা অন্নপূর্ণার চরণতলে মাথা রাখিয়া যে দিন কাঁদিয়া উঠিবে, সেই দিন দুগ্ধান্নপূর্ণবরকাঞ্চনদর্ব্বীহস্তা রাজরাজেশ্বরী মায়ের দুগ্ধামৃতধারায় জীবের আকাঙ্ক্ষা—প্রবৃত্তি-প্রবাহ চরিতার্থ হইবে—চিরদিনের সাধ মিটিবে। অনন্তপ্রকৃতি-রূপিণী মা ক্ষুদ্র জীবপ্রকৃতিকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য—প্রকৃতির অনুগামিনী প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিবার জন্য সর্ব্বদাই ত উন্মুখী হইয়া রহিয়াছেন, কিন্তু আমাদের প্রবৃত্তি মা মুখী না হইয়া—প্রকৃতির অভিমুখী না হইয়া চিরদিনই বিকৃতির পথে চালিত হইয়া আসিতেছে। শাস্ত্রের আদেশে গুরুর নিদেশে প্রবৃত্তিকে প্রকৃতির সম্মুখীন করিতে হইবে, প্রবৃত্তির স্রোত উল্টাইয়া দিতে হইবে। মানবের ব্যক্তিগত প্রকৃতির গুহ্যতত্ত্ব যিনি বুঝিতে পারেন, কোন্ উপাদানে—কোন্ গুণের কিরূপ অংশে কাহার প্রকৃতি গঠিত, প্রকৃতি কোন্ দোষে উহা অনাত্মা প্রকৃতির সহিত সম্মিলিত হইতে পারিতেছে না ও কোন্ ঔষধেই বা এই রোগ নিবৃত্ত হইবে, এতাবৎ যিনি সম্যগ্রূপে অবগত আছেন, প্রকৃতিকে তাঁহারই কথানুসারে পরিচালিত করিতে হইবে। তাহা হইলে প্রবৃত্তি আর বন্ধনের হেতু হইবে না।

কেহ কেহ আশঙ্কা করিতে পারেন, আমাদের প্রবৃত্তি কোন্

পথে চালিত হইলে কিরূপ সুখলাভ হয়, আমরা চিন্তা করিয়া তাহা বুঝিতে পারি। তাহাতে গুরু উপদেশ, শাস্ত্রকর্ত্তা ব্যাস বশিষ্ঠের উপদেশ শুনিবার প্রয়োজন কি! তাঁহারা হস্তপদ-বিশিষ্ট মানুষ, আমরাও মানুষ। তাঁহাদের বুদ্ধিশক্তি বিচার-শক্তি চিন্তাশক্তি ছিল, আমাদেরও আছে। সুতরাং তাঁহাদের সহিত আমাদের এমন কি বিভিন্নতা আছে, যে তাঁহারা সকল বিষয়ে মঙ্গলামঙ্গল আমাদের অপেক্ষা বেশী বুঝিতেন। এমন কি পার্থক্য আছে যে তাঁহাদের কথা মানিতেই হইবে। এ আশঙ্কার আর উত্তর দিব কি? জ্ঞানবৃদ্ধ ঋষিগণকে আমাদের সমানস্তরে যিনি আনিতে চাহেন, তিনি নিতান্তই অজ্ঞ ও বাতুল। ঋষিদের সহিত আমাদের প্রভেদ বিস্তর। পরীক্ষা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা বুঝাইতেছি। একটা লৌহনির্ম্মিত সূচিকে চুম্বকে ঘর্ষণ করিলে তাহাতেও আকর্ষণী শক্তির সঞ্চার হয়। সে চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়। সেই চুম্বকত্বপ্রাপ্ত (Magnetized) সূচিকে অপর একটা লৌহ-নির্ম্মিত সাধারণ সূচির নিকট রাখিয়া দেখিলে দুইটিকেই সমান বলিয়া বোধ হয়। কেননা দুইটির আকৃতিগত কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু পরীক্ষার নিকষে কষিলে দুইটির পার্থক্য স্পষ্ট বুঝা যায়। অপর একটা লৌহনির্ম্মিত সূচিকে সেই দুইটির কাছে আন দেখি, দেখিবে, সে ছুঁচটি সেই আকর্ষণীশক্তিসম্পন্ন সূচির দিকেই দৌড়িয়া যাইবে। কেননা সে তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে। তখন অপর ছুঁচটির স্বভাব প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তখন বুঝিতে পারা যায়, উভয়ের আকৃতিগত সাদৃশ্য থাকিলেও প্রকৃতিগত—শক্তিগত কত পার্থক্য। সেইরূপ তোমার আমার

সহিত ব্যাস বশিষ্ঠের আকৃতিগত পার্থক্য না থাকিলেও প্রকৃতি-গত—সাধন-শক্তিগত বিলক্ষণ পার্থক্য আছে। বেদব্যাস ম্যাগ্‌নেটাইজ্‌ড ছুঁচ আর তুমি আমি কেবলই ছুঁচ (অর্থাৎ ছুঁচো), বেদব্যাসের "তাপসী" শক্তি তাঁহাকে বরণীয় করিয়াছে, তাঁহার প্রকৃতি গঙ্গার সাগর-সঙ্গমের ন্যায় অনাত্মা প্রকৃতির সহিত অভিন্নভাবে সম্মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। তাই জগৎ তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইয়া দৌড়িতেছে। আর আমাদের "তামসী" শক্তি আমাদিগকে জড়বুদ্ধি ও মলিন করিয়া তুলিয়াছে। তাই আমরা দিন দিন জগতের বাহির হইয়া পড়িতেছি। সুতরাং প্রভেদ বিস্তর। স্বর্গ ও নরকে আকাশ ও পাতালে যত খানি প্রভেদ, বেদব্যাস ও আমাদের মধ্যে ততখানি প্রভেদ। আমরা নরকের কীট হইয়া দেবতার আসনে বসিতে যাই। শৃগাল হইয়া সিংহের অধিকার কাড়িয়া লইতে চাই। আমাদের এ অপরাধ মার্জ্জনীয় নহে।

কি ধর্ম্মরাজ্যে কি সাংসারিক রাজ্যে সর্ব্বত্রই প্রবৃত্তিকে উচ্ছৃঙ্খল ঘোটকের মত উন্মুক্ত ময়দানে ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। যখন যাহা প্রাণ চাহিবে, তখনই তাহা করিলে দুর্ব্বিপত্তির সাগরে ডুবিতে হয়। দেশ, কাল, পাত্রভেদে পিতা মাতা ও গুরুজনের আজ্ঞা ও আপ্তবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া এই নানাবিধ বিঘ্নসঙ্কুল ঘূর্ণাবর্ত্তবিক্ষোভিত সংসারসমুদ্রবক্ষে প্রবৃত্তি-তরণিকে ধীরে ধীরে চালাইতে হইবে। এ দুস্তর ভবার্ণবে তুফানের ভয় আছে, প্রবল ঝটিকার আশঙ্কা আছে, গুপ্ত পাহাড় পর্ব্বতে ধাক্কা লাগিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং সকল দিক্ সাম্‌লাইতে হইলে, গুরু-কর্ণধারের

প্রয়োজন। স্বেচ্ছার স্রোতে গা ভাসাইলে চলিবে না। স্বেচ্ছাচারী জীব কখনও তৃপ্তি পায় না। তাহার অতৃপ্তি দিন দিন বাড়িয়া উঠে।

জীবপ্রকৃতির অভাব—আকাঙ্ক্ষা অনাদি অনন্ত। এ অনন্ত অভাবকে পরিপূরণ করিতে শান্ত পরিচ্ছিন্ন সাংসারিক বিকৃতিময় জগৎ সমর্থ হইবে কেন? যে নিজে সীমাবিশিষ্ট, সে অসীমকে আয়ত্ত করিতে পারিবে কেন? যে নিজে ক্ষুদ্র, সে মহৎকে আবরণ করিতে পারিবে কেন? যাহার তৃষ্ণা বিশ্বব্যাপিনী, ক্ষুদ্র জলাশয়ের স্বল্প সলিলে তাহার কি কুলাইয়া উঠে? অগস্ত্য মুনির মত যাহার তৃষ্ণার বিরাট মূর্ত্তি, তাহার জন্য অগাধ সাগরের অসীম জলরাশি চাই, অনন্ত নির্ঝরিণীর অফুরন্ত শীতল সলিলধারা চাই, যাহা চিরদিন প্রাণ ভরিয়া পান করিলেও ফুরাইবে না। অনন্ত মূলপ্রকৃতি আদ্যাশক্তিই ঐ শান্তময়ী অমৃতনির্ঝরিণী। আইস জীব! ঐ প্রেমমন্দাকিনীর তটদেশে একবার আসিয়া দাঁড়াও। ত্রিতাপতপ্ত দেহ যদি জুড়াইতে চাও, ঐ পতিতপাবনী পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর ঘাটে নামিয়া অবগাহন কর। পিপাসু জীব! কোন্ নির্ঝরিণী হইতে ঐ প্রেমপ্রবাহ বাহির হইয়া আসিয়াছে, তৃষ্ণার্ত্ত তুমি, তোমার তাহা জানিবার প্রয়োজন কি? ও ব্রহ্মতত্ত্বরূপ ঝরণার মূলতত্ত্ব নাই বুঝিলে? তোমার আমার মত ক্ষুদ্র জীবের ও অনন্ত তত্ত্ব বুঝিয়া লাভ কি? বুঝিবার সামর্থ্যই বা কোথায়! তোমার পিপাসা জন্মিয়াছে। গঙ্গার উৎপত্তিস্থান নাই বুঝিলে, গঙ্গার যে ঘাটে নামিবে, তোমার তৃষ্ণার মত জল সর্ব্বত্রই পাইবে। আমাদের মত ক্ষুদ্র জীবের অভাবরূপ

গোষ্পদখাত তাঁহার অনন্তসত্তার প্রবাহে নিমেষ মধ্যে পরিপূর্ণ হইয়া কোথায় ভাসিয়া যায়। বিচার বিতর্ক ছাড়িয়া দাও, বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞানের অভিমান উড়াইয়া দাও, মান অপমানের ভাণ দূর করিয়া দাও। এদিক্ ওদিক তাকাইও না, সংসারমেলার কোলাহলে কর্ণপাত করিও না, পাঁচ জনের কথায় নিজের কাজ হারাইও না, মানবদেহ ধারণের শুভলগ্ন বৃথা নষ্ট করিও না। মনের অনুরাগে অন্তর্যাগে তৃষ্ণার আবেগে মায়ের চরণাগ্রভাগের অমৃতময় স্রোতে গা ঢালিয়া দাও, তোমার ত্রিতাপজ্বালা মিটিবা যাক্। সেই অঘটনঘটন-পটীয়সী মহামায়ার অনন্ত শক্তি—অনন্ত মাহাত্ম্যের তুলনায় তোমার আমার মত কীটাণুকীটের অভাব নিতান্তই তুচ্ছ—নিতান্তই নগণ্য। এ তুচ্ছাতিতুচ্ছ অভাবের জন্য তাঁহার দয়া ভিক্ষা করিতেও ভরসা হয় না। যিনি রাজাধিরাজ, মণি মুক্তা হীরকাদি যাঁহার সতত সঙ্গে থাকে, তাঁহার কাছে দুইটি পয়সার ভিক্ষুক হইয়া তাঁহাকে বাক্স খুলিতে যে অনুরোধ করে, সে কি পাগল নহে? সেইরূপ চতুর্ব্বর্গ ফল যাঁহার পদকল্পতরুতলে কুড়াইয়া পাওয়া যায়, সেই রাজরাজেশ্বরী মায়ের কাছে আমার মত ক্ষুদ্র জীবের ক্ষুদ্র অভাব পূরণ জন্য দয়ার ভাণ্ডার খুলিতে অনুরোধ করা কি নিতান্তই অজ্ঞতা নহে? সুতরাং কোন্ সাহসে তাঁহার কাছে দয়ার প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইব? কেহ কেহ তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিয়া থাকেন, মা! আমাদিগকে ভক্তি দাও! আমি কিন্তু বুঝি, আমরা এ প্রার্থনারও অধিকারী নহি। দয়াময়ী মা দয়া করিয়া যদি আমাদিগকে ভক্তি দিতেই আসেন, তাহা হইলে তাঁহার সে প্রদত্ত ভক্তি রাখিব কোথায়? এ অপবিত্র হৃদয়ের বিষ্ঠাকুণ্ডে

সে সুধাধারা ধরিব কেমন করিয়া? এ কঠিন পাষাণে সে সুকোমল অমৃতবল্লরীকে রোপণ করিব কেমন করিয়া? ভক্ত-হৃদয়ের দেবমন্দিরে নিভৃতকক্ষে যে কৌস্তভমণি অতি যতনে, গোপনে রক্ষিত হয়, তাহাকে আমার এই দস্যুপরিবেষ্টিত হৃদয়াগারে রাখিব কোন্ ভরসায়? সুতরাং তাঁহার কাছে চাহিব কি? তাঁহার কাছে চাহিব, মা! আমার সম্মুখে একবার দাঁড়াও, এ অপবিত্র হৃদয় পবিত্র হইয়া যাউক! এ অপরিষ্কৃত হৃদয়ক্ষেত্র পরিষ্কৃত করিয়া তোমার নিজের বসিবার উপযোগী করিয়া লও। এ বজ্রসম কঠোর হৃদয়ে কুসুমাস্তরণ বিছাইয়া লও। মা! ইচ্ছা হয়, তোমার দাস বলিয়া আপনাকে মনে করি, কিন্তু মনঃ প্রাণ তখন চমকিয়া বলে, বিধি বিষ্ণু শিব যাঁহার দাস, তাঁহার দাসত্ব করিতে চাও কোন্ সাহসে! দেবি! তোমাকে "মা" বলিতে বড় সাধ যায়। কিন্তু যখন ভাবি, তখন তাহাও বলিতে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। কার্ত্তিকেয়ের মত জিতেন্দ্রিয় মহাবীর ও সুরনরবন্দিত গণাধিনায়ক যাঁহার পুত্র, আমার মত তুচ্ছ জীব তাঁহাকে মা বলিতে পারে কোন্ সাহসে? তোমাকে "ভক্তবৎসল" বলিয়াও ডাকিতে পারি না, কেননা আমি যে পরম অভক্ত। বলিতে পারি তোমাকে "অনাথবৎসল।" কেননা আমার মত অনাথ দীন দুঃখী এ জগতে আর কেহ নাই। শাস্ত্রে তোমার সহস্রমূর্ত্তি ধারণের কথা শুনিতে পাই। আমার ইন্দ্রিয়গ্রাম উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে। হৃদয়ের অন্তর্যামী দেবতা তুমি, একবার "হৃষীকেশ" মূর্ত্তিতে অন্তরে আবির্ভূত হও। ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে চারু

চরণাভিমুখে চালিত কর। আমার উন্মত্ত মন মাতঙ্গ উদ্দাম হইয়া নানা পথে দৌড়িতেছে। তুমি অঙ্কুশচিহ্নিত চরণস্পর্শে তাহাকে সুশাসিত কর! মা! কোন্ ভাষায় তোমাকে ডাকিতে হয় তাহা জানি না, কিরূপ সুসংস্কৃত ভাষায় ডাকিলে তুমি কাছে আসিয়া দর্শন দাও, তাহা বুঝি না। শুনিয়াছি, গজকচ্ছপের যখন যুদ্ধ হইয়াছিল, তখন কাতর গজরাজের আর্ত্তনাদে আহূত হইয়া তুমি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণুরূপে দৌড়িয়া আসিয়াছিলে, গজের ভাষা তুমি শুনিতে পাও, আর মনুষ্যের ভাষা শুনিতে পাও না, ইহা ত মনে হয় না! তাই বলি মা! সংসারে সকল কথা ফুরাইয়া দাও, সকল বৃত্তি উড়াইয়া দাও, সকল বাসনা পুড়াইয়া দাও, আমার সকল অভাব ভাসাইয়া দাও, প্রবৃত্তিপ্রবাহকে তোমার চরণরেণুতে মিশাইয়া দাও।

ভারতে উৎসব। *

দুঃখ দুর্ব্বিপত্তির নিদারুণ বজ্রাঘাতে দেহ মনঃ প্রাণ জীর্ণ ও বিশীর্ণ হইয়া যাইতেছে, যন্ত্রণার বিষম নিষ্পেশনে অস্থি পঞ্জর খসিয়া পড়িতেছে, এমন দুঃসময়েও দুঃখী যদি সুখের স্বপ্ন দেখিতে পায়, ঘোর অন্ধকারেও দীনদুঃখীর পর্ণ কুটিরে ক্ষুদ্র আলোকের রেখা যদি দেখা দেয়, তাহা হইলে সে স্বপ্ন অমূলক হউক, সে তুচ্ছ আলোক ক্ষীণ হউক, ক্ষণিক হউক, সে মুহূর্ত্তের জন্য সে সুখের কণিকায় দুঃখীর মনঃ প্রাণ নাচিয়া উঠে—নিমিষের জন্য দুঃখের তীব্রতা সে ভুলিয়া যায়। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার চির আঁধার গৃহ উজিয়ারা হইয়া উঠে। আজ ভারতবর্ষের মহা দুর্দ্দিন—বিষম দুর্ব্বিপত্তির সময়। এ দুঃসময়ে ভারতে উৎসবের কথা স্বপ্নের মত হইতে পারে, কিন্তু এ স্বপ্নেও সুখ আছে, শান্তি আছে, এ ভীষণ নৈরাশ্যের সাগরে আশা ভরসার অভয়কাহিনীর কণিকামাত্র শুনিলেও প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠে। অনেকে বলিতে পারেন, আজি এ দুঃখের দিনে সুখের কথা কেন? বর্ত্তমান ভারতবর্ষ দুঃখসাগরে নিমগ্ন। কি রাজনীতি কি সমাজনীতি কি অর্থনীতি কি ধর্ম্মনীতি সকল বিষয়েই ত ভারত হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

---

* কুণ্ডলা-হরিসভার উৎসবোপলক্ষে এই বক্তৃতাটি হইয়াছিল।

ভারতের বিচিত্র প্রসাদের চারিদিকেই ত অগ্নি লাগিয়া পুড়িয়া ছারখার হইতেছে, এমন দুঃখের দিনে ত মাথায় হাত দিয়া কাঁদিবারই কথা। এমন সময় উৎসব কেন? এ অকাণ্ডতাণ্ডব কেন? যদি কোন নূতন সমৃদ্ধি লাভ হয়, নূতন শ্রী প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবেই ত উৎসব করিবার কথা। কিন্তু ভারত ত যে পরাধীন, সেই পরাধীনই আছে, যে দুঃখী, সেই দুঃখীই আছে, যে শূন্য, সেই শূন্যই আছে, তবে এ উৎসব কেন? তবে এ নূতন জম্‌জমাট কেন? যিনি এ কথা বলেন, তিনিই ভারতের মর্ম্ম-কথা জানেন না। দুঃখের মধ্যে উৎসব কেন করিতে হয়, ভারতবর্ষ তাহা বুঝে। ভারতবর্ষ বুঝে, কান্নার মধ্যে হাঁসি, আঁধারের মধ্যে আলো, তাপের মধ্যে শীতলতা, শূন্যতার মধ্যে পূর্ণতা চাই। একটি প্রকাণ্ড তৃণস্তূপের মধ্যে অগ্নিকণিকা পড়িলে তাহা যেমন পুড়িয়া যায়, সেইরূপ নিরানন্দস্তূপের মধ্যে আনন্দোৎসবের কণিকা পড়িলে তাহা উড়িয়া যায়। তাই এ বিষম দুঃখের দিনে উৎসবের অবতারণা, তাই এ দুঃখী ভারতকে ক্ষণেকের মত সুখী করিবার জন্যই এ উৎসবগাথার সূচনা। উৎসব কঠিন পাষাণ ভেদ করিয়া তরল জলের উৎস উৎসারিত করিয়া দেয়।

এখন উৎসবতত্ত্ব একটু পরিস্ফুট করিতে হইবে। উৎসব ব্যাপারটি বুঝিতে হইবে। তুমুল আনন্দ রোল, তীব্র উৎসাহ, নানাবিধ সামগ্রীর আয়োজন, বিষম আমোদ আহ্লাদ আদি মিলাইয়া যে একটা ব্যাপার, তাহাকেই বলে উৎসব। স্থূল-কথায় আনন্দ প্রকাশের নামই উৎসব। আমরা বাহিরের যে সমস্ত কার্য্যে ব্যাপৃত হই, তৎসমস্তই ভিতরের বিকাশ।

আমাদের ভিতরে যে ক্রিয়া অঙ্কুরিত হয়—যে বৃত্তি গজাইয়া উঠে, বহির্জগতে তাহা ফুটিয়া বাহির হয়। ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। ভিতরে ফুল ফুটিলে বাহিরে সুগন্ধ আপনিই ছুটিতে থাকে। ভিতরে জলন্ত অগ্নি সঞ্চিত থাকিলে বাহিরে তাহার তাপ অনুভব হইয়া থাকে। ভিতরে হাঁসি আসিলে বাহিরের অধরে তাহা প্রকাশিত হয়, প্রাণের ভিতরে সুখানুভব হইতে থাকিলে বাহিরে পুলকোদ্গমাদিরূপে তাহা ফুটিয়া উঠে। সুতরাং ভিতরে আনন্দ থাকিলে তবে ত বাহিরে আনন্দপ্রকাশরূপ উৎসব হইতে পারে? কিন্তু আমাদের ভিতরে সুখ কৈ? আমাদের সংসারদাবদহনবিদগ্ধ অন্তস্তল হইতে দুঃখের চিতাধূম অবিরতই উদ্গীর্ণ হইতেছে। স্থূলদৃষ্টিতে আপাততঃ ইহা বোধ হয় বটে, কিন্তু আরও গভীর গর্ভে ডুবিয়া, আরও অতল তলে তলাইয়া দেখ, সুখের গুহ্যবার্ত্তা বুঝিতে পারিবে, দেখিতে পাইবে, অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মত সুখের নির্ঝরিণী শীতল সলিলধারায় প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। দেখিতে পাইবে, মনঃ প্রাণ বুদ্ধির অতীত স্থান হইতে কেমন সেই ঝরণার জল বহিয়া আসিতেছে। আমরা যখন জলের জন্য কোন কূপ খনন করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন খননের সময় প্রথম দেখিতে পাই, বালুকাস্তূপ কেবল উঠিতে থাকে, পরে কেবল কর্দ্দমরাশিই দেখিতে পাই। কৈ প্রথমে ত জল দেখিতে পাই না? কিন্তু তখনও আমরা নিরাশ হই না। বালুকা কর্দ্দম ভেদ করিয়া আরও তলাইয়া যখন খুঁড়িতে থাকি, দূর হইতেও দূরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত যখন উদ্ভিন্ন করিয়া ফেলি, তখন বাঞ্ছিত জলধারা দেখিতে পাই। সেইরূপ শরীর মন আদি স্তর, অন্নময় প্রাণময়াদিকোষ উদ্ভিন্ন করিয়া যখন দেখিব, তখনই

সেই তলদেশে ত্রিতাপানলনির্ব্বাপন আনন্দের গুপ্ত প্রস্রবণকে দেখিয়া চরিতার্থ হইতে পারিব। কূপ খননের প্রথম অবসরে দেখি কেবলই বিশুষ্ক বালি। সেইরূপ শরীরাদিরূপ প্রথম স্তরে আমরা দেখি, কেবলই দুঃখ, বালুকার ন্যায় কেবলই বিশুষ্ক ভাব। কূপখননের দ্বিতীয় অবসরে দেখি, কর্দ্দম, অর্থাৎ ময়লা মাটি মাখা কতকটা জলীয় ভাগ। সেইরূপ মন আদি দ্বিতীয় স্তরে দেখিতে পাই দুঃখমাখা সুখ। যখন শেষ স্তর ভেদ করিতে পারির, তখনই কূপের নির্ম্মল জলধারার ন্যায় আত্মার অনবচ্ছিন্ন আনন্দধারা দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারিব। তাই বলিয়াছি, তলাইয়া দেখ, ভিতরে আনন্দ বিদ্যমান রহিয়াছে।

তোমার একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে তুমি সুখী হও, আবার সেই প্রিয়পুত্রের অভাব হইলে তুমি দুঃখিত হও কেন? পুত্রের ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে তাহার সহিত ত তোমার জানা শুনা ছিল না, কোন পরিচয়ই ত ছিল না। তাহার সহিত কোন চিঠি পত্র লেখালিখি ছিল না। সুতরাং পুত্র তোমার গৃহে আগন্তুক। আজ একজন আগন্তুক তোমার গৃহে যদি আসে, আবার চলিয়া যায়, তাহার জন্য তুমি যেমন সুখী বা দুঃখী হও না, সেইরূপ আগন্তুক পুত্রের জন্ম বা মরণে তোমার সুখী বা দুঃখী হওয়া উচিত নহে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই আগন্তুকের জন্যই সুখ দুঃখ হইয়া থাকে। পুত্রের শরীরটিকে আমরা ঠিক ভালবাসি না। পুত্রের শরীরটিকে ভাল বাসিলে তাহার পরিবর্ত্তনে আমাদের দুঃখ হইত। বালকপুত্র যখন যুবা হয়, আবার যুবা পুত্র যখন বৃদ্ধ হয়, তখন যৌবনাবস্থায় বালক পুত্র মরিয়া যায়, বৃদ্ধাবস্থায় আবার যুবা পুত্রও ত মরিয়া

যায়, কৈ তাহার জন্য ত আমাদের দুঃখ হয় না। সুতরাং শরীররূপ পুত্র আমাদের ভালবাসার ধন নহে। আমরা পুত্রের তেমন জিনিষটিকেই ভাল বাসি, যাহার সহিত কখনও আমাদের পরিচয় নাই, জানা শুনা নাই, সেই অজানা অচেনা বস্তুর কি জানি কি কুহকে আমরা আবদ্ধ, তাহাকে না ভালবাসিয়া থাকিতে পারি না। পুত্রের শরীরটিকেই যদি ভালবাসিতাম, তাহা হইলে পাঠশালায় গুরুমহাশয় লেখা পড়া শিখাইবার জন্য পুত্রের শরীরে আঘাত করিলে আমাদের দুঃখ হইত। কিন্তু তাহা ত হয় না। কেননা তখন মন বুদ্ধিরূপ পুত্রকে ভালবাসি। পুত্র যদি লেখা পড়া না শেখে, বুদ্ধিহীন মূর্খ হয়, ত তেমন পুত্র বাঁচিয়া লাভ কি? সুতরাং তখন শরীর ছাড়িয়া মনরূপ পুত্রের দিকেই ভালবাসার গতি হয়। কেননা তখন মনে হয়, শরীররূপ পুত্র গুরুমহাশয়কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত হইলেও মনরূপ পুত্র ত সুপুষ্ট সুশিক্ষিত হইতেছে। ইহাতেই তখন আনন্দ হয়। আবার লেখা পড়া শিখিয়াও পুত্র যদি অদৃষ্টদোষে দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া দুষ্ট দুরাত্মা হইয়া উঠে, ত, তেমন পুত্রকে আমরা চাহি না। তখন আত্মারূপ পুত্রকেই ভালবাসি। দুর্নীতি পাপাদি মলিনতায় সে আত্মারূপ পুত্র কলুষিত হইলে মর্ম্মবেদনা উপস্থিত হয়। সুতরাং আমাদের ভালবাসার গতি বাহ্যস্তর ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে কেন্দ্রাভিমুখী হইয়া অন্তঃস্তরের দিকেই ছুটিতে থাকে। একটা গুরুভার পিণ্ডকে আকাশের দিকে উঠাইয়া দাও, দূর দূর নভোমণ্ডল ভেদ করিয়া সে চলিয়া যাউক, সে অনন্ত উন্মুক্ত প্রান্তরে পিণ্ড কিন্তু থাকিতে পারিবে না। পৃথিবীর দিকে পুনরায় তাহাকে

প্রত্যাবর্ত্তন করিতেই হইবে। পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি যে তাহাকে টানিতেছে, সুতরাং তাহার পৃথিবীর সহিত ভালবাসা-ময়ী গতি নিম্নাভিমুখী না হইয়া থাকিতে পারে না। ঘোর উচ্চতা হইতে নিম্নতার দিকেই ভালবাসা দৌড়িয়া থাকে। বাহির হইতে ভিতরের দিকেই ভালবাসা ছুটিয়া থাকে। সুতরাং ভালবাসার গতি অন্তর্ভেদিনী। তাই পুত্রের বাহিরের শরীরাদি-রূপ স্তর ভেদ করিযা ভালবাসা অন্তর হইতেও অন্তরতম প্রদেশে ডুবিতে চায়, উপরে না ভাসিয়া অনন্ত প্রেমাম্বুধির অতল তলে ভালবাসা তলাইতে চায়। ভালবাসা তাঁহারই প্রিয়তার সৌগন্ধ পাইয়া আকৃষ্ট হয়, যিনি অন্তস্তলে বাস করিতেছেন। যাহা প্রিয়, তাহা সুখময়। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন, আত্মা আনন্দস্বরূপ।

সংসারের সুখ দুঃখ যাহা কিছু সমস্তই আমাতে। (এখানে মন বুদ্ধিরূপ আমিকে লক্ষ্য করিয়াই একথা বলিতেছি, আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া নহে) সুখ দুঃখ বাহিরের পদার্থের ধর্ম্ম নহে, সমস্তই মনের অবস্থামাত্র। আজ মনের এই দুইটি অংশ মুছিয়া গেলে পুত্রের জন্ম মরণে আর সুখ দুঃখ অনুভব হইতে পারে না। যদি সুখ দুঃখ বাহিরের পদার্থের ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে একই পদার্থ এক সময়ে সুখময়, অন্য সময়ে দুঃখময় হয় কেন? যখন মানব সংসারী গৃহস্থ থাকে, তখন ভোগ্য বিলাসময় পদার্থে কত সুখ বোধ করে, আবার যখন বিরাগী সন্ন্যাসী হয়, তখন সেই সমস্ত পদার্থই দুঃখময় অনুভব করিয়া ত্যাগ করে। এক সময়ে যাহাতে আনন্দ হইত, অন্য সময়ে তাহাতে বিতৃষ্ণা জন্মিল কেন? এক সময়ে যে অগ্নি তাপ দেয়,

অন্য সময়ে তাহাতে কি শীতলতা পাওয়া যায়? তাপ নাকি অগ্নির ধর্ম্ম, তাই অগ্নি চিরদিনই তাপময়, সুখ বা দুঃখ সেইরূপ পদার্থের ধর্ম্ম যদি হইত, তাহা হইলে একই বস্তু চিরদিনই সুখময় বা দুঃখময় হইত। কিন্তু তাহা ত হয় না। সুতরাং সুখ দুঃখ মনের অবস্থা মাত্র। যখন মানব সংসারী থাকে, তখন মনের যে ভাব, বৈরাগ্য অবস্থায় সে ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সংসারী অবস্থায় মনের যে প্রীতিময় অংশ সংসারে ছড়াইয়া দেয়, বৈরাগ্যাবস্থায় তাহা উঠাইয়া লইয়া থাকে। তাই সংসার জীর্ণ কঙ্কাল বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং সুখ দুঃখ, প্রীতি অপ্রীতি, অনুরাগ ও দ্বেষ মিত্রতা ও শত্রুতা সমস্তই মানবের মনে। চিরকাল যাহাকে শত্রু বলিয়া জানি, বিজয়া দশমীর পবিত্র উৎসবে তাহাকেও প্রেমালিঙ্গন দিয়া থাকি। শত্রুতা যদি ব্যক্তিগত ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে বিজয়া দশমীর দিনে "শত্রু" আবার "মিত্র" হইল কেমন করিয়া? আমার মনে যে শত্রুতা ছিল, তাহা নাকি বিজয়া দশমীর পবিত্র শক্তিতে মুছিয়া গিয়াছে, তাই প্রেমভরে শত্রুকে মিত্র করিয়া লইলাম। সুতরাং উৎসব শত্রুকে মিত্র করে, নিবিড় নিরানন্দে প্রসন্নতা আনিয়া দেয়। উৎসব ক্ষুদ্রকে মহান্ করে, অচেতনকে সচেতন করে, মলিনকে উজ্জ্বল করে, ক্ষীণকে তেজীয়ান্ করে, শূন্যকে পূর্ণ ও অভাবযুক্তকে প্রভাবযুক্ত করিয়া দেয়। উৎসবের শক্তি আশ্চর্য্য ও অনিবার্য্য।

সুখ দুঃখাদি সমস্তই জীবের ভিতরে বিদ্যমান রহিয়াছে। বাহিরে সুখ অন্বেষণ করিতে হইবে না। ভিতরে প্রচ্ছন্নরূপে যে সুখসুধা বিদ্যমান, তাহাকে জাগ্রত করিতে পারিলে আর

ভাবনা কি? বাহিরে দুঃখবিনাশের চেষ্টা বৃথা, ভিতর হইতে দুঃখমূল উৎপাটিত করিতে না পারিলে মনোরথ সিদ্ধ হইবে না। পরম কারুণিক ভগবান্ সমস্তই আমাদের অন্তরে নিহিত করিয়াছেন, আমাদের অন্তর্ভাণ্ডার ভরপুর করিয়া রাখিয়াছেন। কিসের জন্য আমাদিগকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হইবে। আমাদের নিজের মর্য্যাদা নিজেরই কাছে আছে। গবর্ণর জেনরলের লেভিতে যদি বসিবার অধিকার না পাও, তাহাতে তোমার অমর্য্যাদা কি? তোমার যে হৃদয়-দরবারে অন্তর্যামি রাজরাজেশ্বর বাস করিতেছেন, সেই দরবারের দরবারী জীব তুমি, তোমার মর্য্যাদার ভাবনা কিসের? বাহিরের ব্যাপারে তোমরা দীন দুঃখী পরপদানত ঘৃণিত তুচ্ছজাতি, সুতরাং এমন অবস্থায় উৎসব করিবার কথা নাই বটে, কিন্তু ভিতরের দিকে তাকাইলে অধ্যাত্মরাজ্যের দিকে তাকাইলে উৎসব সম্বন্ধে মানব আশান্বিত হইতে পারে। বাহিরের সংসার দুঃখময় বটে, বাহিরের মণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃকরণ-রাজ্যে প্রবেশ করিলে সেখানেও দেখিতে পাই, দুঃখমিশ্রিত সুখের লীলা, কিন্তু তাহা অপেক্ষা আরও নিম্নতলে নামিলে দেখিতে পাই, যিনি মনের মন, অন্তরের অন্তর, প্রাণের প্রাণ, ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়, সেই অতীন্দ্রিয় দেবতা নিত্য সুখের লহরীলীলায় সদা ভাসমান। তাঁহারই সুখের প্রতিচ্ছায়া পাইয়া মনে সুখাভাস আসিয়াছে, সেই সুখসূর্য্যের কিরণরাশির প্রতিবিম্ব মাত্র পাইয়া এ পতিত দুঃখপূর্ণ জগৎ হাঁসির সুনির্ম্মল শুভ্র মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছে। সুতরাং যদি উৎসব করিতে হয়, ত তাঁহাকে লইয়া। ভারতবর্ষ তাঁহাকে ভুলিয়া কখনও উৎসব

করে নাই। ভারতের প্রত্যেক উৎসব সেই আধ্যাত্মিক সূত্রের তারে তারে গাঁথা। ভারতের ভিতরভাগ মহোৎসবময়। মধ্যে মধ্যে তাহারই ছায়া তাহারই সৌরভ বাহিরে আসিয়া সংসারকে সুশীতল করিয়া থাকে। ধন্য জীব তাঁহারাই, যাঁহারা এই বিষ্ণুপাদোদ্ভবা মহোৎসব-গঙ্গায় অবগাহন করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন।

জড়বাদী জড়পদার্থ ছাড়া কোন আত্মশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহার মতটি এইখানে একটু সমালোচনা করিতে চাই। জড়বাদীও স্বীকার করিবেন, আমাদের সম্মুখে যে পদার্থরাজি রহিয়াছে, এই পদার্থের স্বরূপ আমাদের চক্ষুর গোচরীভূত হয় না, বস্তুকে আমরা দেখিতে পাই না। বস্তুকে অবলম্বন করিয়া যে রূপ, যে ব্যাপকতা, যে আকৃতি অবয়ব যে লম্বাই চোড়াই আদি গুণ গুলি থাকে, তাহাকেই আমরা দেখিতে পাই। সুতরাং বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি হয় না, বস্তুর গুণ বা শক্তির সহিতই কার্য্যক্ষেত্রে আমাদের দেখা শুনা আলাপ পরিচয় হইয়া থাকে। এই শক্তিকেই আমরা আদর করিয়া থাকি। পদার্থকে আদর করি না। পদার্থের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ কোন প্রয়োজন নাই। তোমার জ্বর হইয়াছে, কুই-নাইনরূপ ঔষধকে তুমি চাও, কেননা জ্বরঘ্নতা শক্তি তাহাতে আছে। আজ জ্বরঘ্নতা শক্তি কুইনাইন হইতে যদি বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলে সে কুইনাইন তোমার পক্ষে আর আদরের সামগ্রী নহে। কুইনাইনের জ্বরঘ্নতা শক্তিকেই তুমি ভাল বাস। ঔষধালয়ে ঔষধ অধিক দিনের পুরাতন হইলে তাহা ফেলিয়া দেয়, কেননা তাহার শক্তি চলিয়া যায়। সুতরাং জগৎ শক্তিরই

উপাসক—শক্তিরই সেবক। শক্তি ছাড়া পদার্থ অপদার্থ—আবর্জ্জনা মাত্র বাহিরের আবরণ পরিত্যাগ করিয়া এই অন্তঃশক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। বাহিরের মহল ভেদ করিয়া, যে অন্দর মহলে আমাদের ভালবাসার ধন বিদ্যমান রহিয়াছেন, যে অন্তরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দিক্ আলো করিয়া বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার, চরণতলে শরণ লইতে হইবে। সেই লোকালোকবন্দিত চারুচরণ-সুধাসিন্ধু হইতে উচ্ছলিত হইয়া আনন্দপ্রবাহ জীবকে অশেষ দুঃখ হইতে নিস্তার করে। এই সুধাসিন্ধুর বিন্দুমাত্র স্পর্শে জীবন কৃতার্থ হইয়া যায়।

আমরা আধারকে চাই কেন, আধেয় শক্তি আছে বলিয়া। ইক্ষুকে মিষ্ট বলি কেন? ইক্ষুর "রস" মিষ্ট বলিয়া আমাদের শরীরাদি যেন ইক্ষুদণ্ড স্বরূপ, আর আত্মা ইহার রস স্বরূপ। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, "রসো বৈসঃ"। এই রসের আস্বাদ যে দিন জীব করিতে পারিবে, সেই দিন তাহার চিরদিনের নীরস জীবন সরস হইয়া যাইবে। এই আনন্দের প্রস্রবণ হইতে যে দিন সুখসুধার উৎস নিঃসৃত হইয়া আসিবে, সে দিন সে আনন্দধারায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আপ্লাবিত হইয়া উঠিবে। সংসারের সুখ আপাততঃ সুখ বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু পরিণামে তাহাতে দুঃখই উৎপন্ন হইয়া থাকে। সাংসারিক সুখের উদয় কালে পূর্ব্ব দুঃখ স্মৃতি হয়। সুখের দিনে দুঃখের কথা মনে পড়ে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। দুঃখের দুঃখত্ব স্মৃতি না হইলে সুখের সুখত্ব অনুভবই হইতে পারে না। কেননা সুখ দুঃখ পরস্পরমুখাপেক্ষী। সুতরাং যে সুখের উদয়ে দুঃখ, পরিণামে

দুঃখ, কেবল ভোগকালে বিদ্যুতের ন্যায় অনুভূত হইয়া যাহা অবসান হয়, তেমন সুখ সুখই নয়। যাহার ক্রিয়াতে সুখ, পরিণামে সুখ, ভোগ করিবার সময় যাহাতে সুখ, বরফ যেমন, জলময়, সেইরূপ যাহা সুখময়, সেই বস্তু পাইবার জন্যই জীব লালায়িত। আর্য্য জাতি-ধর্ম্মকেই সেই সুখের আদর্শ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। যখন কোন ধর্ম্মপরায়ণ পুরুষ একাদশীর উপবাসরূপ ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তখন বাহিরের লোকে হয় ত মনে করিতে পারে, উপবাসে তাঁহার কষ্ট হইতেছে। কিন্তু ধার্ম্মিক পুরুষ তাহাতে কষ্ট অনুভব করেন না, তিনি ভাবেন, আজ কি তাঁহার পক্ষে শুভদিন যে, তিনি এইরূপ ধর্ম্মকার্য্য করিবার অবসর পাইয়াছেন। এই সুমিষ্ট চিন্তায় তাঁহার অন্তরাত্মা আনন্দিত হয়। দুর্গোৎসবের সময় ক্রিয়াকর্ত্তা যখন ব্রাহ্মণ ভোজন করান, তখন হয় ত সমস্ত দিনের মধ্যেও তাঁহার একটু জলগ্রহণ করিবার অবসর হয় না। ইহার নিমিত্ত তাঁহার ত কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। বরং চারি-দিকের ভোজনব্যাপারে তাঁহার মনে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়, তিনি সে আনন্দে ভরপূর হইয়া উঠেন। এই যে একাদশী-উপবাস ও ব্রাহ্মণ ভোজনরূপ ক্রিয়া, এই ক্রিয়া করিবার সময় সুখ। আবার এই ক্রিয়ার পরিণামে সুখ, অর্থাৎ তাদৃশ ক্রিয়াজনিত পুণ্য দ্বারা স্বর্গাদিলাভ হয়, সেই স্বর্গসুখ ভোগ করিবার সময় সুখ, সুতরাং ইহা সুখময়। এ সুখের উপর সুখ দুঃখমাখা মলিন মনোরাজ্যের কোনরূপ আধিপত্য নাই, ইহা আধ্যাত্মিক রাজ্যের নিজস্ব, তাই ইহা সুখময়। এইরূপ শ্রেণীর সুখকেই হিন্দু সুখ বলিয়া বুঝেন,

তাই তাঁহার চক্ষে পার্থিব সুখ উপেক্ষিত। হিন্দুর প্রত্যেক ধর্ম্ম কর্ম্ম এইরূপ সুখময়, কিন্তু অদৃষ্টদোষে বর্তমান ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠানপ্রণালী দূষিত হইয়া পড়িয়াছে। তাই ধর্ম্মকার্য্য করিবার সময় লোকে কষ্টই অনুভব করিয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আত্মারূপ সুখসূর্য্যের কিরণরাশির প্রতিবিম্বমাত্র পাইয়াই মনোরাজ্যে সুখের অংশ আসিয়াছে। শ্রুতিও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—

"আনন্দময়ো হ্যাত্মা এতস্যৈব আনন্দস্য
মাত্রামুপজীবন্তি সর্ব্বে আনন্দাঃ"

যাহার নকল পাইয়া এত সুখ, সেই আসল জিনিষটিকে পাইলে না জানি কত সুখ হয়; কিন্তু তাহার জন্য মায়াবিমুগ্ধ জীবের চেষ্টা হয় না। নিদারুণ শীতকালে তুমি শীতে অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছ, প্রাতঃকালে শীতে থর থর করিয়া কাঁপিতেছ, বিছানা হইতে উঠিতে ইচ্ছা হইতেছে না। বিছানাতে বসিয়াই তুমি যদি রৌদ্র পোহাইতে পাও, তবে তোমার বড় আনন্দ হয়, রৌদ্রে তোমার শীত নিমিত্ত জড়তা কাটিতে পারে। এই আন্তরিক ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া তুমি জানালা খুলিয়া রাখিয়াছ, আশা আছে, জানালার ভিতর দিয়া সূর্য্যরশ্মি আসিয়া তোমার গায়ে পড়িবে, তোমার শীতার্ত্ত জড়দেহকে কর্ম্মঠ করিয়া তুলিবে। কিন্তু যদি সূর্য্যরশ্মির সমসূত্রপাতে জানালা খোলা থাকে, তবে ত রশ্মিরাশি জানালার ভিতরে প্রবেশ করিবে। সূর্য্যের রশ্মি আসিতেছে এক দিকে, আর জানালা খোলা থাকে যদি অন্যদিকে, তবে তুমি রৌদ্র উপভোগ করিবে কেমন করিয়া? এখন এই দৃষ্টান্তের সহিত কথাটা মিলাইয়া দেখ।

সংসারের নিদারুণ শীতে আমরা সদাই আর্ত্ত—পীড়িত—জড়! ইচ্ছা যায়, ঘরে বসিয়া সুখসূর্য্যের রৌদ্র পোহাইতে। তাই শরীররূপ গৃহে মনরূপ জানালা খুলিয়া রাখি। যিনি সুখসূর্য্য—জ্যোতির্ম্মণ্ডলময়, তাঁহা হইতেও কিরণমালা অবিরত চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া থাকে, তবে সে সূর্য্যরশ্মি অনুভব করিতে পাই না কেন? যেহেতু মনরূপ গবাক্ষদ্বারকে তাঁহার সমসূত্রপাতে (মুখো মুখি) করিয়া খুলিয়া রাখিতে জানি না। তাঁহার কিরণের প্রবাহ আসে এক দিকে, আমাদের জানালা খোলা থাকে অন্যদিকে অর্থাৎ সংসারের দিকে। তাই সে কিরণ স্বরূপতঃ উপভোগ করিতে পাই না। তাহার একটা আবছায়া পাই মাত্র। যে কিরণ প্রাপ্ত হইলে সমস্ত জড়তা মিটিয়া যায়, যে বৈদ্যুতিক শক্তি উদ্গীরিত হইলে সংসারবিষ-মূর্চ্ছিত অচেতন মনঃ প্রাণ সচেতন হইয়া উঠে, দুর্ভাগ্য জীব! সেদিকে একবার তাকাইলে না। কেবল তাহার প্রতিচ্ছায়া লইয়া তুমি মজিতে চাও, আসল ফেলিয়া নকলে ডুবিতে চাও, সোণা ফেলিয়া গিল্টিতে মোহিত হইতে চাও, রূপা ফেলিয়া রাং লইয়া নৃত্য করিতে চাও, তাহাতে প্রকৃত সুখ পাইবে কেন? চন্দ্রপ্রেমপাগলিনী কুমুদিনী চাঁদের কাছেই সুধার ভিখারিণী হইয়া থাকে, তাঁহারই দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে। চাঁদের যে প্রতিবিম্ব জলেতে পড়ে, তাহার কাছে সে প্রার্থক বেশে দাঁড়ায় না, সেইরূপ সুখসুধা যদি চাহিতে হয়, তবে জীব! তোমার অন্তর্গগনতলে যে মোহন চন্দ্রমার মৃদু মধুর দিব্যচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইতেছে, একবার তাঁহার দিকে তাকাও! সেই পূর্ণেন্দুর বিমল মাধুরীর ধারায় যে দিন অবগাহন

করিতে পারিবে, সে দিন আর তোমার ভাবনা কিসের? সে আধ্যাত্মিক জগতের প্রতিচ্ছবি এ বহির্জগতে সুখের আশা করিও না।

পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে, দুঃখী জীবকে সুখী করিবার জন্যই উৎসবের অবতারণা। জীব ত সর্ব্বদাই দুঃখে নিমগ্ন, কেননা দুঃখের ভাগই জগতে বেশী। এই দুঃখের তীব্রতা লাঘব করিবার জন্যই মধ্যে মধ্যে উৎসব প্রয়োজন। পূজা পর্ব্ব লইয়াই হিন্দুর উৎসব। অন্যান্য দেশের উৎসব কেবল পার্থিব সম্পত্তি লইয়া, বিলাস বিভবের সামগ্রী লইয়া, কিন্তু হিন্দুর উৎসব তাঁহাকে লইয়া। উৎসবে এমন ব্যাপারসমূহ অনুষ্ঠিত হয় যাহাতে অপ্রসন্ন মনেও প্রসন্নতা আসে। হিন্দুর পূজার সময়ে যখন শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠে, ধূপের সৌগন্ধ ছুটিয়া উঠে, আরতির দীপমালা জ্বলিয়া উঠে, তখন বিষণ্ণ মনেও প্রীতির সঞ্চার হয়। দয়ালু আর্য্য ঋষি দুঃখী জীবের প্রতি তাকাইয়াই অন্তর্জ্জগতের আধ্যাত্মিক ছায়া লইয়াই উৎসবের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে আনন্দসাগরে ডুবিয়াছিলেন, যে রসসাগরে আত্মহারা হইয়াছিলেন, জীবকে সেই সুখে সুখী করিবার জন্যই উৎসবরূপ আনন্দময় সদাব্রতের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে গুপ্ত ভাণ্ডার-ভাণ্ড হইতে সুধাপানে বিভোর হইয়াছিলেন, যে অধ্যাত্মযাগের মহোৎসবে মাতিয়াছিলেন, কেবল একাকীই তাহা তিনি উপভোগ করেন নাই, দীন জগতের জন্য সেই গুপ্ত গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া গিয়াছেন। কেননা তিনি যে দয়ালু। জানি তোমার বিপুল সম্পত্তি আছে। কিন্তু তোমার সে বিপুল সম্পত্তির কণিকা-

মাত্রও যদি আমার মত দীন দুঃখীর উপকারে না আসে, তবে তুমি আমার কাছে ধনী কিসের? আর্য্য ঋষি সে সাধের ধন পাইয়াছিলেন, তাহা জগতে বিলাইয়া গিয়াছেন, কেননা অতুল দয়া তাঁহার, তাই এ দুঃখীদের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল। তাঁহার দয়া না হইলে কলিকলুষদূষিত আমাদের ন্যায় মায়ামুগ্ধ জীবের গতি হইত না।

স্বয়ং ক্রিয়া করিলে যেমন একটা ফল পাওয়া যায়, অনেক সময় স্বয়ং ক্রিয়া না করিলেও সেই ফল দেখিলে ভিতরে তদনুরূপ ক্রিয়া হয়। একটা দৃষ্টান্ত দেখ, তোমার ভিতরে দুঃখের ক্রিয়া হইলে বাহিরে তাহার ফল কান্নারূপে প্রকাশিত হয়, ইহা যেমন দেখা যায়, সেইরূপ ইহাঁও দেখা যায়, তোমার ভিতরে দুঃখের ক্রিয়া না হইলেও অপরের কান্না দেখিলে অপরের মলিন মুখে অশ্রুধারা বহিতে দেখিলে তোমারও দুঃখের উদ্রেক হয়, তোমারও মুখে কান্না আসে। তুমি হয় ত বেশ আনন্দে আছ, কিন্তু তুমি সেই অবস্থাতেই যদি এমন একটা দুঃখের মণ্ডলীর মধ্যে গিয়া পড়, যেখানে দুঃখের আর্ত্তনাদ ছাড়া আর কোন কথা নাই, কান্না ছাড়া আর কোন ব্যাপার নাই, তেমন স্থানে তুমিও নিজে না কাঁদিয়া থাকিতে পার না। এইরূপ কোন সুখের হাঁসির হুল্লোড়ের মধ্যে পড়িলেও তুমি দুঃখী হইলেও না হাঁসিয়া থাকিতে পারিবে না। সুতরাং অপরের ক্রিয়ার ফল দেখিয়া তোমারও ভিতরে ক্রিয়া হয়। যে উৎসবে দশজনে মিলিয়া আনন্দ করে, সেই আনন্দমণ্ডলীর মধ্যে পড়িলে তুমি জন্মদুঃখী হও না কেন, সে মুহূর্ত্তের জন্য তুমি আনন্দাংশের ভাগী না হইয়া থাকিতে পার না, সুতরাং উৎসব

নিরানন্দের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাকে পরাভূত করে। উৎসবের তেজে নিরানন্দ দূরে চলিয়া যায়। অতএব এ দুঃখ-পূর্ণ সংসারে উৎসব চাই। যদি উৎসব না থাকিত, তাহা হইলে এ সংসার মরুভূমি হইত। উৎসবই সংসারকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, উৎসবই জগৎকে স্থিতিশীল করিয়া রাখিয়াছে। উৎসব না থাকিলে দুঃখযন্ত্রের অবিরত পিষ্টপেষণে সংসার ভস্মীভূত হইয়া কোথায় উড়িয়া যাইত। উৎসব শ্মশানে জীবনী-শক্তির বিকাশ করে। মরুভূমে অমৃতের নদী প্রবাহিত করে। পাষাণে অমৃতবল্লরীকে অঙ্কুরিত করে। তাই উৎসব জীবের পক্ষে বড় প্রিয় পদার্থ। হিন্দু উৎসবের শক্তি বুঝিতেন, তাই দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ পর্ব্বোৎসবের বিধান করিয়াছেন। হিন্দুর উৎসবের দুইটি পৃষ্ঠ আছে, একটি বাহিরের, অপরটি ভিতরের। বাহিরের দিক্ দিয়া দেখিলে বোধ হয়, আমোদ আহ্লাদ করিবার জন্য ইহা এক ব্যাপার মাত্র। ভিতরের দিক্ দিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি ইহা কেবল সাধনার স্তর। প্রকৃত সুশিক্ষক যেমন টিয়া পাখীর মত পুঁথির বুলি অভ্যাস না করাইয়া প্রাকৃতিক পদার্থপুঞ্জ হইতেই শিশুকে শিক্ষিত করিয়া তুলেন, সেইরূপ আর্য্য ঋষি এই প্রাকৃতিক উৎসবের ভিতর দিয়া জীবশিশুকে গভীর সাধনার তত্ত্বকথার ইঙ্গিত করিয়াছেন। সুতরাং হিন্দুর উৎসব কেবলই কাল্পনিক নহে, ছেলে খেলা নহে, কিন্তু প্রকৃতির নিয়মরেখায় বিজড়িত। অগাধ সাধনার তত্ত্ব ইহার ভিতর অবগুণ্ঠিত। উৎসবতত্ত্বের স্তর উদ্‌ঘাটন করিয়া আমরা তাহা ক্রমে ক্রমে দেখাইতেছি।

বৈশাখের নিদারুণ গ্রীষ্মে যখন সকলেই পীড়িত হইয়া উঠে,

সূর্য্যদেব অগ্নির ফোয়ারার মত যখন প্রচণ্ড রৌদ্র বর্ষণ করিতে থাকেন, তখন সে তাপশক্তির তীব্রতায় শীতলতা শক্তি নিতান্ত অভিভূত হইয়া যায়, জীব নিতান্ত ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে। এই বিষম সন্তাপময় সময়ে হিন্দু ত্রিতাপতারিণী গঙ্গাদেবীর আরাধনা করেন। শীতকালে গঙ্গাপূজার বিধি নাই, কেননা তখন প্রয়োজন নাই। পতিতোদ্ধারিণী মা গঙ্গা শীতলতার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাই নিদাঘের ভীষণ তাপে হিন্দু তাঁহার চবণতলে শরণ লয়। গঙ্গাপূজার পর জগন্নাথের স্নানযাত্রা। (জ্ঞান) গঙ্গার পূত বারিতে জগন্নাথ দেব (আত্মা) বিধৌত হইযা মলিনতাবৰ্জ্জিত হইয়া যখন স্বচ্ছ হইয়া উঠেন, তখনই তাঁহাব দর্শন পাওয়া যায, তাই স্নানযাত্রার উৎসব। জ্ঞানের নির্ম্মল জ্যোতিতে অজ্ঞানান্ধকাব বিদূরিত হইলে আত্ম-সাক্ষাৎকার হয়। তাই স্নানযাত্রার পর রথযাত্রা। শরীররূপ রথে জগন্নাথরূপ আত্মার দর্শন হইলে পুনর্জন্ম থাকে না। (রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে) কেবল তাঁহাকে দর্শন করিলে তৃপ্তি হয় না। আমাদের সামগ্রীকে নিজস্ব করিতে না পাইলে প্রাণ পুলকিত হয় না। তাই সাধক মা যশোদার ন্যায় জন্মাষ্টমীর দিনে তাঁহাকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়া কোলে করিয়া সোহাগ করিবার অবকাশ পান। অঞ্চলের নিধি সাধের ধনকে বুকে রাখিয়া তাপিত জীবন শীতল করেন। শরতের শারদীয়া মূর্ত্তিতেই সাধক তাঁহার সাধের দেবতার পূর্ণ বিকাশ দেখিয়া থাকেন। ত্রিভুবনের রাজরাজেশ্বরী মা তখন ত্রিজগতের মা হইয়া অপরূপ রূপলাবণ্য লহরীর তরঙ্গলীলায় দিগন্ত প্রান্তর উদ্ভাসিত করিয়া ব্যাপকরূপে আবির্ভূত হন।

তাঁহার সে পূর্ণ মূর্ত্তি দেখিবার জন্য প্রকৃতি নব-নধর বেশে সজ্জিত হইয়া উঠেন। বর্ষার বারিধারায় স্নাত হইয়া পবিত্র-ভাবে তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রকৃতি যেন উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠেন। তাঁহার প্রকাশে শারদীয় নির্ম্মল আকাশ উজ্জ্বল চন্দ্র তারকায় সুসজ্জিত হয়, বনের তরু মনের মত সুচারু সুরভি-কুসুমদামে তাঁহার পূজা করে। শিশিরবিন্দুরাশি মণি মুক্তার ন্যায় তৃণশয্যাময় ভূতল উজ্জ্বল করিয়া দেয়। মাকে দেখিবার জন্য যেন ত্রিলোক হাঁসিতে ভাসিতে থাকে।

সামান্য মহিষাসুরকে বধ করিবার জন্য মহিষমর্দ্দিনী মায়ের এত আড়ম্বর কেন? অভিমানরূপ অসুর অতি ভয়ঙ্কর। ঘোর সমাধিকালেও অভিমান বিনষ্ট হয় না। তখন "সাধুরহং" এ অভিমান কোথা হইতে আসিয়া জুটে। ইহাকে সমূলে উৎ-পাটিত করিবার জন্যই মহাশক্তির এ আড়ম্বর। রাবণরূপ অহঙ্কারকে বিনষ্ট করিবার জন্যই রামচন্দ্র এই শক্তির আরাধনা করিয়াছিলেন। সহস্রকমলে তাঁহার চরণকমল পূজা করিয়া-ছিলেন। সুযুম্নামার্গে কুলকুণ্ডলিনীকে উত্তোলন করিয়া সাধক সহস্রারবিন্দে তাঁহাকে উপাসনা করিয়াছিলেন। ভারতে যদি এ উৎসব না আসিত, তাহা হইলে এমন পবিত্র ভাবময় আনন্দোল্লাসের সম্পত্তি হইতে সমাজ চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হইত। ভারতের পরম সৌভাগ্য যে এইরূপ উৎসবের মুখ দেখিতে পাইয়াছে। অমাবাস্যার ঘোর অন্ধকারে জীব যখন অন্ধীভূত, নিদ্রার গভীর সাগরে জীব যখন নিমগ্ন, তখন প্রসুপ্ত জীবকে জাগ্রত ও প্রবুদ্ধ করিবার জন্যই ভক্তজনপালিকা করালা কালিকা মুণ্ডমালিকা মূর্ত্তির আবির্ভাব। ভারতের ঘোর

অন্ধতমসাচ্ছন্ন দুর্দ্দিনে নীরব শ্মশানক্ষেত্রে হতচেতন ভারতকে ভীম ভৈরব নির্ঘোষে জাগ্রত করিবার জন্যই রণরঙ্গে নৃত্যকালী নাচিয়া থাকেন। শ্যামা দুষ্ট অভক্তগণের পক্ষেই ভীমা, কালী অসুরগণের পক্ষেই বিকরালবদনা, কিন্তু ভক্তগণের পক্ষে অভয়-দায়িনী। সিংহী অপরের কাছে বিভীষণ হিংস্র জন্তু হইতে পারে, কিন্তু নিজের শিশুর পক্ষে সে মা, সেইরূপ শ্যামা নিজ ভক্ত শিশুর পক্ষে স্নেহময়ী জননী। নৃসিংহমূর্ত্তি দুষ্ট হিরণ্য-কশিপুর পক্ষে করাল কৃতান্ত, কিন্তু ভক্ত প্রহ্লাদের কাছে তিনি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু—স্নেহের অনন্ত প্রস্রবণ। শ্যামা আবার হাঁসিতে হাঁসিতে শান্তিময়ী জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তিতে দেখা দেন। প্রবুদ্ধ জীবকে আনন্দিত করিবার জন্যই সংহারিণী মূর্ত্তির পর তাঁহার এ জগদ্ধাত্রী অর্থাৎ জগদ্ধারিণী মূর্ত্তি। অনন্তর দুর্ব্বলের বলবিধান জন্য জিতেন্দ্রিয় কার্ত্তিকেয় মূর্ত্তিতে তিনি আবির্ভূত হন। তার পর রাসলীলা। এখানে ভক্তি প্রেমাকারে পরিণত হইয়া সাধককে সাধিকা সাজাইয়া তাঁহার সহিত সম্মিলিত করিয়া দেন। অনাদ্যা প্রকৃতি চৈতন্যের সহিত অভিন্নভাবে মিলিয়া যায়। আরাধিকা সাধিকা রাসরসিক রসেশ্বরের রসময় তরঙ্গে গা ভাসাইয়া দেন। এই মিলনের পর আনন্দ-লহরী প্রাপ্ত হওয়া চাই, প্রেমের পর প্রেমানন্দ উপভোগ করা চাই, তাই রাসলীলার পর বীণানাদিনী বাগ্‌বাদিনী আসিয়া বসন্ত ঋতুর উদ্বোধন করিয়া দেন। ভরা বসন্তের মলয়-মরুত-হিল্লোলে প্রেমোল্লাসের ভাব যখন জাগ্রত হইয়া উঠে, সেই সময়েই দোলযাত্রার ব্যবস্থা। রাসলীলায় কেবল মিলনের ব্যাপার, দোলযাত্রায় কেবল মিলনানন্দ উপভোগের ব্যাপার।

তাই আবিরের ছড়াছড়ি, আনন্দের অতুল কল্লোল। ইহাই সাধনার চরমাবস্থা। এই কোমল ভক্তিযোগে যাহার কিছু হয় না, মলিনতা বিশুষ্কতায় হৃদয় যাহার আচ্ছন্ন, তাহারই পক্ষে হঠযোগাদির কঠোর বিধি বিহিত হইয়াছে। তাই সর্ব্বশেষে চড়কপূজার ব্যবস্থা। নাকফোঁড়া পিঠফোঁড়া, জলে ডুবিয়া থাকা আদি ব্যাপার এই পূজার অঙ্গ। এ সমস্ত হঠযোগের প্রক্রিয়া মাত্র।

এতক্ষণে বুঝিলাম ভারতের সমস্ত উৎসবই আধ্যাত্মিক সূত্রে গাঁথা। এখন অনেকে বলিতে পারেন, এতগুলি উৎসব থাকিতে আবার এ হরিসভার উৎসব কেন? এ নূতন উৎসবের সৃষ্টি হইল কেন? এ কথার উত্তর আমরা দিতে চাই।

পূর্ব্বে যে সমস্ত উৎসব উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে ধ্যান চাই, যোগ চাই, পূজা পাঠ চাই, নিয়মমত কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান চাই! সুতরাং তাহাতে শক্তি সামর্থ্যের প্রয়োজন। আমরা কলিযুগের নিতান্ত মন্দ অধিকারী শক্তিহীন জীব, আমাদের পক্ষে এমন উৎসব চাই, যাহা শক্তিহীন হইয়াও করিতে পারি। তাই এ নামের উৎসব আমাদের পক্ষে উপযুক্ত উৎসব। আমি কর্ম্মকাণ্ড ত্যাগ করিতে বলিতেছি না, আমার বলিবার অভিপ্রায় এই যে, আমাদের মত দুর্ব্বল অধিকারীর পক্ষে এই নামোৎসবই সহজসিদ্ধ সাধনা, কেননা ইহাতে শক্তি ব্যয়ের প্রয়োজন হইবে না। আমরা দীন দুঃখী পথের কাঙ্গাল, অর্থব্যয় করিয়া উৎসব করিতে পারিব না। যে উৎসব নিঃসম্বল হইয়াও করিতে পারে, আমরা তাহাই চাই। আমাদের মত দীন দুঃখীর প্রতি কৃপা করিয়াই মহাপুরুষগণ এই নামোৎসবের

ব্যবস্থা করিয়াছেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ যে নামগাথা গান করিবার জন্য লালায়িত, সেই নাম কীর্ত্তন করিবার অবকাশ পাইয়াছি, সুতরাং আমরা ধন্য। যোগীন্দ্র পুরুষ যে নাম-সুধা পান করিতে করিতে মহাযোগনিদ্রায় স্তম্ভিত হইয়া যান, সেই নামের উৎসবে মাতিতে পারিয়াছি, ইহা আমাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের কথা। পাতক মহাপাতকাদি যে ভগবানের নাম উচ্চারণমাত্রেই বিদূরিত হয়, সেই করুণানিধান ভগবানের গুণবাদ শুনিবার জন্য তাঁহার মহিমা কথন জন্য তাঁহার ভাবে তাঁহার নামে মাতিবার জন্য তাঁহার প্রেমে বিভোর হইয়া তাঁহাকে মনঃ প্রাণে ধারণা করিবার জন্য সভার এই মহোৎসবের অবতারণা। তাঁহার নাম প্রেমভরে উচ্চারিত হইলে, স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল সুশীতল হয়। আজ আসুন সকলে জন্ম জীবন সফল করিবার জন্য প্রাণ ভরিয়া বলি, হরি হরি বোল। যেন সকল কার্য্যের প্রারম্ভে, মধ্যে ও অবসানে বলিতে পারি হরি হরি বোল। যেন ভিতরে বাহিরে তাঁহারই সত্তা অনুভব করিয়া কায়মনোবাক্যে বলিতে পারি হরি হরি বোল।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ

নিজনিকেতন যাত্রা।

দুঃখী হইতে ধনী পর্য্যন্ত ভিখারী হইতে সম্রাট পর্য্যন্ত জগতের সকলেই ইচ্ছার দাস—কল্পনার দাস। দীন দরিদ্র যেমন নিজ নিজ কল্পনার বিচিত্র চিত্রের সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ, মহারাজ চক্রবর্ত্তীও সেইরূপ বিমুগ্ধ। উচ্চ আশা, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, প্রিয়তম বস্তু পাইবার পিপাসা জগতের সকলেরই সমান। এ অংশে কাহারও সহিত কোন তারতম্য নাই, তারতম্য কেবল সামর্থ্য লইয়া—অধিকার লইয়া। ফুটন্ত ফুলের রাশি তোমার উদ্যানে শোভায় উথলিয়া উঠিতেছে। ফুলের মনোমুগ্ধকরী মাধুরীর ধারায় দীন পথিকের চিত্ত যেমন বিমুগ্ধ হয়, ফুল লইবার জন্য তাহার প্রাণে বাসনা যেমন জাগিয়া উঠে, তুমি বাগানের মালিক, তোমারও ফুল লইবার জন্য তেমনই সাধ যায়। কিন্তু তারতম্য এই, তোমার সাধ পুরিবার উপায় আছে, কেন না বাগান তোমার নিজের অধিকৃত। দীন পথিকের সে সম্ভাবনা নাই, তাহার মনের আশা মনেই বিলীন হয়, অন্তরের পিপাসা অন্তস্তলেই ডুবিয়া যায়। ধনীর বিলাসভোগে ধনীরই একচেটিয়া অধিকার। নির্ধনের সে দিকে পদক্ষেপ করিবার যো নাই। তাই ধনীর অধিকারে পথের ভিখারী যদি বসিতে যায়, তাহা হইলে ধনী তাহাকে তাড়াইয়া দিতে চাহেন। একটা গল্প মনে হইতেছে। একজন পথিক সন্ন্যাসী দেশ পর্য্যটন

করিতে করিতে উপবনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। বনের চারিদিক্ ঘুরিয়া তিনি আশ্রয় স্থল খুঁজিতে লাগিলেন। খুঁজিতে খুঁজিতে এক প্রকাণ্ড মনোহর অট্টালিকা তিনি দেখিতে পাইলেন। সেই অট্টালিকাটি একজন নবাবের বিলাসমন্দির। অট্টালিকার দ্বারদেশে গিয়া সন্ন্যাসী দেখিলেন, সম্মুখে প্রকাণ্ড সভামণ্ডপে এক সুসজ্জিত রত্নখচিত সিংহাসন রহিয়াছে। সিংহাসন শূন্য, কেহই তাহাতে বসিয়া নাই। সিংহাসনের চারিদিকে বসিয়া পারিষদ্‌বর্গ যেন কাহার অপেক্ষা করিতেছে। সন্ন্যাসী আর কালবিলম্ব করিলেন না, কাহাকেও কিছু না বলিয়া একবারে সবেগে গিয়া সিংহাসনে বসিয়া পড়িলেন। সভাস্থ পারিষদ্‌গণ অবাক্! এমন সময় নবাব আসিয়া পৌঁছিলেন। নবাব ফকীরের কাণ্ড দেখিয়া বলিলেন, এ আসন আপনার বসিবার জন্য নয়। ইহা রাজসিংহাসন, আমারই জন্য। ফকীর বলিলেন, ইহা তোমার আসন কে বলিল? এ স্থান পান্থশালা, এ আসন পথিকের বিশ্রাম করিবার জন্য। ইহা যে তোমারই আসন এ বিষয়ে প্রমাণ কি? রাজা বলিলেন, আমার পিতৃপিতামহগণ এ আসন অধিকার করিয়া আসিতেছেন, আমিও বাল্যকাল হইতে ইহা অধিকার করিয়া আসিতেছি। সুতরাং ইহা আমার বৈকি। ফকির বলিলেন, সেই জন্যই তো বলিতেছি, এ আসন পথিকের। তোমার পিতৃপিতামহগণ এ আসন কয়েক বৎসর অধিকার করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তুমিও না হয় আরও বিশ বৎসর ইহা অধিকার করিয়া কোথায় চলিয়া যাইবে। আমিও সেইরূপ ইহা দুচার ঘণ্টা অধিকার করিয়া চলিয়া যাইব। দুদশ বৎসরের অধিকারের

জন্ত ইহা এত দিন "তোমার" হইতে পারে, আর দুচার ঘণ্টা অধিকারের নিমিত্ত ইহা এতক্ষণের জন্ত "আমার" হইবে না কেন? তুমিও পথিক, আমিও পথিক। নবাব নিরুত্তর। ফকীর আরও বলিলেন, তোমার পিতৃপিতামহগণ ইহাতে কিছুদিন কাটাইয়াছেন, তুমিও না হয় কিছুদিন কাটাইবে, আমিও সেইরূপ না হয় কিছুক্ষণ কাটাইয়া লইলাম। তুমি, আমি চলিয়া গেলে আবার কেহ আসিয়া এ পান্থশালায় কিছু দিন কাটাইবে। সুতরাং ইহাকে তুমি একবারেই "আমার" বলিয়া বুঝিয়াছ কেন? তাহাই প্রকৃত "আমার", যাহাকে কখনও ছাড়িতে হইবে না, যাহার সহিত কখনও বিচ্ছেদ হইবে না। তেমন বস্তুই অন্বেষণ করা উচিত। ফকিরের ভাষায় আমরাও তাহাই বলিতে চাই। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত পথের পথিক আমরা এ নিদারুণ সংসার গহনকান্তারে আগন্তুক। আমাদের ঘর বাড়ি সমস্তই পান্থশালা। দুদশ দিনের জন্য এ পান্থশালায় বিশ্রামপূর্ব্বক স্বস্বকার্য্য সাধন করিয়া নিজ নিকেতনে যাইবার জন্য সম্বল বা সাধন লইতে হইবে। এ পান্থশালায় ক্ষণিক বিশ্রাম করিয়া চিরবিশ্রাম-ভবনের পথে যাইতে হইবে। যেখানে গেলে আর ফিরিতে হয় না, যেখানে গেলে "আমার" ও "আমি" মিলিয়া সমস্তই "আমিময়" হইয়া যায়, তাহাই আমাদের "নিজ নিকেতন।" সংসার আমাদের নিজ নিকেতন নহে। ইহা আমাদের প্রবাসক্ষেত্র। ভ্রান্তি-বশতঃ সংসারের উপর আমিত্বরূপ একটা আবরণ রচনা করিয়াছি। তাই "আমার সংসার আমার ঘর বাড়ি, আমার জিনিষ পত্র" বলিয়া মনে করি। যাহা আমার জিনিষ, তাহা

আমার সহিত চির অবিচ্ছিন্ন থাকা চাই। সংসার যদি "আমার জিনিষ" হইত, তাহা হইলে তাহার সহিত আমাদের কখনও বিচ্ছেদ ঘটিত না। সংসারে আসিবার পূর্ব্বে সংসারের সহিত, আমাদের কোন সম্বন্ধ ছিল না, মরিয়া গেলেও বর্ত্তমান সংসারের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। সুতরাং অতি অল্প সময়ের জন্য যাহার সহিত সম্বন্ধ, তাহা কি আমার জিনিষ হইতে পারে? যাহা আমার সহিত নিত্যনিয়ত বিদ্যমান, তাহাই আমার নিজস্ব। অবিদ্যাবশতই সংসারকে "আমার" বলিয়া মনে করিয়াছি, তাই তাহাকে ছাড়িতে কষ্ট হয়। কেননা যাহা "আমার জিনিষ" তাহার উপর আমাদের মায়া মমতা বসিয়া যায়। ছেলে পিলে ঘরকন্না স্ত্রী পরিবার সমস্তই "আমিত্ব মাখা" বলিয়াই আমাদের এত প্রিয়—এত রমণীয়। জগতের যে পদার্থ আমিত্বের অরুণ কিরণে প্রতিভাত, তাহাই আমার লোভনীয়। যে পদার্থে আমিত্বের সম্বন্ধ যে পরিমাণে আছে, তাহা সেই পরিমাণেই আমার ঘনিষ্ঠ। আমিত্বের সম্বন্ধ না থাকিলে জগতে কেহই কাহাকে ভালবাসিত না। যাহা আমিত্বমাখা, যাহা নিজস্ব, তাহা তুচ্ছ হইলেও তাহাই তাঁহার পক্ষে প্রিয়। রাজার প্রকাণ্ড অট্টালিকা পড়িয়া গেলে তাঁহার যেমন দুঃখ হয়, নিঃসম্বল দীনের ক্ষুদ্র পর্ণকুটির পড়িয়া গেলেও তাহার তেমনই মনোবেদনা উপস্থিত হয়। কেননা তাহার পক্ষে তাহা নিজস্ব। সম্রাট্ রাজত্ব হারাইয়া যেমন যাতনা অনুভব করেন, ভিক্ষুকের একটি ফুটো ঘটি হারাইয়া গেলে সেইরূপ দুঃখ তাহার উপস্থিত হয়। আজ মহাসমরক্ষেত্রে সৌম্যমূর্ত্তি বীরেন্দ্রকেশরীর মৃত্যু হইলে সে সংবাদে তোমার যে

দুঃখ না হয়, তোমার একটি খাঁদা ছেলের কোনরূপ একটু অসুখ হইলে তাহা অপেক্ষা গভীর দুঃখসাগরে ডুবিয়া যাও, কেননা তাহা তোমার "নিজ সামগ্রী।". বাল্যকাল হইতে ধীরে ধীরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ও সঙ্গের গুণে এই আমিত্ব জ্ঞানের বিস্তার হয়। শিশু প্রথমে মা'কে "আমার" বলিয়া বুঝে, পরে পিতাকে, তৎপরে প্রতিবেশীকে, কুটুম্ব আত্মীয় .স্বজন বন্ধু বান্ধবকে "নিজস্ব" বলিয়া বুঝে। তদনন্তর যৌবনে স্ত্রী পরিবার পুত্র পৌত্রাদিকে আপনাব বলিয়া অনুরাগ করে। এইরূপ আমিত্ব জ্ঞানের ক্রমিক বিকাশ হয়। এই "আমিত্ব" আমাদের অস্থিতে অস্থিতে মজ্জায় মজ্জায় প্রতি স্নায়ু শিরার অণু পরমাণুতে বিজড়িত। পার্ব্বতীয় লতা যেমন প্রস্তরের তলদেশ ভেদ করিয়া বদ্ধমূল হয়, সেইরূপ এই "আমিত্ব" বল্লরীর মূলদেশ আমাদের মনঃ প্রাণ আত্মার অন্তস্তল ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এ গাঢ়সম্বন্ধ শিকড়কে আমরা উঠাইতে অসমর্থ। আমাদের ক্ষীণ শক্তি "আমিত্ব জ্ঞানের" নিকটে পরাভূত হইয়া তাহারই পদতলে বিলুণ্ঠিত হয়। জানি "আমিত্ব" পরিত্যাগ করিতে পারিলে জীব সুখী হয়, জানি "অহং মমেতি" জ্ঞান বিবর্জ্জিত হইতে পারিলে পরমা নিবৃ'তি লাভ হয়, কিন্তু আমার মত মায়ামমতা-বিমোহিত আসক্তিপ্রাণ জীবের পক্ষে তাহা আকাশকুসুম। আমিত্ব ত্যাগ করিতে পারিব না, কিন্তু এই ক্ষুদ্র আমিত্বকে বিস্তৃত করিয়া লইতে পারিব। আমিত্বের ত্যাগে যেমন সুখ, আমিত্বের বিশ্ব-বিশাল বিস্তৃতিতে তেমনই সুখ। আমিত্বের ক্ষেত্রকে আমরা বর্দ্ধিত করিয়া লইব। সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ না হইয়া আমিত্ব যেদিন বিশ্বপতির অনন্তসত্তায় বিলীন হইবে—জলে

নিপতিত বিন্দুমাত্র তৈলের স্থায় তাবৎ পদার্থে ব্যাপিয়া যাইবে, সংসারের ক্ষুদ্র পিঞ্জর পরিহার করিয়া আমিত্ব যেদিন পরম বিভুর চরণাকাশে উড্ডীয়মান হইবে, সেই দিনই আমিত্বের পূর্ণ পরিণতি। সেই দিনই তাহার চির সমাধি হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যাহা আমার নিজ সম্পত্তি, তাহা বড় মধুর, বড় সুন্দর। তিল তিল করিয়া সংগ্রহপূর্ব্বক তিলোত্তমার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যমাধুরী যেমন বিরচিত হইয়াছে, সেইরূপ জগতের যাহা কিছু ললিত, যাহা কিছু কমনীয়, যাহা কিছু মনোমোহন, সে সমস্তের সার সর্ব্বস্ব সমষ্টিবদ্ধ হইয়া "আমার" জিনিষে যেন উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তাই "আমার" কথাটি শুনিতে মিষ্ট, বলিতে মিষ্ট, ভাবিতেও মিষ্ট। যাহা আমার, তাহাই যে আমার পক্ষে উত্তম অর্থাৎ হিতকারী, অথবা যাহা উপকারী, তাহাই আমার প্রিয় কি না, এ সমস্ত তত্ত্বকথা এখন বিচার করিবার অবসর আমার নাই। আমি যে এতক্ষণ বলিয়া আসিলাম, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যাহাকে চিরদিন "আমার" বলিয়া বুঝিয়া আসিয়াছি, তাহার কুহকে আমরা মজিয়া যাই, তাহার আসক্তিতে আমরা ডুবিয়া যাই। তাহার গুণাগুণের দিকে তাকাই না। তাহার শোভন অশোভনের দিকে ভ্রূক্ষেপ করি না, প্রাণের একটানা স্রোত সেই কেন্দ্রস্থলের দিকে ধাবিত হয়। জগতের চক্ষে তাহা ঘৃণিত হউক, তুচ্ছ হউক, অন্তরের টান কিন্তু কি জানি কেন সেইদিকে তীব্রবেগে প্রবাহিত হয়। কলিকাতা হইতে কোন সুদূরবর্ত্তী পল্লীগ্রামে তোমার হয় ত নিজ গৃহ। কলিকাতায় কার্য্যোপলক্ষে তুমি প্রবাস করিতেছ। কলিকাতা অতি সুন্দর সহর, অতি সমৃদ্ধিশালী নগরী। কলিকাতার চক্ষে তোমার জন্মভূমি পল্লীগ্রাম

নিতান্ত কদর্য্য স্থান হইতে পারে, কিন্তু তোমার চক্ষে তোমার পল্লীগ্রাম স্বর্গ হইতেও গরীয়ান্। কেননা তোমার নিজের নিকেতন তথায় বিদ্যমান। তাই বিলাসের নন্দনকানন কলিকাতায় থাকিয়াও অবসর পাইলেই বাড়ি যাইবার বাসনা তোমার প্রাণে জাগিয়া উঠে। কলিকাতার সহস্র প্রলোভনময় পদার্থরাশির উজ্জ্বল বিভা তোমার প্রাণের ভিতরে লীলা করিলেও সে সমস্তের উপর তোমার নিজ নিকেতনের গুপ্ত মাধুরী কি জানি কেন ভাসিয়া উঠে। নিজসামগ্রীর এমনই মাহাত্ম্য এমনই কুহকিনী আকর্ষণী শক্তি আছে। তোমার নিজত্ব—তোমার আমিত্ব তোমার স্বদেশের সহিত কলিকাতা অপেক্ষা নাকি বহুদিন হইতে বহুপরিমাণে বিজড়িত, তাই, তাহার প্রতি তোমার এত মায়া, এত মমতা। তাই বাড়ির জন্য এত লালসা। বাহ্যশরীরী জীবের বহির্জ্জগতের বাড়ির প্রতি যেমন আগ্রহ, সেইরূপ অন্তঃশরীরী অন্তরাত্মার নিজ নিকেতনে যাইবার আবেগ সূক্ষ্মভাবে ক্রিয়া করিতেছে। কিন্তু ভ্রান্তিবশতঃ যাহাকে জীব নিজের বাড়ি বুঝিয়া ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে, তাহা ত পান্থশালা। আবার যাহা বাস্তবিকই নিজ ধাম, যাহাকে নিজের জিনিষ ভাবিয়া ভালবাসা উচিত বলিয়া শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে দিকে ত প্রাণ যাইতে চাহে না। মনঃ প্রাণ ত সে পথের পথিক হইতে চাহে না। সুতরাং এ বিভ্রাটের উপায় কি ?

শাস্ত্র বলিতেছেন ভগবানের নির্ম্মলধামই জীব! তোমার শান্তিময় নিজ নিকেতন। ভগবানই তোমার প্রকৃত আত্মীয়। তাঁহাকে লাভ করিতে পারিলে পরম সুখ প্রাপ্ত হইবে। শাস্ত্রের এ কথায় মনঃ প্রাণ কিন্তু সায় দিতে শীঘ্র সাহস করে না।

বিকৃতিময় চিত্তে কেবল সন্দেহের তরঙ্গই উঠিতে থাকে। ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইলে সুখ লাভ হয়, এ কথায় আমার মলিন অন্তঃকরণ প্রতিধ্বনি করে কৈ? বরং বিপরীত ভাবনার উদয় হইয়া থাকে। একটা গল্প বলিয়া সে বিপরীত ভাবনার সমর্থন করিতেছি। কোন একটি ভদ্রলোক পাগলদের আচার ব্যবহার দেখিবার জন্য এক উন্মাদ-শালায় (পাগ্‌লা-গারদে) গিয়া উপস্থিত হন। তিনি পাগলদের রীতি নীতি চাল চলন দেখিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময় একটা পাগল তাঁহাকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়! আমার একটি গুহ্য প্রশ্ন আছে। অনুগ্রহ করিয়া উত্তর দিবেন কি?

ভদ্রলোক। কি প্রশ্ন, বল।

পাগল। লোকে বলিয়া থাকে, নিদ্রায় সুখ লাভ হয়। আমি কিন্তু কথাটা বুঝিতে পারি না। আপনার মত কি?

ভদ্রলোক। আমার আবার মত কি? নিদ্রায় সুখ হয়, ইহা ত ঠিক কথা, তাহা তুমি বুঝিতে পার না, এই জন্যই ত লোকে তোমায় পাগল বলে।

পাগল। আচ্ছা আমি না হয় পাগল। আপনি ত পাগল নহেন, কথাটা আমায় বুঝাইয়া দিন দেখি, নিদ্রার কোন্ সময়ে সুখ হয়।

ভদ্রলোক। কেন, যখনই নিদ্রা আসে তখনই ত সুখবোধ হয়।

পাগল। কোন প্রিয় বস্তু পাইবার সময়ে যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে বস্তুটি সম্পূর্ণরূপে না পাওয়া যাইতেছে, ততক্ষণ মনে একটা আকুলি বিকুলিই জন্মিতে থাকে, প্রিয় বস্তু পাইবার আশায়

মনে উৎকণ্ঠাই হইতে থাকে, ইহা বোধ হয় আপনিও স্বীকার করিবেন। সুতরাং নিদ্রা যদি সুখের সামগ্রী হয়, তবে সেই প্রিয় বস্তুর সমাগম না হওয়া পর্য্যন্ত চিত্ত ত ব্যাকুলই থাকে, অতএব তখন সুখ হয় কেমন করিয়া ?

ভদ্রলোক। আচ্ছা নিদ্রার আগমন সময়ে সুখ না হউক নিদ্রা আসিয়া গেলে ত সুখ পাইতে পারি। নিদ্রার উপভোগ কালে ত সুখানুভব সম্ভব।

পাগল। তাহাই বা কেমন করিয়া হইতে পারে ? নিদ্রার সময়ে ত তুমি গাঢ় সুষুপ্তিতে অভিভূত থাক, তোমার মনঃপ্রাণ ইন্দ্রিয় সমস্তই ত সে সময়ে অচেতন থাকে, সুতরাং তখন সুখানুভব হয় কেমন করিয়া ?

ভদ্রলোক। তবে বোধ হয় নিদ্রা ভঙ্গের সময় সুখ হয়।

পাগল। নিদ্রা যদি প্রিয় বস্তু হয়, তবে তাহার বিচ্ছেদে সুখ হইবে এ কেমন কথা ? প্রিয় বিচ্ছেদে দুঃখই হইয়া থাকে। প্রিয় বস্তুর বিরহে সুখ হয়, ইহা ত পাগলেই বলিতে পারে। এখন ভাবুন দেখি, আপনি পাগল, কি আমি পাগল।

ভদ্রলোকটি নিরুত্তর। তখন পাগল আবার বলিল, নিদ্রার কি আগমন সময়ে কি উপভোগকালে কি ভঙ্গে কোন্ সময়ে যে সুখ লাভ হয় তাহাতো বুঝিলাম না। নিদ্রাতে সুখ হয় ইহা আমার বিশ্বাস হয় না। আমার তো এই মত। আমার এই মতের সহিত সাধারণ জগতের মত মিলে না, তাই তাহারা আমাকে পাগল বলে। তেমনি আমার মতের সহিত তাহাদের মত মিলে না, সুতরাং আমিও তাহাদিগকে পাগল বলিতে পারি। জগতের সকলেই বদ্ধ পাগল।

পাগলের মনে যেমন আশঙ্কা জন্মিয়াছিল, আমাদের মত পাগলের মনেও সেইরূপ ঈশ্বর সম্বন্ধে আশঙ্কা উপস্থিত হয়। শাস্ত্র বলিতেছেন, ঈশ্বরপ্রাপ্তিতে সুখ লাভ হয়, কিন্তু কোন্ সময়ে সুখ হয়, তাহা ত বুঝিতে পারি না। ঈশ্বররূপ পরম প্রিয় বস্তু সমাগমের সময়ে প্রিয় বস্তু পাইবার আশায় উৎকণ্ঠাময়ী এক রকম ব্যাকুলতা চিত্তকে ঘিরিয়া ফেলে। সুতরাং সে সময়ে শান্তি কোথায়? আবার ঈশ্বরকে যখন প্রাপ্ত হইলাম, তখন তাঁহার অনন্ত চিদেক রসসাগরে আমার আমিত্ব ডুবিয়া যায়। সে অকূল পাথারের তীব্র তরঙ্গে আমার আমিত্ব স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারা হইয়া কোথায় ভাসিয়া চলিয়া যায়। আমিত্ব তখন মরিয়া যায়। সুতরাং সে রস, সে শান্তি তখন উপভোগ করিবে কে? পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি "যাহার সহিত" আমিত্বের সম্বন্ধ আছে, তাহাকেই আমরা ভালবাসি, তাহাই আমাদের পক্ষে প্রিয় পদার্থ। ঈশ্বরের কাছে আমাদের আমিত্ব যখন স্থির হইয়া দাঁড়াইতেই পারে না, তখন আমিত্বের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ থাকিল কৈ? সুতরাং ঈশ্বরকে "আমার জিনিষ" ভাবিয়া ভালবাসিতে পারি কৈ? ভালবাসার রাজ্যে যে আমিত্ব প্রধান সম্বল, ঈশ্বরের জলন্ত চিদগ্নিচ্ছটায় পুড়িয়া তাহা যখন ছারখার হইবে, তখন ঈশ্বরকে "আত্মীয়" বলিয়া ভাবিতে পারি কৈ? সুতরাং, শাস্ত্র ত বলিলেন, জীব! ঈশ্বরই তোমার আত্মীয়। তাঁহাকেই ভালবাস; কিন্তু আমাদের অবোধ মন ত তাহা মানিতে চাহে না। আমরা মুখে বলি বটে তাঁহাকে ভালবাসি, কিন্তু তাহা ত কাজের কথা নহে। ভালবাসার গতি একদিকেই ছুটিয়া থাকে। আমাদের ভালবাসা যদি

ঈশ্বরে সমর্পিত হইত, তাহা হইলে পুনরায় তাহা সংসারের দিকে ধাবিত হয় কেন? আমাদের হৃদয়ের প্রেমসিংহাসনে সংসারকে বসাইয়া ফেলিয়াছি, সুতরাং তিনি তথায় বসিবেন কেন? নর্দ্দামার কৃমি কীট যথায় কিলিবিলি করে, রাজরাজেশ্বর তথায় কি বিরাজ করিতে পারেন? জগন্মাতার চিরসুন্দর মাধুরীচ্ছটায় মগ্ন হইয়া যদি তাঁহাকেই মনঃপ্রাণে ভালবাসিতে পারিতাম, তবে আর সংসারের স্ত্রীরূপের দিকে আসক্তির কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারিতাম কি? একটি প্রকৃত ঘটনা মনে হইতেছে। এক পরম সুন্দরী বেশ্যা নগরীর পথপার্শ্বে বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া রূপের মাধুরী ছড়াইতেছে, এমন সময় একজন পথিক সাধু তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। বেশ্যাটিকে একবার প্রাণ ভরিয়া দেখিয়াই সাধু কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার দুটি চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। বেশ্যা ভাবিল বোধ হয় তাহারই কোন অপরাধে মর্ম্মাহত হইয়া সাধু কাঁদিতেছেন। বেশ্যা ভীত হইয়া করযোড়ে বলিল, প্রভো! আপনি কেন কাঁদিতেছেন? আমি যদি আপনার নিকট কোন অপরাধ করিয়া থাকি তবে মার্জ্জনা করুন। সাধু বলিলেন সুন্দরি! না! তুমি আমার কোন অনিষ্ট কর নাই, আমি তাহার জন্য কাঁদিতেছি না। তোমার ঐ অপরূপ রূপ-লাবণ্য-লহরীর লীলা-বিলাস দেখিয়া আমার মনে হইল যে সৌন্দর্য্যের আধার হইতে বিন্দুমাত্র ক্ষরিত হইয়া সংসারের এই সামান্য রূপ এত মধুর হইয়াছে, না জানি সে আধার কত মধুর কত সুন্দর। সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যের সাগরকে এ জনমে দেখিতে পাইলাম না, তাই মর্ম্মবেদনায় আকুল হইয়া কাঁদিতেছি। যিনি প্রকৃত ভক্ত, যিনি

তাঁহার ভালবাসায় পাগল, তাঁহার উহাই মর্ম্মকথা। আর আমাদের মত অধম সংসার-পাগলের যাহা মর্ম্মকথা, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমরা আমিত্ব লইয়াই বিব্রত। যে জিনিষটিকে আমার বলিয়া আয়ত্ত করিতে পারি, তাহা লইয়াই আমরা সুখী হইতে চাই। আমাদের আমিত্ব সংসারের সহিত অধিক পরিমাণে জড়াইয়া গিয়াছে, তাই তাঁহার রাজ্যে যাইতে ভীত হয়। সংসারের গহন কানন হইতে আমিত্ববল্লরীর মূলোৎপাটন করিয়া ভগবানের প্রেমোদ্যানে তাহাকে রোপণ করিতে হইবে। সেই দেশের অমৃত-সলিল যখন তাহার মূলদেশে সিঞ্চিত হইবে, সেই দেশের বসন্ত বায়ু যখন তাহার বিশুষ্ক শাখা পল্লবের উপর দিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইবে, তখন সেই আমিত্বলতায় যে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবে, তাহার সৌগন্ধে দিগন্ত আমোদিত হইয়া উঠিবে, ভুবন ভরিয়া যাইবে। যে ফল ধরিবে, তাহার সুরসে ত্রিভুবন পরিতৃপ্ত হইবে। স্বর্গলোক হইতে দেবগণ আসিয়া সে ফলের সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া বিমোহিত হইবেন। সে ফল কেবল রসভরা, তাহাতে এমন বীজ নাই যে আবার সংসারে পতিত হইয়া পুনরাবৃত্তির সূচনা করিবে। এ ফলে সমস্ত ফলকামনাই নিঃশেষ হইয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমিত্ব হইতেই ভালবাসার উৎপত্তি। কিন্তু এই আমিত্বেই যখন ভালবাসার পূর্ণ পরিণতি হইবে, তখনই তাহা আদর্শ হইয়া দাঁড়াইবে। ভেদবুদ্ধির গর্ভে ভালবাসার জন্ম, কিন্তু অভেদবুদ্ধির আগারে পূর্ণিমার চন্দ্রমার মত যে দিন ভালবাসা পরিপুষ্ট হইয়া উঠিবে, সেই দিনই তাহার চরমোৎকর্ষ। দ্বৈতবুদ্ধি ভালবাসার ভিত্তি রচনা করেন, কিন্তু

অদ্বৈতবুদ্ধি যে দিন নিজক্রোড়ে তুলিয়া সেই ভালবাসার পার্থিব দেহে স্বর্গীয় তেজের সঞ্চার করিয়া দিবেন, সেই দিন ভালবাসা মুক্তির সোপান হইয়া দাঁড়াইবে। ভালবাসা ও ভালবাসার উপভোগ্য পদার্থ ও যিনি ভালবাসেন এই ত্রিধারা মিলিয়া যে দিন এক ধারায় প্রবাহিত হইবে, তিনটি মিলিয়া যে দিন একটিতে মিশিবে, সেই দিনই ভালবাসার পূর্ণ পর্য্যবসান। সুতরাং অভেদই ভালবাসার লক্ষ্য। এই জন্য রাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্ন, শ্রীকৃষ্ণও রাধার সহিত অভিন্ন। রাধা আবার প্রেমের সহিত অভিন্ন, এই জন্য তিনি প্রেমময়ী। শ্রীকৃষ্ণও প্রেমের সহিত অভিন্ন, এই জন্য তিনি প্রেমময়। ক্ষীর ও ক্ষীরের পুতুল যেমন অভিন্ন পদার্থ, সেইরূপ প্রেম ও প্রেমের পুত্তলী রাধাও একই পদার্থ। এইরূপ আমি, আমার জিনিষ ও আমার জিনিষের প্রতি ভালবাসা এই ত্রিত্ব মিলিয়া যে দিন একত্বে পরিণত হইবে, সেই ত্রিবেণীসঙ্গমে জীব যেদিন অবগাহন করিতে পারিবে, সেই দিনই তাঁহার আত্মা চরিতার্থ হইবে।

"আমার জিনিষ" বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ "আমিকে" স্বতন্ত্র-রূপে বুঝা চাই। নিজ নিকেতন বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ নিজ জিনিষটি প্রতিপন্ন করিতে হইবে। যেমন একটি সাজার বিষয়ের উপর পাঁচ ভাইয়েরই অধিকার আছে; কিন্তু কে কোন্ টুকুর মালিক, তাহা অগ্রে প্রমাণিত না হইলে প্রত্যেকের বিষয়ে স্বত্ব সাব্যস্ত হইবে কেন। সুতরাং স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে হইলে অগ্রে মালিক ঠিক হওয়া চাই। আমার জিনিষটিও সেইরূপ সাজার বিষয়। এই সাজার বিষয়ের কোনটুকুতে কোন্ "আমি" প্রকৃত মালিক, তাহার নির্ণয় হওয়া চাই। যখন কোন সুচারু

বস্ত্র লইয়া শরীরকে আচ্ছাদন করিবার সময় বলি, "আমি কাপড় পরিতেছি" তখন শরীর "আমি"। কেননা শরীরে অহং বুদ্ধি হইয়াছে। যখন কোন রূপবতী যুবতীর রূপতরঙ্গে মুগ্ধ হইয়া চক্ষুরিন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হইতেছে, তখন চক্ষুরিন্দ্রিয় "আমি।" এইরূপ ঘ্রাণেন্দ্রিয়াদিও আমি। যখন স্বপ্নে সুখাদি অনুভব করিতেছি, কিম্বা চিন্তার গভীর সাগরে ডুবিয়া আছি, তখন মনই "আমি।" যখন ক্ষুধা তৃষ্ণায় আকুল হইয়া তন্নিবারণার্থ দৌড়িতেছি, তখন প্রাণ "আমি।" আবার যোগানন্দসুধা পান করিবার জন্য যখন ছুটিতেছি তখন আত্মাই আমি। সুতরাং বস্ত্রাদি হইতে যোগানন্দ পর্য্যন্ত সমস্তই "আমার জিনিষ" অর্থাৎ সাজার বিষয়। আর শরীরাদি যেন পাঁচ ভাই তাহার অধিকারী। শরীররূপ "আমির" যাহা বিষয়, তাহাতে ইন্দ্রিয়রূপ আমি, অধিকার নাই। মনরূপ "আমির" যাহা নিজস্ব, তাহাতে আত্মারূপ আমির দাবিদাওয়া নাই। সুতরাং প্রত্যেকের অধিকার ভিন্ন ভিন্ন, বিষয়ও ভিন্ন ভিন্ন, মালিক'ও ভিন্ন ভিন্ন। আজ কনিষ্ঠের বিষয়ে জ্যেষ্ঠ যদি হস্তক্ষেপ করিতে যান, তবে তাহা যেমন অনধিকারচর্চ্চা, সেইরূপ শরীরাদির উপভোগ্য বিষয়কে আত্মা যদি "আমার জিনিষ" বলিয়া কাড়িয়া লইতে যান, তাহা হইলে আইনানুসারে তিনি দণ্ডনীয়। সুতরাং আইনের সূক্ষ্ম কষ্টিপাথরে কষিয়া বুঝা গেল, প্রত্যেকের বিষয় স্বতন্ত্র। আমিরূপ অধিকারীও ভিন্ন ভিন্ন। এতগুলি আমিরূপ কনিষ্ঠাদি ভাইয়ের মধ্যে সেই আমিই প্রকৃত জ্যেষ্ঠ, যে আমি সর্ব্বাগ্রে জগতে আছি. অর্থাৎ যে আমি জন্মিবার পূর্ব্বে ছিলাম, বর্ত্তমানে আছি ও ভবিষ্যতেও থাকিব।

সেই আমিই শ্রেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ ও বরিষ্ঠ, যে "আমির" পরিবর্ত্তন নাই, হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, বিনাশ নাই, ক্ষয় নাই, অটল অচলের ন্যায়, স্থির ধীর গম্ভীর সাগরের ন্যায় এ অনন্ত কালবক্ষে যিনি দেদীপ্যমান রহিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত "আমি" যে আমি আমাদের অন্তর্জগতে বাস করায়, আমাদের মনঃ প্রাণ ইন্দ্রিয় তাঁহার আলোকে আলোকিত হইতেছে, যে "আমার" ব্যাপকতাময়ী সত্তায় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ডুবিয়া গিয়াছে, সেই আমিই প্রকৃত আমি। অন্নময় প্রাণময়াদিকোষ হইতে সেই আমিকে বাছিয়া লইতে হইবে। চম্পক কুসুমের গন্ধ যখন পার্থিব বায়ুস্তর ভেদ করিয়া আমাদের ঘ্রাণপথে আবির্ভূত হয়, তখন সেই বায়ুস্তরগত কত প্রকার পরমাণু তাহার সহিত মিশ্রিত হয়, কিন্তু সেই মিশ্রিত পরমাণু হইতে চম্পক গন্ধ যেমন স্বতন্ত্র পদার্থ, সেইরূপ সংসারের পাঁচমিশালি জিনিষ হইতে আত্মাকে স্বতন্ত্ররূপে বুঝিতে হইবে। এই আত্মার যাহা নিজস্ব, তাহাই "আমার জিনিষ।" সংসার আত্মার নিজস্ব নহে, কেননা শরীরাদিই তাহার মালিক, তাহা পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং শরীর ইন্দ্রিয়াদির যাহা নিজ ধন, তাহার উপর তাহাদের ভালবাসা বা আসক্তি জন্মিতে পারে, কিন্তু আত্মার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। কেননা আত্মা নির্লিপ্ত। এই নির্লিপ্ত আত্মার নিজ সামগ্রী কি? স্বস্বরূপই ইহার নিজ সামগ্রী। ইহা ছাড়া আত্মার আমার জিনিষ বলিবার আর কিছু নাই। সুতরাং স্বস্বরূপই তাঁহার ভাল বাসার ধন। দ্বৈত জগৎ হইতে উৎপন্ন হইয়া ভালবাসা যখন স্বস্বরূপগত হয়, প্রেম, প্রেমের জিনিষ ও যিনি প্রেম করেন,

এই ত্রিবিধ ভেদ মিটিয়া গিয়া প্রমাণ প্রমেয় ও প্রমাতা এই ত্রিত্ব বিনষ্ট হইয়া যখন সমস্তই আত্মরতিতে পর্য্যবসন্ন হয় তখনই ভালবাসার চূড়ান্ত আদর্শ। তাই পূর্ব্বে বলিয়াছি‚ অভিন্নতাই প্রেমের উদ্দেশ্য।

এতক্ষণ ধরিয়া নিজ সামগ্রীটি কি, "আমি" পদার্থ কি, তাহার আলোচনা করিলাম। এখন নিকেতনের স্বরূপ কি, লক্ষণ কি, তাহা প্রতিপাদন করিতে হইবে। যেখানে আমি ও আমার সমস্তই মিলিয়া আমিময় হইয়া যায়, সেই অদ্বৈত ধামই জীবের নিজনিকেতন। যেমন অগ্নিপিণ্ড হইতে বিস্ফুলিঙ্গরাশি চারিদিকে বিকীর্ণ হয়. জ্যোতিঃসমষ্টিময় সূর্য্য হইতে কিরণরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ সমষ্টিভূত পরমাত্মপিণ্ড হইতে এই ব্যষ্টি জীবাত্মসমূহ নিঃসৃত হইয়াছে। সুতরাং যে কেন্দ্রস্থল হইতে বিচ্যুত হইয়া কক্ষভ্রষ্ট লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের ন্যায় জীবাত্মা বিচরণ করিতেছে, সেই কেন্দ্রস্থলই জীবের সম্মিলনস্থল, সেই দেশেই তাহার নিজ নিকেতন। বহু-দিন হইতে সে আবাসস্থানের পন্থা ভুলিয়া গিয়া আমরা অপথে কুপথে ঘুরিতেছি। আমরা বাড়ি হারাইয়া ফেলিয়াছি বটে, কিন্তু বাড়ির চিহ্ন যদি জানা থাকে, তাহা হইলে সেই চিহ্ন ধরিয়া পুনরায় বাড়ি পৌঁছিতে পারি। চিহ্ন জানা না থাকিলে হারান জিনিষের কিনারা করা কঠিন। তুমি গৃহস্থ, তোমার হয় ত একখানি থালা চোরে লইয়া গিয়াছে। পুলিষ হয় ত সেই বামালশুদ্ধ চোরকে আদালতে হাজির করিল। বিচারক তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ জিনিষটি কি তোমার? সেই জিনিষটীর কোন চিহ্ন যদি তোমার না জানা থাকে, তবে

তুমি কেমন করিয়া শপথ করিয়া বলিতে পার, সেই জিনিষটি তোমার। সুতরাং হারান জিনিষের চিহ্ন জানা চাই। ক্ষুদ্র একটি শিশু খেলা করিবার জন্য বাড়ির বাহির হইয়াছে। খেলা ধুলা সাঙ্গ করিয়া সে বাড়ি ফিরিয়া যাইতে চায়। কিন্তু সহরের গলি ঘুঁজিতে পড়িয়া সে বাড়ির রাস্তা ভুলিয়া গিয়াছে। মা-হারা বাড়িহারা শিশু রাস্তায় রাস্তায় কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল। রাস্তার লোকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার বাড়ির কিছু চিহ্ন মনে আছে কি? তাহা হইলে তোমাকে বাড়ি লইয়া যাইতে পারি। অবোধ শিশুর অত কি মনে থাকিতে পারে? সে কাঁদিয়া বলিল, তাহার বাড়িতে দরজা আছে। আমরাও ঐ অবোধ বালকের ন্যায় অজ্ঞানভ্রান্ত জীব। সংসার-নগরীতে খেলা করিতে আসিয়া বিষম গলি ঘুঁজিতে পড়িয়া বাড়ির রাস্তা ভুলিয়া গিয়াছি। মা-হারা শিশুর ন্যায় এ অকূল প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। কেবল বাড়ির স্থূল চিহ্নটি আমাদের জানা আছে। সে চিহ্ন এই—

যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।

"যেখানে গেলে আর ফিরিতে হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম"।

সংসারের গোলোকধাঁধায় পড়িয়া পথভ্রান্ত জীব আমরা বাড়ি ফিরিয়া যাইতে চাই। আমাদের ক্রন্দন কোলাহল শুনিয়া পথের ধারে নানা প্রকৃতির ও নানা সম্প্রদায়ের লোক একত্রিত হইয়া বলিতেছে আমাদের সহিত আইস, তোমাদিগকে বাড়ি লইয়া যাইব। কিন্তু ইহারা সকলেই ইহাদের নিজ বাড়িতেই আমাদিগকে লইয়া যাইতে চান, তথায় গেলে আমরা শান্তি

পাইব কেন? আমাদের নিজ বাড়িতেই আমরা যাইতে চাই। যেখানে আমাদের স্বজন বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় কুটুম্ব ভাই ভগিনীগণ অবস্থিতি করিতেছেন, তাহাই আমাদের নিজ বাড়ি। আমরা তাঁহারই চরণে শরণ চাই, যিনি আমাদিগকে নিজ বাড়িতে লইয়া যাইবেন। মহাত্মা গৌরাঙ্গদেব যখন অল্পবয়স্ক শিশু, তখন তিনি পথের ধারে এক দিন খেলা করিতেছিলেন। তাঁহার গায়ে বহুমূল্য অনেক অলঙ্কার দেখিয়া এক দুষ্ট তস্করের লোভ জন্মিল। তস্কর গৌরকে বলিল, আইস তোমায় কোলে করিয়া বাড়ি পৌঁছাইয়া দি। এই বলিয়া চোর গৌরকে কোলে করিয়া অলঙ্কারগুলি কাড়িয়া লইবার জন্য নিজের অভিমত স্থানে চলিল। কিন্তু বিধাতার বিচিত্র লীলা কে বুঝিবে, চোর নিজের বাড়িতে পৌঁছিতে না পারিয়া গৌরাঙ্গ-দেবের বাড়িতেই উপস্থিত হইল। আজ তস্করের তীব্র প্রতি-কূলতা ভেদ করিয়া যে শক্তি—গৌরাঙ্গদেবের যে জীবমনো-মোহিনী দিব্যবিভূতি মহাপ্রভুকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিল, আমরা সেই মহীয়সী শক্তির অভয় আশ্রয় অবলম্বন করিতে চাই। সে শক্তিকে বাহিরে অন্বেষণ করিতে হইবে না। আমাদের ভিতরেই তাহা আছে। আমরা বাড়ির পথ চিনি না। দুর্নিবার্য্য কুহকিনী মায়া আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়া আমাদের যথাসর্ব্বস্ব ধন লুঠিয়া লইতে চায়। ঘোর অন্ধকারে জলন্ত দীপের ন্যায় অবিদ্যার এ অন্ধতমসাচ্ছন্ন দুর্দ্দিনে যে শক্তি আমাদের নিগূঢ় মার্গের সূচনা করিয়া দিবেন, আমরা তাঁহার কথা না শুনিয়া তাঁহার দিকে না তাকাইয়া আর কাহার কাছে ভরসা করিব? আমাদিগকে সর্ব্বদা সচেতন করিবার জন্য সে

অন্তঃশক্তি অবিরত যে ধ্বনি করিতেছেন, বাহিরের তুমুল কলরবে তাহা আমরা শুনিতে পাই না। আমাদের বাহিরের ইন্দ্রিয়গ্রাম যখন স্তম্ভিত হইয়া যাইবে, বাহিরের সমস্ত আড়ম্বর যখন নিস্তব্ধ হইয়া আসিবে, বাহিরের বৃত্তিসমূহ যখন অন্তর্ম্মুখীন্ হইতে পারিবে, তখনই ভিতরের কথা শুনিতে পাইব। বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে যখন মৃত হইয়া যাইব, তখনই সে অন্তর্দ্দেবতার অন্তর্ধ্বনি শুনিতে পাইব। আমরা বাহিরের ব্যাপার লইয়া যখন নিতান্তই বিমুগ্ধ হইয়া পড়ি, বাহিরের কোলাহল-স্তূপে ডুবিয়া যখন আত্মহারা হইয়া যাই, তখন সে অন্তর্দ্দেবতা বাহিরের দেবতা হইযা—মহাপুরুষরূপে অবতীর্ণ হইয়া বজ্র-ভৈরব-নিনাদে আমাদিগকে আহ্বান্ করেন। তাই যখন ন্যায়শাস্ত্রের ব্যর্থ বাগ্‌বিতণ্ডারূপ বাহ্য-নিনাদে বঙ্গদেশ বধির হইয়া উঠিয়াছিল, তখন ভক্তির অবতার গৌরাঙ্গদেব অবতীর্ণ হইয়া বজ্রগম্ভীর নিনাদে জগৎকে ডাকিয়া বাহিরের শব্দস্তূপ ভেদ করিয়া ভিতরের কথা হরিধ্বনি শুনাইয়াছিলেন। তিনি ভিতরের কথা বাহিরে আনিয়া ভিতর বাহির এক করিয়া বাহ্য ব্যাপার-লোলুপ সমাজকে অন্তর্দৃষ্টিশীল করিয়াছিলেন। যাহারা অবিশ্বাসী, তাহারা মহাপুরুষের আহ্বানে কর্ণপাত করে না। আমরা অবিশ্বাসী জীব, আমাদের হৃদয় অভিমানে ভরা। তবে কি আমাদের গতি নাই? তাহা কি কখনও হইতে পারে? দয়াময়ের রাজ্যে অগতিরও গতি আছে। অধিকারানুসারে শাস্ত্রে সকল মার্গই বিহিত হইয়াছে। গতিহীন নিম্নাধিকারীর পক্ষে তীর্থাটনাদির ব্যবস্থা হইয়াছে। যাঁহারা তাঁহার এই তীর্থাদিরূপ সদাব্রতের ভিখারী নহেন, যাঁহারা পরিশ্রম করিয়া স্বাদু অন্ন

পাক করিতে চাহেন, তাঁহাদের জন্য জ্ঞান যোগাদির পথ উন্মুক্ত আছে। আমরা জ্ঞান যোগ কর্ম্ম, ভক্তি, এ সমস্তের কাহাকেও উপেক্ষা করিব না। এ সমস্তের মধ্যে পরস্পর কিছুমাত্র বিরোধ নাই। সম্পূর্ণ সদ্ভাব আছে। পার্থিব জগতে যাহাকে বাড়ি বলিয়া বুঝি, তথায় আমাদের ভাই ভগিনীগণ, যেমন নাচিয়া কুঁদিয়া খেলিয়া বেড়ায়, সেই-রূপ জ্ঞান যোগ ভক্তি আদি ভাই ভগিনীগণ যে গৃহে পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া বেড়াইতেছে, পরস্পর প্রীতির হাঁসি হাঁসিয়া যে গৃহ আলো করিতেছে, তাহাই আমাদের **নিজ নিকেতন**। নিজ দেশের পরিচিত লোক ধ্রুবাদি যে গৃহ-প্রাঙ্গণে নৃত্য করিতেছেন তাহাই আমাদের "নিজ নিকেতন"। প্রাণের ভাই প্রহ্লাদ যেখানে প্রেমে বিভোর হইয়া ক্রীড়া করিতে-ছেন, বিশ্ববন্ধু দেবর্ষি নারদ যে গৃহে বীণাতন্ত্রীতে সুর ধরিয়া গান করিতেছেন, শুক সনক সনন্দ যেখানে হৃষ্ট হৃদয়ে বসিয়া আছেন, বশিষ্ঠ বাল্মিকী ব্যাসাদি যেখানে যে গৃহের গুপ্ত ভাণ্ডারের রত্নরাশি গভীর ধ্যানে মজিয়া দর্শন করিতেছেন, সেই আমাদের নিজ নিকেতন। নিজ নিকেতনে যাইতে হইলে আমরা জগতের মুখাপেক্ষা করিব না। ভয়াকীর্ণ বাহ্য জগৎকে মনের কথা প্রাণের কথা খুলিয়া বলিতে বড় ভয় হয়। সুতরাং সে দিকে তাকাইব না। নিজ নিকেতনের যাত্রী মহাত্মা রামপ্রসাদ যাঁহার অঞ্চল ধরিয়া আব্দার করিয়া বলিয়াছিলেন—

> মা! আমার খেলেনা হ'ল,
>
> বেলা গেল, সন্ধ্যা হল, আমায় নিয়ে ঘরে চল।

সেই জগন্মাতার করুণাকটাক্ষের দিকে তাকাইয়া আসুন

বলি মা! জীবনের সন্ধ্যা সম্মুখে উপস্থিত। দিন ফুরাইয়া আসিল। নিদারুণ কাল নিশি বিষম বিষধরীর ন্যায় গ্রাস করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে। মা! এ অধম দীন সন্তানকে কোলে তুলিয়া লও। এই পথহারা অবোধ ছেলেকে হাত ধরিয়া নিজ নিকেতনে লইয়া চল। মা! তুমি মহিষমর্দ্দিনী হইয়া মহিষাসুরের উদ্ধার করিয়াছ, মা এত দয়া তোমার! পশু ও অসুরও তাহার অধিকারী হইয়াছে। দুঃখী দীন আমরা, মা দুস্তারিণি! একবার অনাথ দেখিয়া নিরাশ্রয় দেখিয়া মা হইয়া কাছে এসো! একবার অঞ্চলে অশ্রু মুছাইয়া দয়া করিয়া পথ দেখাইয়া তোমার—আমার নিজ নিকতনে লইয়া চল। ধ্রুব প্রহ্লাদাদি তোমার সন্তানগণ জগতে ভক্ত হইয়া লীলা করিতে আসিয়াছিলেন, আর আমাদের মত অভক্ত সন্তানগণ কুপথগামী হইয়া বড় যাতনা পাইতেছে মা! মা লীলাময়ি! সকলই তেমার লীলা, তোমার ও অনন্ত লীলা তুমিই বুঝ, আর কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। মা! আর বুঝিতে চাহিনা, আর খেলা করিতে চাহি না; মা লইয়া চল, ঘরে গিয়া তোমার কোলে ঘুমাইয়া পড়ি, চিরসুখে যোগনিদ্রায় মা যোগেশ্বরি! বিশ্রাম করি।

আঁধারের মাণিক।

প্রকৃতির গুহ্য তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিবার জন্য মনুষ্যজগৎ অবিরত ব্যস্ত। প্রকৃতির অনন্ত গর্ভের—অসীম ভাণ্ডারের প্রতি স্তর প্রতি পট উন্মোচন করিবার জন্য মানবজাতি সর্ব্বদা চেষ্টাপরায়ণ। প্রকৃতিকে পূর্ণরূপে অধিকার করিবার জন্য প্রকৃতির অন্তর্নিহিত রত্নরাজি সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিবার জন্য মনুষ্যজীবনে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম চলিতেছে। কিন্তু প্রকৃতির সম্পূর্ণ তত্ত্বকথা তিনিই বুঝিতে পারেন, যিনি প্রকৃতির উপাসক। যিনি প্রকৃতির ভাষা বুঝিতে পারেন, প্রকৃতি যাঁহার সহিত কথা কহেন, প্রকৃতির গভীর সাগরে যিনি নিমগ্ন—প্রকৃতির মরম মাঝারে যিনি ডুবিয়াছেন তিনিই প্রকৃতি-তত্ত্বজ্ঞ হইতে পারেন। প্রকৃতির সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাঁহারই কাছে উদ্ভাসিত হয়, যাঁহার সহিত প্রকৃতির পূর্ণ পরিচয় জন্মিয়াছে।

প্রাকৃতিক প্রত্যেক পদার্থেরই দুইটি পৃষ্ঠ আছে। সম্মুখ ও পশ্চাৎ, বাম ও দক্ষিণ, আলো ও অন্ধকার এই দুইটি পৃষ্ঠ বিহীন কোন পদার্থই নাই। যিনি প্রকৃতির অপরিচিত, তিনি প্রকৃতির এই উভয় পৃষ্ঠ দেখিতে পাইবেন কিরূপে? প্রকৃতির বিরাট বিশাল কলেবরের পূর্ণ স্বরূপকে তিনিই জ্ঞানের আয়ত্ত করিয়াছেন, যিনি প্রকৃতিগর্ভে বিলীন হইতে পারিয়াছেন।

প্রকৃতির গুহ্য কথা জানিবার জন্য যিনি প্রকৃতিরাজ্যের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনি ত আর ফিরিবেন না, সুতরাং প্রকৃতির ঘরের কথা বলিবার লোক এ জগতে নাই। প্রকৃতির অনেক কথা শুনিবার অনেক বিষয় দেখিবার আছে। যাহা সম্মুখে দেখিতে পাই, ইহা প্রকৃতির পূর্ণ চিত্র নহে। ইহা প্রকৃতির একটি পৃষ্ঠ। প্রকৃতির অন্য পৃষ্ঠ শত সহস্র আবরণের মধ্যে অবগুণ্ঠিত। শত সহস্র ব্যবধানের ভিতর দিয়া প্রকৃতির যে আভা ফুটিয়া বাহির হয়, আমরা তাহাই অনুভব করি। প্রকৃতির প্রকৃত স্বরূপ—নিরাবরণ অনবগুণ্ঠিত মূর্ত্তি আমরা কখনই উপভোগ করিতে পাই না। আমরা যাহা দেখিতে পাই, তাহা প্রতিবিম্ব মাত্র আব্ছায়া মাত্র। স্বরূপ তাহার বহুদূরে। স্বরূপ উপভোগ করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। পৃথিবীর জীব প্রকৃতির স্বরূপ পরিপাক করিবার অধিকারী নহে। প্রকৃতির স্বরূপ দেখিতে গেলে পার্থিব চক্ষু ঝল্সিয়া যায়, স্পর্শ করিতে গেলে ত্বক্শক্তি ভস্মীভূত হইয়া যায়, পঞ্চেন্দ্রিয় সে স্বরূপের কাছে স্তম্ভিত হইয়া যায়। তাই পার্থিব জীবের পক্ষে কেবল প্রকৃতির বিরূপেরই ব্যবস্থা।

সূর্য্য কিরণের স্বরূপ যাহা, তাহা কে জানে? কেই বা তাহার তাপ সহ্য করিতে পারে? আকাশ ও পৃথিবীর কত লক্ষ লক্ষ পর্দ্দা ভেদ করিয়া সূর্য্যরশ্মি এ জগতে আসিয়া পড়ে। অসংখ্য ব্যবধানের ভিতর দিয়া আসে বলিয়াই সূর্য্যতাপ আমাদের স্পর্শোপযোগী হইয়াছে। সূর্য্যরশ্মির স্বরূপ শত সহস্র ব্যবধান স্পর্শে শীতল হইয়া—বিরূপ হইয়া আমাদের কাছে আসে, তাই তাহা অনুভব করিতে পারি। যদি অব্যবধানে

সূর্য্যের খাঁটি তেজ—শুদ্ধ স্বরূপ পৃথিবীতে পড়িত, তাহা হইলে পৃথিবী তাহা ধারণ করিতে পারিত না। পৃথিবী ভস্মীভূত হইয়া কোথায় উড়িয়া যাইত। সৃষ্টি ছারখার হইত। সুতরাং প্রকৃতির শুদ্ধ মূর্ত্তি পৃথিবী সহ্য করিতে পারে না। প্রকৃতির বিরূপ লইয়াই তাহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। গোমুখী হইতে পূতসলিলা ভাগীরথী নিঃসৃত হইয়াছেন। কত খালবিল কত নদ নদীর সহিত মিলিত হইয়া কত বিকারগ্রস্ত হইয়া ভাগী-রথী আমাদের সম্মুখে আসিয়াছেন। গোমুখীর বারিধারা যেমন নির্ম্মল পবিত্র, এই নদনীর জল-মিশ্রিত গঙ্গার জল তেমন পবিত্র তেমন নির্ম্মল নহে। অথচ এই গঙ্গার জলকেই ব্যব-হার করিতে পাইয়া আমরা সন্তুষ্ট আছি। বিশুদ্ধ খাঁটি গঙ্গার জল কৈ আমাদের অদৃষ্টে ঘটে? সুতরাং প্রকৃতির স্বরূপের ধার দিয়াও আমরা যাইতে পারি না। বালক যেমন চাঁদ ধরিবার আশায় দৌড়িয়া যায়, সেইরূপ প্রকৃতিকে ধরিব বলিয়া আমরা দৌড়িয়া যাই। আকাশের চাঁদ যেমন আকাশেই থাকিয়া যায়, সেইরূপ প্রকৃতিও চিরদিনই আমাদের অধিকার-পথের বাহিরে থাকিয়া যান। সুতরাং প্রকৃতিতত্ত্বের একটি ক্ষুদ্র তৃণ কণিকাও সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার।

প্রকৃতির স্বরূপ-তেজ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পৃথিবী ধারণ করিতে পারে না, তাই শত ব্যবধানের ভিতর দিয়া প্রকৃতির রশ্মিরেখা এ জগতে যাহা আসিয়া পড়ে, তাহাই পার্থিব জীবের পক্ষে যথেষ্ট। ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে নিঃসৃত হইয়া পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা যে তেজে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন, সে তেজ কি

পৃথিবী ধারণ করিতে পারে? সে তীব্র তেজোময়ী প্রবাহধারা ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতি প্রথমে মাথায় পাতিয়া লইয়াছিলেন। তবে সে প্রশমিত বেগ পৃথিবী সহ্য করিতে পারিয়াছিল। সুতরাং অনন্ত উৎস-উৎসারিণী প্রকৃতির প্রস্রবণ ব্যবধানের ভিতর দিয়াই এ জগতে প্রবাহিত হইয়া পড়ে। ব্যবধানের ভিতর দিয়াই আমরা প্রকৃতিকে দেখিতে পাই। অগ্নির যে তাপ স্পর্শ দ্বারা আমরা অনুভব করি, তাহা অগ্নির বিশুদ্ধ তৈজস মূর্ত্তি নহে। বায়ুর সম্পর্কে শীতল হইয়া আগ্নেয় তাপ আমাদের অনুভবের গোচরীভূত হয়। সুতরাং অগ্নির বিশুদ্ধ তৈজস মূর্ত্তি কি, তাহা আমাদের জানিবার যো নাই। অগ্নিতাপের ডিগ্রী আমরা বুঝিতে পারি, কিন্তু মাত্রা বুঝিবার সাধ্য নাই। এইরূপ জলের খাঁটি জলত্বও আমরা অনুভব করিতে পারি না। পৃথিবীর খাঁটি পৃথিবীত্বও আমাদের উপভোগে আসে না। কেননা ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম ইহারা সকলেই পঞ্চীকৃত। পঞ্চভূতের সংমিশ্রণে পরস্পর সংমিশ্রিত। সুতরাং খাঁটি জিনিষ উপভোগ করিবার অদৃষ্ট আমাদের নাই। প্রকৃতির স্বরূপ বুঝিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। ব্যবধানের ভিতর দিয়া প্রকৃতির যে মূর্ত্তি দেখিতে পাই, তাহা ত আব্ছায়া—প্রতিবিম্ব মাত্র। প্রতিবিম্ব দেখিয়া বিম্বের স্বরূপ কি সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারা যায়? নকল দেখিয়া আসলের প্রকৃতি কি চেনা যায়? ফটোগ্রাফে কাহারও হয়ত চম্‌কান ধরণের ফঠো উঠিল, কাহারও হাঁসিমাখা মুখখানির চিত্র উঠিল। কিন্তু তাহাই কি তাহার সার্ব্বদিক্ স্বরূপ? আচার বিকৃত ফটোগ্রাফে যে প্রতিমূর্ত্তি উঠে, তাহাও বিকার-

গ্রস্ত হয়। সুতরাং প্রতিকৃতি দেখিয়া প্রকৃতি চিনিবার উপায় নাই। অবিদ্যার ফটোগ্রাফে প্রকৃতির এই যে জাগতিক প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে, ইহা অজ্ঞানবিকার-কলঙ্কিত, সুতরাং এ প্রতিচ্ছায়া দেখিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানময়ী প্রকৃতির স্বরূপ তত্ত্ব অবগত হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। প্রকৃতির ছায়া লইয়াই আমরা বিমোহিত। প্রকৃতির কায়ার সংস্পর্শ করিবার অধিকার আমাদের নাই।

প্রকৃতির বিচিত্র মূর্ত্তি। এই অনন্ত অপরিসীম মূর্ত্তিকে পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে হইলে আমাদের ইন্দ্রিয়গণকে তদুপ-যোগী করিয়া লইতে হইবে। যে বৃত্তি দ্বারা কোন বস্তু তত্ত্ব বুঝিতে চাই, সেই বৃত্তিরূপ যন্ত্রটি পরিপুষ্ট না হইলে পদার্থের প্রকৃত তত্ত্ব স্থিরীকৃত হইবে না। কিন্তু আমরা সেদিকে তাকাই না। আমাদের বৃত্তিরূপ যন্ত্রতন্ত্রের ভালরূপ সম্বল না থাকিলেও বড় বড় সিদ্ধান্তে অগ্রে গিয়া হাত দিই। জলে কীটাণু আছে কি না বুঝিতে হইলে যেমন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের প্রয়োজন, সেইরূপ প্রাকৃতিক তত্ত্ব যথার্থরূপে বুঝিতে হইলে পরিপুষ্ট চিন্তাশক্তির প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক যন্ত্র যে কথা ঠিক করিয়া বলিয়া দেয়, তাহার যেমন নড়ন চড়ন হয় না, ভুল ভ্রান্তি হয় না, সেইরূপ পরিপুষ্ট চিন্তাশক্তি যাহা নির্ণয় করিবে, তাহাতে আর পরিবর্ত্তন হয় না, ভুল ভ্রান্তির লেশ মাত্র তাহাতে থাকে না। তাদৃশ পরিপুষ্ট চিন্তাশক্তি না জন্মিলে, অপরিপুষ্ট পরিবর্ত্তনশীল বুদ্ধি লইয়া প্রাকৃতিক তত্ত্বের উন্মেষ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। পরিবর্ত্তনশীল বুদ্ধির উপর প্রাকৃতিক তত্ত্বের সিদ্ধান্তভিত্তি স্থাপন করা আর বালুকাস্তূপের উপর

প্রকাণ্ড কারুকার্য্যখচিত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা একই কথা। এই যে আজকাল পাশ্চাত্য দেশে জ্যোতিস্তত্ত্ব সম্বন্ধে কত মত প্রকাশিত হইতেছে, সে সমস্তই এক রকম আন্দাজি। তাহাকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলিতে পারা যায় না। কেননা অদ্য যাহা যাহা স্থিরীকৃত হইবে, কল্য তাহার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। ইউরোপে বর্ত্তমান বর্ষে যে মতের আধিপত্য চলিতেছে, আগামী বর্ষে হয় ত তাহা কোথায় উড়িয়া যাইবে। এইরূপ অনবরত পরিবর্ত্তনশীল মত লইয়া মূর্খের চক্ষে ধাঁদা দেওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে প্রকৃত পদার্থতত্ত্ব কিছুই নিরূপিত হয় না। বুদ্ধির খেলায় লোককে গোলোকধাঁদায় ফেলিতে পারা যায় বটে; কিন্তু তাহাতে সত্যের কিনারা কত দূর হয়, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। লোককে এবং নিজের মনকে কোন রূপে বুঝাইতে পারিলেই যে সেই বুঝান জিনিষটা পূর্ণ সত্য হইয়া দাঁড়াইবে, এমন নিশ্চিত কথা কোন দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক শপথ করিয়া বলিতে পারেন না। আজি যে মত ঠিক বলিয়া প্রচারিত হইল, কল্যই যদি তাহা বেঠিক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তবে মানবের পরিবর্ত্তনশীল বুদ্ধির উপর কেমন করিয়া বিশ্বাস করা যায়? পূর্ব্বে মত ছিল, চন্দ্র একটা গ্রহ পদার্থ, এখন কিন্তু সে মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এখন উপ-গ্রহের মধ্যেই চন্দ্রকে ফেলা হইয়াছে। তখন মত ছিল, চন্দ্র আলোকবিশিষ্ট, এখন কিন্তু প্রতিপন্ন হইয়াছে, চন্দ্র নিজে আলোকশূন্য, তবে যে চন্দ্রের আলোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সূর্য্যের কাছ হইতে ধার করা। এখনকার এই মতই যে ঠিক, তাহা কে বলিল? হয় ত এ মতও দিন কতক বাদে

উড়িয়া যাইতে পারে। সুতরাং এ মত যে ধ্রুব সত্য, তাহা কেহ স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারেন না। তবে উক্তরূপ মত-বাদীরা মূর্খ লোককে বুঝাইতে পারেন;আমাদের এই মত যে ঠিক, তাহা তুমি যখন প্রমাণিত করিতে পার না, সুতরাং ইহা ঠিক বৈ কি? এইখানে গোপাল ভাঁড়ের সম্বন্ধে একটা গল্প মনে হইতেছে। কোন সময় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি নবাবের হুকুম আসিল যে পৃথিবীর কোন্ খান্টা ঠিক মধ্য স্থান, তাহা এক মাসের মধ্যে তাঁহার সভাসদ্ পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা ঠিক করিয়া দিতে হইবে। কৃষ্ণচন্দ্র নবাবের এই খাম খেয়ালি অদ্ভূত হুকুম পাইয়া চিন্তিত হইলেন। বড় বড় পণ্ডিতকে উক্ত বিষয়ের একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিতে নিযুক্ত করিলেন। পণ্ডিতগণ বিষম বিভ্রাটে পড়িলেন। পৃথিবীর মধ্যস্থল ঠিক করিতে হইলে সমগ্র পৃথিবী ঘুরিতে হইবে। সমগ্র পৃথিবী ঘুরিয়াও মধ্যস্থল ঠিক করা বড় সোজা কথা নহে। আর একমাসের ভিতরেই বা কেমন করিয়া সমগ্র পৃথিবীটা ঘুরিয়া আসা যায়? পণ্ডিতগণ কিছুই কূল কিনারা করিতে পারিলেন না। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বিষম চিন্তাকুল হইয়া উঠিলেন। রাজাকে চিন্তায় ম্রিয়মাণ দেখিয়া এক দিন গোপাল ভাঁড় ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা সমস্ত কথাই বলিলেন। গোপাল ভাঁড় তাহা শুনিয়া হাঁসিয়া বলিলেন, এই সামান্য বিষয়ের জন্য আপনার এত দুর্ভাবনা কেন? এ কথাটা এত দিন আমাকে খুলিয়া বলেন নাই কেন? আপনাকে আর চিন্তা করিতে হইবে না। আমি পৃথিবীর মধ্যস্থান ঠিক করিয়া দিব। রাজা গোপাল ভাঁড়কে বিশ্বাস করিতেন। সুতরাং আর

দ্বিরুক্তি না করিয়া গোপাল ভাঁড়কেই ঐ বিষয়ের ভার দিলেন। গোপাল ভাঁড় এক মাসের মধ্যেই পৃথিবী ঘুরিয়া মধ্যস্থান ঠিক করিবেন এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া রাজার কাছ হইতে ছুটি লইয়া চলিয়া গেলেন। গোপাল ভাঁড় নিজ গ্রামের কিয়দ্দূরবর্ত্তী একটা জঙ্গলের ভিতর একটা খুঁটা গাড়িয়া আসিলেন। বাড়ি আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। এক মাস বাদে রাজার কাছে গিয়া সংবাদ দিলেন মধ্যস্থান ঠিক করা হইয়াছে। রাজা নবাবকে মধ্যস্থান দেখাইবার জন্ত আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। রাজা ও নবাব পাত্র মিত্র সমভি-ব্যাহারে গোপাল ভাঁড়ের সহিত নির্দ্দিষ্ট স্থান দেখিতে চলিলেন। গোপাল ভাঁড় সেই জঙ্গলের কাছে গিয়া বলিলেন, ঐ যে খুঁটাটি যে স্থানে পোঁতা রহিয়াছে, উহাই পৃথিবীর ঠিক মধ্য-স্থল। নবাব ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, এত দেশ থাকিতে তোমার এই বাড়ির কাছেই পৃথিবীর মধ্যস্থল হইল? ইহা কখনই সম্ভব নয়। তোমার মত মিথ্যাবাদীকে আমি বিশেষরূপে শাস্তি দিব। গোপাল ভাঁড় বলিলেন আজ্ঞে না; আমি মিথ্যা কথা বলিতেছি না। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, আপনি লোক দ্বারা পৃথিবীর চারি ধার মাপিয়া দেখিতে পারেন, উহা ঠিক মধ্যস্থান কি না। নবাব বিষম বিপদে পড়িলেন। গোপাল ভাঁড়ের কথা মিথ্যা প্রমাণ করিতে হইলে পৃথিবীর চারি ধার মাপিতে হয়। তাহা ত অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং অগত্যা গোপাল ভাঁড়ের কথা তাঁহাকে মানিতে হইল। নবাব অপ্রস্তুত হইয়া চলিয়া গেলেন।

আজ কালকার যাঁহারা প্রকৃতিতত্বজ্ঞ চিন্তাশীল বলিয়া

পরিচিত, তাঁহারা ঐ রূপ গোপাল ভাঁড়ের মত জগৎকে চাতুরীর জালে জড়াইতে চাহেন। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন, চন্দ্র এত হাজার যোজন বিস্তৃত। তুমি যদি আপত্তি কর ইহা, কেমন করিয়া হইল, তাঁহারা হয় ত বলিবেন, "আমাদের কথায় বিশ্বাস না হয়, চন্দ্রমণ্ডলটা মাপিয়া দেখিতে পার"। কাজেই তাঁহাদের এই কথায় হার মানিতে হয়। চন্দ্রে আলোক আছে কি না এ সম্বন্ধে আপত্তি করিলে তাঁহারা হয় ত বলিবেন, আমরা যে সিদ্ধান্ত করিয়াছি, তাহা যতক্ষণ না তুমি খণ্ডন করিয়া বেঠিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিতেছ, ততক্ষণ ইহা তোমাকে ঠিক বলিয়া মানিতেই হইবে। তাঁহাদের এই ভীষণ আস্পর্দ্ধার তীব্র ভৎর্সনায় ভীত হইয়া মূর্খ জগৎ তাঁহাদের কথা শিরোধার্য্য করিতে বাধ্য হইতেছে, তাঁহাদের কথা ধ্রুব সত্য ভাবিয়া সেই পথের পথিক হইতেছে। কিন্তু তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন, তাহা যে অকাট্য, তাহাই যে স্থির সিদ্ধান্ত, তাহা কেমন করিয়া স্বীকার করিব? কেননা পূর্ব্বেই বলিয়াছি অপরিপুষ্ট মনুষ্যচিন্তা চিরদিনই পরিবর্ত্তনশীল।

সুতরাং প্রাকৃতিক তত্ত্ব বড়ই দুরবগাহ ব্যাপার। প্রাকৃতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা কিছু মীমাংসা হইয়াছে, সমস্তই অসম্পূর্ণ। আজ যে অন্ধকার ও আলোকের কথা বলিব ইহাও প্রাকৃতিক-তত্ত্বের এক জটিল সমস্যা।

জগতের জীব অন্ধকারকে ভাল বাসে না। অন্ধকারের বীভৎস মূর্ত্তি সকলেই ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। আলোকের দিব্যদ্যুতি দেখিবার জন্যই প্রত্যেক জীব লালায়িত। সগর্ব্ব পদাঘাতে সকলেই অন্ধকারকে জগৎ হইতে বিদায় দিতে চায়।

তাই দার্শনিক দর্শনাস্ত্রে অন্ধকারের অস্তিত্বের মূল পর্য্যন্ত উৎখাত করিতে চান। নব্য দার্শনিক বলিয়া থাকেন, অন্ধকার বলিয়া কোন একটা জিনিষ নাই। আলোক না থাকিলেই যখন অন্ধকারের উৎপত্তি, তখন আলোকের অভাব ছাড়া অন্ধকার আর কিছুই নহে। কিন্তু অন্ধকার বলিয়া যদি একটা জিনিষ না থাকিত, তাহা হইলে অন্ধকার এই কথাটির সৃষ্টি হইল কেমন করিয়া? বিষয় না থাকিলে তাহার ভাষার উৎপত্তি হয় কেমন করিয়া? বাচ্য না থাকিলে বাচকের সৃষ্টি হয় কেমন করিয়া। আলোকের অভাবই অন্ধকার এ সিদ্ধান্ত বজায় রখিতে হইলে, অন্ধকারের পূর্ব্বে আলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। অগ্রে আলোক বিদ্যমান থাকিলে তবে তাহার অভাব অন্ধকার এই কথা সঙ্গত হয়। আলোক বলিয়া কোন জিনিষ যদি অগ্রে প্রসিদ্ধ থাকে, তবে কাহার অভাব অন্ধকার হইবে? সৃষ্টির প্রাক্কালে জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল, ইহা আর্য্যশাস্ত্র ও ইংরাজি শাস্ত্র বাইবেলেরও মত। বেদ বলিতেছেন—

তদানীং তম আসীৎ
তমসঃ গূঢ় প্রকেতম্।

বাইবেলও বলিতেছেন—

"Darkness ruled the face of the universe and God said let there be light and there was light."

সুতরাং সে সময়ে আলোকের নাম গন্ধও জগতে ছিল না। তেমন অবস্থায় আলোক বলিয়া যখন একটা জিনিষ প্রসিদ্ধই নাই, তখন কাহার অভাব অন্ধকার হইবে? যে নিজে অসিদ্ধ সে অপরকে সিদ্ধ করিতে পারে না। সৃষ্টির প্রাক্কালে

আলোক যখন স্বয়ং অসিদ্ধ, তখন সে নিজের অভাবরূপে অন্ধকারকে সিদ্ধ করিবে কেমন করিয়া? অন্ধকারই জগতের স্বভাব, আলোক বিকৃতি মাত্র। কেননা সৃষ্টির পূর্ব্বে অন্ধকার রাজত্ব করিত, সৃষ্টির পরেও অন্ধকারই রাজত্ব করিবে, কেবল এই পূর্ব্ব ও পর সময়ের সন্ধিস্থলে কিছুদিনের জন্য আলোকের লীলা খেলা। সুতরাং অন্ধকারই ব্যাপক পদার্থ। সৃষ্টির পূর্ব্বে যাহা অনাদি কাল হইতে স্থিত, এবং সৃষ্টির পরে যাহা অনন্ত কাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে, সেই অনাদি অনন্ত পদার্থ অন্ধকার হইল কি না অসৎ আর যে আলোক সৃষ্টিকালের কিয়ৎক্ষণ স্থায়ী, সেই আদি অন্ত বিশিষ্ট ক্ষণবিধ্বংসী আলোক হইল কি না প্রকৃত সৎ পদার্থ ইহা নিতান্তই অন্যায় কথা। অন্ধকারের গর্ভ হইতেই জগৎ নিঃসৃত হইয়াছে, অন্ধকারের কুক্ষিতেই জগৎ বিলীন হইবে, বর্ত্তমানেও জগৎ একবারে অন্ধকারবিবর্জ্জিত নহে। সুতরাং ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই ত্রিকালব্যাপী অন্ধকারের তুলনায় আলোক নিতান্তই ক্ষুদ্র পদার্থ। অন্ধকারের বিরাট বিশাল বিশ্বব্যাপী কলেবরের সম্মুখে আলোকের ক্ষুদ্র মূর্ত্তি নিতান্তই নগণ্য। সুতরাং এত বড় অন্ধকার কিছুই নয় বলিয়া ভুয়া জিনিষ বলিয়া উপেক্ষার জিনিষ নহে।

এখন অন্ধকার-তত্ত্ব একটু বিচার করিয়া দেখা যাউক। অন্ধকার জিনিষটি কি তাহা বুঝা বড় শক্ত। অন্ধকার শব্দের কেহ কেহ ব্যুৎপত্তিগত এইরূপ অর্থ করেন "অন্ধং করোতীতি অন্ধকারঃ" অর্থাৎ যাহা জীবকে অন্ধ করে, তাহাই অন্ধকার। যাহাতে দৃষ্টিশক্তির প্রতিরোধ করে, তাহাই অন্ধকার। ইহাই

যদি অন্ধকার শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হয়, তাহা হইলে আলোকও অন্ধকার হইয়া দাঁড়ায়। খানিক ক্ষণ সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া থাকিলে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিও অন্ধের মত হইয়া যান। তিনি তখন চক্ষে আর কিছুই দেখিতে পান না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত অন্ধকারের অর্থানুসারে সূর্য্যালোককেও অন্ধকারের ভিতর ফেলিতে হয়। আবার তোমার পক্ষে যাহা অন্ধকার, অপরের পক্ষে হয় ত তাহা আলোক। তুমি মানুষ, অন্ধকারে তুমি কিছুই দেখিতে পাও না, কিন্তু এইজন্য তুমি অন্ধকারকে দৃষ্টিশক্তির—প্রকাশ শক্তির বাধক বলিয়া স্থির করিয়াছ কেন? তুমি যে অন্ধকারে অন্ধ হইয়া থাক, বাদুড়ের পক্ষে সেই অন্ধকারই উজ্জ্বল আলোক। তোমার পক্ষে যে অন্ধকার একটা বিকট পদার্থ, বাদুড়ের চক্ষে তাহাই কিন্তু পরম সুন্দর। আবার যে দিবালোকে তুমি দেখিতে পাও, সেই দিবালোকই বাদুড়ের পক্ষে ঘোর অন্ধকার। সুতরাং অন্ধকার যে নিতান্তই একটা জঘন্য পদার্থ, তাহা কেহ শপথ করিয়া বলিতে পারেন না। অন্ধকারের একটা সর্ব্ববাদিসম্মত লক্ষণ স্থির করা বড়ই কঠিন। তুমি যাহাতে কিছুই দেখিতে পাও না, তোমাকে যাহা অন্ধ করে, তাহাই যদি অন্ধকার হয়, তাহা হইলে অনেক প্রকারের আলোককেই অন্ধকারের দলে মিশাইয়া ফেলিতে হয়। যাঁহারা কেরচিন তৈলের দীপালোক সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহারা সরিষার তৈলের দীপালোকে প্রায়ই কিছুই দেখিতে পান না। সুতরাং সরিষার তৈলের দীপালোক তাঁহাদের পক্ষে অন্ধকার। যাঁহারা short sighted, একটু দূরের পদার্থ যাঁহারা কিছুই দেখিতে পান না, দূরত্ব তাঁহাদের পক্ষে অন্ধকার।

সুতরাং বিচার করিয়া দেখিলে অন্ধকারের ক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়া উঠে। তুমি যে রাত্রির অন্ধকারকেই অন্ধকার বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছ, তাহা ঠিক নহে। যুক্তির অস্ত্রে ব্যবচ্ছেদ করিলে দেখিতে পাই, তোমার ঐ সঙ্কীর্ণ গণ্ডী পার হইয়া অন্ধকার জগদ্ব্যাপক মূর্ত্তিতে ভাসমান। যাহা যাহার যে ইন্দ্রিয়ের আবরণ-কারক, তাহাই তাহার পক্ষে অন্ধকার ইহাই যদি অন্ধকারের সর্ব্ববাদিসম্মত লক্ষণ হয়, তাহা হইলে দেখিতে পাই জগতের সর্ব্বত্রই অন্ধকার। অন্ধকারের এই সার্ব্বভৌম ক্ষেত্রে দাঁড়াইলে জগৎকে অন্ধকাররাশিপরিপূরিত বলিয়া বোধ হয়। জগতে যেন অন্ধকার বই আর কথা নাই। অন্ধকারের গভীর গর্ভে জগৎ যেন ডুবিয়া রহিয়াছে। চক্ষুর' পক্ষে যেমন অন্ধকার, অন্যান্য বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয়ের পক্ষেও সেইরূপ অন্ধকার জগৎকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। আজ কৃষকের পক্ষে দর্শন শাস্ত্র যেমন অন্ধকার, সেইরূপ দার্শনিকের পক্ষেও কৃষিবিদ্যা অন্ধকার। কবিরাজের পক্ষে জ্যোতির্বিদ্যা যেমন অন্ধকার, জ্যোতিস্তত্ত্বজ্ঞের পক্ষে কবিরাজি বিদ্যা সেইরূপ সমান অন্ধকার। সুতরাং অন্ধকার নাই কোথায়? অন্ধকারের প্রখর তরঙ্গ চারিদিকে প্রবাহিত হইতেছে। অসীম গগন তল বহিয়া দিগ্দিগন্ত প্লাবিত করিয়া অন্ধকার যেন অনন্তধারায় ঢেউ খেলিয়া চলিয়াছে। অন্ধকারের নিবিড় কালিমাস্তূপে জগৎ যেন ধ্যানমগ্ন যোগীর ন্যায় নিঝুম ভাবে সমাহিত হইয়া রহিয়াছে। অন্ধকারসমুদ্রের বিরাট বক্ষে জগৎ যেন বুদ্‌বুদের ন্যায় ভাসিতেছে। এই বিশ্বব্যাপী অন্ধকারের করাল গ্রাস হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য জীব জগৎ অবিরত ব্যস্ত। এই ভীষণ কাল বিভাবরী রূপ

বিষধরীর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সকলেই ব্যাকুল। কিন্তু এ মজ্জাগত অস্থিমর্ম্মগত অন্ধকারের কিছুই কুলকিনারা হইয়া উঠিতেছে না।

বর্ত্তমান উনবিংশ শতাব্দীতে সভ্যজাতি অন্ধকার হইতে আলোকে যাইতে চান। অন্ধকারের কুৎসিত মূর্ত্তি পরিহার করিয়া আলোকের জ্বলন্ত ছটা আলিঙ্গন করিতে চান। কিন্তু অগ্নির আলোক ছাড়া অন্ধকার বিদূরিত করিবার আর কি কোন উপায় নাই? অন্ধকার পরিত্যাগ করিবার জন্য অগ্নিময় আলোকের ব্যবস্থা কেন? অগ্নিময়ী দীপশিখায় গৃহের অন্ধকার বিদূরিত হয় বটে, কিন্তু তাহাতে যে সন্তাপ আরও বাড়িয়া উঠে। অগ্নির উগ্রতেজে প্রাণ মন যে বিকল হইয়া উঠে। অশান্তি অন্ধকারে পীড়িত হইয়া শান্তির ভিখারি হইয়া যাহার চরণে শরণ লইলাম, তাহাতে যদি অশান্তির তীব্র তাপ আরও বাড়িয়া উঠে তবে তাহা লইয়া কি করিব? পতঙ্গ অগ্ন্যালোকে উৎফুল্ল হইয়া তাহাতে যেমন ঝাঁপ দিয়া পড়ে, সেইরূপ উনবিংশ শতাব্দী আলোকে লম্ফ দিয়া পড়িতে চায় কেন? পুড়িয়া মরিবার জন্য নাকি?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি অন্ধকারের বিকট মূর্ত্তি সকলেই ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিতে চায়, আলোকের শুভ্র সুন্দর মনোমোহন ছবি দেখিবার জন্য জগতের জীব লালায়িত। অন্ধকারের রাজত্বে কেহই বাস করিতে চায় না, সকলেই আলোকের সাম্রাজ্যের ভিখারি। অন্ধকারের জীর্ণ কঙ্কালময় আস্তরণ উঠাইয়া দিয়া আলোকের সুবর্ণ সিংহাসন তথায় সকলেই বিছাইতে চায়। অন্ধকার যেন মরণের কোষাগার, আলোক

যেন জীবনের অমৃতভাণ্ডার, অন্ধকার যেন শবরাশির শ্মশান শয্যা, আলোক যেন প্রাণনশক্তির অফুরন্ত প্রস্রবণ। অন্ধকার যেন ভূত প্রেত পিশাচের লীলাস্থল, আলোক যেন সাধু মাহাত্মা দেবতার বিরামক্ষেত্র। অন্ধকার যেন গাঢ় ঘন গভীর অরণ্যাণী, আলোক যেন অমরাবতীর পারিজাত সহস্র সমাকীর্ণ নন্দন কানন। অন্ধকার ও আলোকের এইরূপই চিত্র জগতে অঙ্কিত হইয়াছে। পূতিগন্ধ পরিপূরিত কৃমিকীটের কিলিবিলিময় সহস্র রৌরব নরকের সার সর্ব্বস্ব অন্ধকারে আরোপিত হইয়াছে, আর স্বর্গের পুঞ্জীকৃত সৌন্দর্য্যের অনন্তধারায় আলোককে বিভূষিত করা হইয়াছে। বীভৎস রসের বোঝা মাথায় লইয়া অন্ধকার জগতের কাছে নিন্দিত—ঘৃণিত পদদলিত হইয়া মরমের অভি-শাপবাণী ঘোষণা করিতেছে। অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া সহানুভূতির একবিন্দু অশ্রুজল নিক্ষেপ করিবার লোক এজগতে কেহ আছে কি না জানি না, আমরা কিন্তু অন্ধকারকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিতে পারি না। অন্ধকার আলোক অপেক্ষা এতই তুচ্ছ এতই জঘন্য ইহা মনে করিতে পারি না। একটু বিচার করিলে দেখিতে পাই অন্ধকারই এক প্রকার আলোকের জন্মদাতা। অন্ধকারের ক্রোড়ে যে দিব্যালোক শক্তির বিকাশ হয়, তাহাতে অন্ধকারকে সকলের বরণীয় বলিয়াই মনে হয়। শ্রোতৃগণের মধ্যে অনেকেই হয় ত দেখিয়াছেন রাত্রির ঘোর অন্ধকারে খানিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিলে চক্ষুর সম্মুখে দপ্ দপ্ করিয়া এক রকম ফস্ ফরস্ জ্বলিতে থাকে। এই তৈজস আলোক শক্তির জন্মদাতা অন্ধকার বই আর ত কেহই নহে। সৃষ্টির পূর্ব্বে অন্ধকারই প্রথমে বিদ্যমান, তাহারই কুক্ষিভেদ

করিয়া আলোক নিঃসৃত হইয়াছে, সুতরাং অন্ধকার জননী স্বরূপ, আলোক তাহার ক্রোড়ে লালিত পালিত শিশু। অন্ধকারের মাহাত্ম্য আমরা বুঝি না, তাই তাহাকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া থাকি। যাঁহারা এই অন্ধকারের মর্ম্ম বুঝিতেন, সেই আর্য্য ঋষি অন্ধকারকে সাধনা রাজ্যের প্রধান সহায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তন্ত্রশাস্ত্রে অমাবাস্যার ঘোর অন্ধকারে শবসাধনাদির প্রক্রিয়া বিহিত হইয়াছে। অমাবাস্যার ঘোর অন্ধকারের সূক্ষ্মশক্তি অবলম্বন করিয়া পিতৃগণ শ্রাদ্ধপ্রত্যাশায় আবির্ভূত হইয়া থাকেন, ইহাও শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। যথা বায়ুপুরাণে—

অমাবাস্যাদিনে প্রাপ্তে গৃহদ্বারং সমাশ্রিতাঃ।
বায়ুভূতাঃ প্রবাঞ্ছন্তি শ্রাদ্ধং পিতৃগণা নৃণাম্॥

সুতরাং যে অন্ধকার সাধনা-শক্তি বিস্ফুরণের প্রধানতম সহায়, দৈবালোকশক্তির যাহা আধার, তাহাকে আমরা ঘৃণা করি কেমন করিয়া? যোগী যখন চক্ষু মুদিত করিয়া ধ্যানমগ্ন হয়েন, তখন তাঁহার চারিদিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলেও সেই অন্ধকারস্তূপের মধ্যেই তিনি পরম জ্যোতিঃ দেখিতে পান। গভীর গিরিগুহান্ধকারেই আর্য্য ঋষিগণ তমোপহারী অপূর্ব্ব চন্দ্রমার বিমল জ্যোৎস্নাচ্ছটায় এক দিন অবগাহন করিয়াছিলেন। সুতরাং যে অন্ধকার সাধনা শক্তির উন্মেষক—পবিত্র দৈবশক্তির প্রস্রবণ, তাহাকে নিতান্তই জঘন্যতার চিত্রে চিত্রিত করা উচিত নহে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি অন্ধকারের সার্ব্বভৌম ক্ষেত্রে দাঁড়াইলে বুঝিতে হয়, অন্ধকার বিশ্বব্যাপী। ভিতরে বাহিরে ওত প্রোত

ভাবে অন্ধকার বিদ্যমান। এই বিরাট অন্ধকারকে বিদূরিত করিতে হইলে বিরাট আলোক ধারার আয়োজন করিতে হইবে। এই বিশ্বব্যাপী অগ্নির আলোকময়ী জ্বালামালায় অন্ধকার নিবৃত্ত হইতে পারিবে বটে, কিন্তু তাহাতে শরীর শীতল হওয়া দূরে থাকুক তীব্র তাপে আরও সন্তাপিত হইয়া উঠিবে যে। জ্ঞানাগ্নির জ্বলন্ত শিখায় অন্ধকার না হয় ঘুচিয়া যাউক, কিন্তু মনঃপ্রাণ যদি তাহাতে গরম হইয়া উঠে, তাহার তীব্র তাপ চিরবেদনাগ্রস্ত আত্মা সহ্য করিতে না পারিয়া যদি আরও সন্তাপিত হইয়া উঠে, তবে তেমন আলোক লইয়া আমাদের প্রয়োজন কি? যাহারা স্নিগ্ধ অথচ সমুজ্জ্বল শান্ত অথচ দীপ্তিময় মাধুরীর ধারায় চিরদিনের আঁধার ঘুচিয়া গিয়া মনঃপ্রাণ সুশীতল হয়, ত্রিতাপতপ্ত আত্মা চিরদিনের জন্য জুড়াইয়া যায়, সেই আঁধারের মাণিক আমরা চাই। আমরা প্রখর সূর্য্যকিরণের ভিখারী নহি, যাঁহার অমল ধবল কিরণচ্ছটায় হৃদয়গুহা ভাসিয়া অমৃতের বন্যা বহিয়া যায়, সেই অন্তর্গগন তলের মোহন পূর্ণ চন্দ্রমা যদি আসিয়া উদিত হন, তবেই ত আত্ম-চকোর তাঁহার প্রেমপীযূষপানে শান্ত হইয়া চিরদিনের জন্য কৃতকৃতার্থ হইতে পারে। তবেই ত অশান্তির অগ্নিশিখা চিরদিনের জন্য নির্ব্বাণ হইতে পারে।

এ গভীর অন্ধকারপূর্ণ জীবনে আঁধারের মাণিকই আমাদের লক্ষ্য। ঐ সাতরাজার ধন মাণিককে প্রাপ্ত হইলে আর কোন ধনেরই আকাঙ্ক্ষা থাকে না। এক শ্রেণীর সর্প আছে, তাহার মাথায় মাণিক যখন প্রজ্বলিত হয়, যখন তাহার দিগন্তবিভাসী প্রভারাশি স্ফুরিত হয়, তখন সেই প্রভার আকর্ষণী শক্তির

সাহায্যে সর্প পোকা মাকড় কীট পতঙ্গাদি ধরিয়া খায়, কিন্তু ইহাতে মাণিকের অপমান করা হয়। আর এক শ্রেণীর সর্প আছে, তাহার মাথায় মাণিক যখন প্রজ্বলিত হয়, তখন সেই মাণিকের প্রভায় মুগ্ধ হইয়া নড়ন চড়ন বিহীন হইয়া সে নিস্তব্ধ হইয়া থাকে। আপনার ভাবে আপনি ডুবিয়া আপনার রসে আপনি মজিয়া সে নিঝুম হইয়া থাকে। ইহারাই মাণিকের মূল্য বুঝে। যে মাণিকের জগদ্ভুলান উজ্জ্বল ছটায় নিমগ্ন হইয়া নিথর নিস্পন্দভাবে বিমুগ্ধ হইয়া থাকিতে হয়, যে মাণিক প্রাপ্ত হইলে আর কিছু পাইবার বস্তু অবশিষ্ট থাকে না, আর কিছু কামনার বস্তু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সেই মাণিককে প্রাপ্ত হইয়া তাহার দ্বারা আবার অন্য বস্তু পাইবার ইচ্ছা নিতান্তই নিন্দনীয়। যাঁহারা একমাত্র লক্ষ্য মাণিককে প্রাপ্ত হইয়াই কৃতকৃতার্থ হইয়া যান, মাণিককে অন্য বস্তু পাইবার উপায় মনে করেন না, তাঁহারাই মাণিকের মর্ম্ম বুঝেন। যাঁহারা ভগবচ্চরণপ্রাপ্তিকে নির্ব্বাণাদি সুখের উপায় মনে করিয়া অগ্রসর হন, তাঁহাদের হাতেই মাণিকের অবমাননা—লাঞ্ছন হইয়া থাকে। প্রকৃত ভক্ত অর্জ্জুনের লক্ষ্য ভেদের ন্যায় একমাত্র মাণিকের দিকেই নিশ্চল স্থিরতর দৃষ্টি রাখিয়া তত্ত্ব-পথে ধাবিত হইয়া থাকেন। প্রকৃত প্রেমিক নির্ব্বাণ সুখের আশা করেন না, জীবন্মুক্তির পিপাসা তাঁহার নাই, চতুর্ব্বর্গের কোন ফলেরই তিনি প্রার্থী নহেন, তিনি কেবল তাঁহার চরণ দুখানির ভিখারি।

জহুরি ভিন্ন হীরকের মর্ম্ম অন্যে কি বুঝিতে পারে? বান্দরে কি মুক্তামালার মূল্য বুঝিতে পারে? বিষ্ঠার কীট কি পরমান্নের

রস অনুভব করিতে পারে? নরকের কীট কি স্বর্গীয় সুধার আস্বাদ লইতে পারে? সেইরূপ আনাড়ি—অভক্ত—অপ্রেমিক কি মাণিক চিনিতে পারে? তাই একজন কবি বলিয়াছেন—

"যে জন প্রেমের ঘাট চিনে না,
প্রেমে ডুবতে গিয়ে দুটি নয়ন থাকতে নয়ন মুদে হয় রে কানা।
কাঠুরেতে মাণিক পেলে দোকানেতে দেয় গো ফেলে,
কাল পাথর বলে।
অভিমানে মাণিক প'ড়ে রে বলে মহাজনে টের পেলে না।"

সামান্য দোকানদারের হাতে যদি মাণিক পড়ে ত, সে মাণিক চাউল ওজন করিবার বাটখারা হয়, কিন্তু মহাজনের হাতে পড়িলে তিনি তাহাকে গুপ্ত কোষে কত যত্নে কত আগ্রহে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। নীরব নির্জ্জনে বসিয়া বিরলে সে গুপ্তনিধির মাধুরী ধারা পানে তিনি বিভোর হইয়া থাকেন। মণিবিশিষ্ট নিশ্চল ফণীর ন্যায় তিনি অগাধ ভাব-গম্ভীর হইয়া অচঞ্চল সমুদ্রের ন্যায় স্থির ধীর হইয়া যান। মাণিকের দিব্য-দ্যুতি তরঙ্গে প্রাণ মন ভাসাইয়া তিনি আত্মহারা হইয়া যান, অঞ্চলের নিধি বুকের ধনকে বুকে রাখিয়া তিনি কৃতকৃতার্থ হইয়া যান।

ত্রিবলয়াকৃতি সর্পসদৃশ কুলকুণ্ডলিনীর মস্তকোপরি মাণিক (ব্রহ্মানন্দ) অবিরত সমুল্লসিত হইতেছে। ইহা সাত রাজার ধন। কেননা মূলাধারাদি ষট্‌চক্র ও সহস্রারপদ্মে আধিপত্য লাভ করিয়া ঐ মাণিককে প্রাপ্ত হইতে হয়। সুতরাং সে ত কঠোর সাধনার কথা। এ সাপের মাথা হইতে মাণিক আমরা লইতে পারিব না। কেননা আমাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্য, ক্ষুদ্র প্রাণ,

ক্ষুদ্র পরমায়ু। দিগন্তব্যাপী ঘোর অন্ধকারে যদি মাণিক স্বয়-মেব আবির্ভূত হইয়া দেখা দেন, তবেই ত আমাদের ভিতর ও বাহিরের সমস্ত আঁধারই ঘুচিয়া যাইতে পারে। আমাদের গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন জীর্ণ কুটিরে লুকান রতন যদি জাগ্রত হইয়া উঠেন তবেই ত আমাদের আশা মিটিতে পারে, চির অন্ধকারা-চ্ছন্ন গৃহ উজিয়ারা হইতে পারে। আমরা আঁধারের মাণিককে বুকে করিয়া রাখিতে চাই, তাঁহার দ্বারা আর অন্য কোন কার্য্য করিতে চাই না। হৃদয়ের ধনকে হৃদয়ে রাখিয়া আমরা জুড়াইতে চাই। প্রাণের সামগ্রীকে প্রেমের হার পরাইয়া প্রীতি পুষ্পাঞ্জলি উপহার দিয়া গোপনে অপূর্ব্ব মাধুরী নিরীক্ষণ করিব। জগতের কেহ দেখিবে না, জগতের কেহ শুনিবে না, নিভৃত নির্জ্জন কক্ষে সে সুধার আস্বাদ লইব, ইহাই আমাদের বাসনা।

পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি, অন্ধকার তুচ্ছ পদার্থ নহে, ঘৃণার জিনিষ নহে, অনেক সময় অন্ধকার সাধনার সম্বল। জীবের ঘোর অন্ধকারেই আঁধারের মাণিক দেখা দিয়া থাকেন। অন্ধ কারই তাঁহার বিদ্যুদ্‌বিভা আকর্ষণ করিয়া আনে। আধিব্যাধি-ময় সংসারের জ্বালাযন্ত্রণায় নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকারে জীব যখন ব্যাকুল হইয়া তাঁহার দিকে চায়, তখন সেই দুর্দ্দিন-অমানিশির সূক্ষ্মশক্তি অবলম্বন করিয়া আঁধারের মাণিক অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। কি জানি আঁধারের সহিত মাণিকের কি গুপ্ত সম্বন্ধ, আঁধার হইলেই তিনি দৌড়িয়া আসেন। অন্ধকারের অভ্যন্তরেই তাঁহার বিমল জ্যোতি বিকশিত হয়। তাই যখন কংসের ভীষণ কারাগারে দেবকী ও বসুদেব ঘোর অন্ধকারে

ডুবিয়াছিলেন, সেই অন্ধকারস্তূপ বিদীর্ণ করিয়া আঁধারের মাণিক উদ্‌ভূত হইয়াছিলেন। সে মাণিককে প্রাপ্ত হইয়া দেবকী ও বসুদেবের জন্ম জন্মান্তরের আঁধার ঘুচিয়া গিয়াছিল। প্রহ্লাদ যখন পিতার আজ্ঞায় বিষপান করিতে বসিয়া চারিদিক্ অন্ধকার দেখিয়াছিলেন, তখন বালগোপাল মূর্ত্তিতে আঁধারের মাণিক দেখা দিয়াছিলেন। সুতরাং যে অন্ধকার প্রভুর উজ্জ্বল সত্তাকে প্রস্ফুটিত করে, জগতের চক্ষে তাহা ঘৃণিত হউক, আমরা সেই অন্ধকারে ডুবিতে চাই। আসুন সকলে মিলিয়া প্রার্থনা করি, প্রভো! অন্ধকারসাগরে আমাদিগকে নিমগ্ন করিয়া দাও। সেই গাঢ় ঘন গম্ভীর অন্ধকারে আঁধারের মাণিক হইয়া তুমি দেখা দাও! তোমার শতবিদ্যুৎমাখান শতচন্দ্র-নিংড়ান সুধামাখা মুখখানি লইয়া একবার দেখা দাও! নাথ! তোমাকে কেমন করিয়া ডাকিতে হয় জানি না। চন্দ্র সূর্য্যকে যেমন না ডাকিলেও তাহারা আসে, সেইরূপ আসিয়া হৃদয়কন্দর উদ্ভাসিত কর! এ দীন দুঃখীর অন্ধকারাচ্ছন্ন ভগ্ন মন্দিরে গুপ্ত নীলকান্তমণিরূপে একবার উদিত হও। দুঃখী জীব চরিতার্থ হইয়া যাউক, তাহার চিরদিনের আঁধার ঘুচিয়া যাউক।

ভিখারির সম্পত্তি।

দীন, দুঃখী ভিখারী জগতে এক কোণে পড়িয়া থাকে, তাহার দিকে কেহ তাকায় না। দুঃখীর কথা লইয়া জগতে কেহ আলোচনা করে না। যাঁহারা মহান্, যাঁহারা ধনী, যাঁহারা বড় লোক বলিয়া খ্যাত, তাঁহাদের কথাই সকলে চর্চ্চা করিয়া থাকে। আমরা নিজে দুঃখী, তাই আজ দুঃখীর কথাই বলিব। আজ দেখিব দুঃখী ভিখারীর কিছু সম্পত্তি আছে কিনা। আজ দেখিব, ভিখারি হইয়া ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে পারা যায় কিনা? ভিখারি জগতের কাছে উপেক্ষিত পদদলিত হউক, কিন্তু ভিখারির যে সম্পত্তি, যে ধন আছে, সে ধনে ধনী হইতে পারিলে ত্রিভুবনের ধনরাশিকে তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইবে। অনেকে মনে করিতে পারেন, ভিখারির আবার সম্পত্তি কি? যে চিরভিক্ষুক, তাহার আবার ঐশ্বর্য্য কি? আমি কিন্তু বলি, যে চিরভিক্ষুক, তাহারই ঐশ্বর্য্য যথেষ্ট আছে। এক দিন দয়ালু আকবর নিজ মন্ত্রী বীরবলকে বলিলেন, দেখ, বীরবল! আমি এক শত মোহর একজন দুঃখীকে দান করিতে চাই। তুমি প্রকৃত দুঃখী বাছিয়া এই এক শত মোহর দান করিয়া আইস। বীরবল মোহর লইয়া দুঃখী অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; দেখিলেন পথের ধারে একজন ভিক্ষুক দুই একটি পয়সার জন্য ভিক্ষা চাহিতেছে। তিনি তাহাকেই দুঃখী ভাবিয়া দানের উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া একশত মোহর তাহাকে

দিলেন। তিনি ভাবিলেন, এই বার দুঃখীর দুঃখ ঘুচিয়া গেল ফিরিয়া আসিয়া আকবরকে বলিলেন, দুঃখীকে দান দেওয়া হইয়াছে। আকবর বীরবলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহাকে দান করিয়াছ, বীরবল উত্তর করিলেন, একজন চিরভিক্ষুককে। আকবর হাসিয়া বলিলেন, আমি যে দুঃখীকে দান করিতে বলিয়াছিলাম; ভিক্ষুক ত দুঃখী নহে। যে চিরভিক্ষুক, ভিক্ষা যাহার ব্যবসা, তাহার আবার দুঃখ কিসের? আমার দান তুমি ফিরাইয়া লইয়া আইস। বীরবল একটু বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন, ভিক্ষুকের কাছে গিয়া দেখেন, ভিক্ষুক আবার পূর্ব্বের মতই এক আধটি পয়সার জন্য ভিক্ষা করিতেছে। তিনি ভিক্ষুককে বলিলেন, আমার সেই একশত মোহর তুমি ফিরাইয়া দাও।

ভিক্ষুক। কেন, একবার দান করিয়া আবার ফিরাইয়া লইতে চাও কেন?

বীরবল। সম্রাটের আজ্ঞা, দুঃখীকে দান করিতে হইবে, তিনি বলিলেন, ভিক্ষুক দুঃখী নহে। সুতরাং আমার মোহর ফিরাইয়া দাও।

ভিক্ষুক। যদি নিতান্তই ফিরাইয়া লইতে চাও ত নাও। এই সিন্ধুকের চাবি লইয়া যাও। সিন্ধুক খুলিয়া বামদিকে যে তোড়াটি দেখিবে, তাহাই তোমার প্রদত্ত, তাহাই উঠাইয়া লইও।

বীরবল চমকিত—বিস্মিত হইয়া বলিলেন, বামদিকের তোড়া ছাড়া আবার দক্ষিণ দিকেও তোড়া আছে না কি? ভিক্ষুক হাঁসিয়া বলিল, তুমি কি মনে কর তোমার তোড়াটিই আমার একমাত্র সম্বল। আমার সিন্ধুক খুলিয়া তুমি দেখিতে

পাইবে, তোমার তোড়ার মত কত সহস্র তোড়া সিন্ধুকে পড়িয়া রহিয়াছে।

বীরবল। এত টাকা তোমার কেমন করিয়া হইল?

ভিক্ষুক। ভিক্ষা করিয়াই এত টাকা উপার্জ্জন করিয়াছি।

বীরবল। এত অগাধ টাকা তোমার, তথাপি তোমার দুঃখ ঘুচে না কেন? পুনরায় ভিক্ষায় বসিয়াছ কেন?

ভিক্ষুক। টাকা আমার যথেষ্ট আছে, তাহার জন্য দুঃখ নাই, দুঃখ এই যে আমার আকাঙ্ক্ষা মিটে না।

বীরবল তখন বুঝিলেন, জগতে প্রকৃত দুঃখী কে।

সুতরাং ভিখারির সম্পত্তির অভাব নাই। যে চিরভিখারি, তাহার ঐশ্বর্য্যের ত্রুটি নাই, কিন্তু চিরভিক্ষুকের দুঃখ এই যে আকাঙ্ক্ষা মিটে না। যিনি একবার মাত্র ভিক্ষার মত ভিক্ষা করিতে পারেন, তাঁহারই সকল দুঃখ ছুটিয়া যায়, সকল জ্বালা যন্ত্রণা মিটিয়া যায়, ত্রিতাপানল শান্ত হইয়া যায়, কিন্তু তেমন ভিক্ষা করিতে পারিলে তবে ত। সুতরাং যিনি একবার মাত্র ভিখারি, তিনি দুঃখী নহেন, যিনি চিরভিখারি, তিনিই চির-দুঃখী।

জগতে ভিখারি নয় কে? যাহার অভাব আছে, সেই ভিখারি। তৃণ হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলেই ভিখারি। একজন অপরের কাছে চাহিতেছে, সে হয় ত আবার অন্যের কাছে চাহিয়া থাকে। নির্ধন, ধনীর কাছে চাহিতেছে, ধনী আবার হয় ত অপরের কাছে প্রার্থনা করিয়া থাকে। এ জগৎ প্রার্থকপুঞ্জে পরিপূর্ণ। প্রার্থনার তুমুল কলরবে জগৎ অবিরত প্রতিশব্দিত। একজন ভিক্ষুক কোন সম্রাটের কাছে

কিছু ভিক্ষা করিতে যায়। ভিক্ষা করিতে গিয়া শুনিল, সম্রাট্ দেব-মন্দিরে আছেন। তথায় গিয়া দেখে, সম্রাট্ করযোড়ে দেবতার কাছে কি প্রার্থনা করিতেছেন। সম্রাট্‌কেও প্রার্থনা করিতে দেখিয়া ভিক্ষুকের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। সম্রাটের কাছে আর তাহার ভিক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকিল না। তাহার সে বৃত্তি উড়িয়া গেল। সে ফিরিয়া চলিয়া যায়, এমন সময় সম্রাটের দৃষ্টি তাহার দিকে পতিত হইল, সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি নিমিত্তই বা আমার কাছে আসিয়াছিলে, আবার কেনই বা চলিয়া যাইতেছ? ভিক্ষুক বলিল, রাজন্! আপনার কাছে কিছু ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিলাম। কিন্তু ভিক্ষা করা আর হইল না। পূর্ব্বে জানিতাম, আপনার কাছেই ভিক্ষা করিতে হয়, আপনি কাহারও কাছে ভিক্ষা করেন না। কিন্তু এই মাত্র দেখিলাম, আপনিও দণ্ডবৎ হইয়া দেবতার কাছে কি ভিক্ষা করিতেছিলেন। এখন বুঝিয়াছি, কাহার কাছে ভিক্ষা করিতে হয়। তাই ফিরিয়া যাইতেছি। ঐ যাচকের ভাষায় আমরাও বলিতে চাই, ভিখারি! যদি ভিক্ষা করিতেই হয়, তবে তাঁহার কাছে ভিক্ষা চাও, যাঁহার দ্বারদেশে সম্রাট্ পর্য্যন্ত ভিখারি। ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া তাঁহারই কাছে দাঁড়াও যাঁহার চরণতলে রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তীও প্রার্থকের বেশে দণ্ডায়মান।

বুঝিলাম জগতের প্রত্যেকেই ভিক্ষুক। জগতের জীব আকাঙ্ক্ষা বাসনা লইয়া অবিরত বিব্রত। এ আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই, সীমা নাই, কূল নাই, কিনারা নাই, এ অকূল এ অনন্ত আকাঙ্ক্ষার পাথার দিয়া জীব জগৎ কোথায় যেন ভাসিয়া

যাইতেছে। অনন্ত আকাশে মেঘমালা বায়ুবেগে বিচালিত হইয়া যেমন কোথায় উড়িয়া যায়, সেইরূপ এই আকাঙ্ক্ষা-বায়ুর অনুপ্রেরণে প্রেরিত হইয়া এ জীব জগৎ কোথায় যেন উড়িয়া যাইতেছে। অনন্ত সাগর-বক্ষে বুদ্‌বুদ্‌ রাশি তরঙ্গাবেগে ভাসিতে ভাসিতে যেমন কোথায় চলিয়া যায়, সেইরূপ এই আকাঙ্ক্ষা তরঙ্গের ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত হইয়া এ জীব জগৎ কোন্‌ কেন্দ্রস্থলের দিকে যাইতেছে, তাহা কে জানে কে বলিতে পারে? আকাঙ্ক্ষার একটা পরিধি নাই, একটা গণ্ডি রেখা নাই, এই পর্য্যন্ত আকাঙ্ক্ষার মত জিনিষ প্রাপ্ত হইলে আর চাহিতে হইবে না, এমন একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম আকাঙ্ক্ষারাজ্যে বিধিবদ্ধ নাই। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

> নিস্বো বষ্টি শতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপঃ।
> লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশ্বরত্বং পুনঃ।
> চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং সুরপতি র্ব্রহ্মাস্পদং বাঞ্ছতি,
> ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং পুনঃ পুনরহো আশাবধিং কো গতঃ।

যে নিতান্ত নির্ধন, সে বাঞ্ছা করে, এক শত টাকা হইলেই তাহার যথেষ্ট, আবার যাই তাহার এক শত টাকা হয়, তখন তাহার ইচ্ছা হয়, এক হাজার টাকা হইলে ভাল হয়। এক হাজার টাকা হইলে আবার লক্ষপতি হইতে ইচ্ছা হয়। লক্ষপতির আবার পৃথিবীপতি অর্থাৎ রাজা হইতে সাধ যায়। রাজা চক্রেশ্বর হইতে চাহেন, চক্রেশ্বর আবার ইন্দ্রপদ চান, ইন্দ্র ব্রহ্মপদ, ব্রহ্মা বিষ্ণুপদ চান। সুতরাং এইরূপ পুনঃপুনঃ আশা আকাঙ্ক্ষার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতে থাকে। অতএব আশার পর পারে কেহ যাইতে পারে না। সুতরাং আশা আকাঙ্ক্ষা

অনন্ত। প্রত্যেক জীবেরই আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন ভিন্ন। যে নিরন্ন, সে অন্ন চায়, যাহার অন্নের সংস্থান আছে, সে হয় ত স্ত্রীর গহনার জন্য স্বর্ণ চায়, যাহার গৃহে ধনধান্য দুইই আছে; সে হয় ত রাজা রায় বাহাদুর খেতাব চায়। সুতরাং চায় সকলেই—অভাবগ্রস্ত সকলেই। জগতের সকলেই ভিক্ষুকশ্রেণীর লোক, ভিক্ষার কেবল তারতম্য হয় মাত্র।

যাহার যতটুকু জ্ঞান, তাহার ভিক্ষা ততটুকু। মনুষ্যের জ্ঞানদৃষ্টি যতদূর ধাবিত হয়, আকাঙ্ক্ষা ততদূরই যাইতে পারে। সুতরাং জ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যেই আকাঙ্ক্ষা ঘুরিয়া থাকে। যিনি অল্পজ্ঞ, তাঁহার আকাঙ্ক্ষা অল্প বিষয়েই পর্য্যবসিত। যিনি বহুজ্ঞ, তাঁহার আকাঙ্ক্ষা তদপেক্ষা বিস্তৃত। শাস্ত্রগ্রন্থ আকাঙ্ক্ষাকেই দুঃখের হেতু—বন্ধনের কারণ বলিয়া পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু যে আকাঙ্ক্ষার বিশাল কলেবর, যে আকাঙ্ক্ষা পার্থিব বিষয়ের অতীত রাজ্যে লইয়া যায়, শাস্ত্র সে আকাঙ্ক্ষার গুণ গানই করিয়াছেন। যদি আকাঙ্ক্ষাই করিতে হইল, তবে ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা কেন? আকাঙ্ক্ষাকে বড় করিয়া লও না কেন? একটা গল্প মনে হইতেছে। একজন ভারবাহক মোট লইয়া প্রচণ্ড রৌদ্রে চলিয়া যাইতেছিল, রাস্তার উত্তপ্ত ধূলায় তাহার পা ঝল্‌সিয়া যাইতে লাগিল, এমন সময় তাহার মনে কল্পনার উদয় হইল "ভগবান্ যদি কখনও আমাকে রাজা করেন ত, রাস্তায় বনাত বিছাইয়া মোট লইয়া চলিয়া যাইব।" তাহার ক্ষুদ্র মন, ক্ষুদ্র জ্ঞান, তাই তাহার আকাঙ্ক্ষাও ক্ষুদ্র। তাই তাহার রাজত্বসুখের কল্পনা নিতান্তই নীচ। তাই বলিতেছি, আকাঙ্ক্ষা যখন করিতেই হইবে, তখন তাহাকে

ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতর আবদ্ধ না রাখিয়া অনন্তের দরবারে লইয়া যাইতে হইবে। নীচতা হইতে উচ্চতার দিকে লইয়া যাইতে হইবে। একজন সাধু নগরীর পথ ধরিয়া যাইতেছিলেন, তিনি দেখিলেন একটা লোক ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে এক বেশ্যার পানে তাকাইয়া রহিয়াছে। তিনি তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, দেখ বাপু! যদি ঊর্দ্ধে তাকাইতেই হইল, তবে উহা অপেক্ষা আরও একটু ঊর্দ্ধে তাকাও না কেন? সাধুর ভাষায় বলিতে হয় যদি ভিক্ষা করিতেই হইল, তবে ক্ষুদ্র ভিক্ষা কেন? ভার-বাহকের রাজত্ব-সুখের কল্পনার ন্যায় তোমার আমার ক্ষুদ্র ভিক্ষা কি নিতান্তই হাস্যাস্পদ নহে? দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া লও, জ্ঞান চক্ষু উচ্চতার দিকে বিস্ফারিত করিয়া দাও, তোমার ভিক্ষার ভিত্তিভূমি সুবিশাল হইয়া আসিবে। প্রতিপদের চন্দ্র-কলা পূর্ণ কলায় বিকসিত হইলেই গগন তল শোভায় ভাসিয়া যায়, দিগ্‌দিগন্ত মাধুরীর ধারায় আপ্লাবিত হইয়া যায়, সেইরূপ জীবের ভিক্ষা বৃত্তি ষোলকলায় পরিস্ফুট হইয়া যখন পূর্ণ মূর্ত্তিতে পূর্ণ স্বরূপের সুচারু চরণ চুম্বন করিবে, তখনই চিদাকাশ বহিয়া বিমল কৌমুদীচ্ছটা উদ্গীরিত হইবে, অপূর্ব্ব রশ্মিপুঞ্জে ত্রিজগৎ ছাইয়া যাইবে।

আমরা সকলেই ভিখারি। ভিক্ষাই আমাদের ব্যবসা। কি ধনী কি নির্ধন, কি মহান্ কি ক্ষুদ্র, কি মূর্খ কি পণ্ডিত, কি রাজা মহারাজা, কি দীনহীন পথের কাঙ্গাল সকলেই ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লইয়া জগতের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছে। কেহ বা ধনীর দ্বারে, কেহ বা সম্মানের দ্বারে, কেহ বা বাইজির পদতলে আপনার আপনার মনোমত ভিক্ষা চাহিয়া লইতেছে।

অভাবের চিতানল জগতের প্রত্যেক জীবের মর্ম্মদেশে ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। পিপাসা মিটে না, তৃষ্ণা ছুটে না, অবিরত অতৃপ্তির দাবদাহে জীবের মর্ম্মগ্রন্থি জ্বলিয়া যাইতেছে। জগতের যে দিকে তাকাই, সেই দিকেই দেখিতে পাই, ভিক্ষার তুমুল কল্লোল ভুবন ভরিয়া আকাশ ভেদিয়া উত্থিত হইতেছে। জগৎ ভিক্ষুকের মহামেলা। ভিক্ষার গান ভিক্ষার তান ভিক্ষার বাদ্যযন্ত্র লইয়াই জীব ইতস্তত ছুটাছুটি করিতেছে। ভিক্ষা বৃত্তি আমাদের স্বাভাবিক। যতদিন মন আমাদের বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন ভিক্ষা আমাদিগকে করিতেই হইবে। যত দিন নির্ব্বিকল্প সমাধির অনলে মন ভস্মীভূত না হইবে, তত দিন কামনা বাসনা আমাদিগকে ঘিরিয়া থাকিবে। সুতরাং যখন ভিক্ষা করিতেই হইবে, তখন এমন ভিক্ষা করা চাই, যে ভিক্ষার পর আর ভিক্ষা করিতে হইবে না। এমন জিনিষ চাহিতে হইবে, যাহা পাইলে আর চাহিতে হইবে না। যদি হাত পাতিতেই হইল, তবে চিরদিনের জন্য এমন জিনিষ হাত পাতিয়া লইতে হইবে, যাহার পর আর হাত পাতিতে হইবে না। জগতের কাছে ভিক্ষা করিব না। জগতের কাছে হাত পাতিব না। যদি হাত পাতিতেই হয় ত জগৎপতির কাছেই পাতিব। আমার মনের সাধ প্রাণের বাসনা জগৎ মিটাইতে পারিবে না। ছিন্ন কন্থা কাঁধে লইয়া যোড় হস্তে জগতের দুয়ারে জীব তুমি দাঁড়াও কেন? কল্পতরুর আশ্রয় ছাড়িয়া অমৃত লাভের জন্য আস্তাকুঁড়ের উপাসনা কর কেন? এস তাঁহার দুয়ারে দাঁড়াই, যেখানে ত্রিলোক ভিখারি। এস, তাঁহার কাছে আশা পুরাইয়া প্রাণ ভরিয়া দেবদুর্ল্লভ এমন সামগ্রী চাহিয়া লই, যাহা

পাইলে আর চাহিবার কিছু থাকিবে না। তাঁহার কাছে এমন জিনিষ চাহিতে হইবে, যাহা আর কোথাও পাওয়া যায় না। তাঁহার কাছে ক্ষুদ্র ভিক্ষা উচিত নহে। যাঁহার কৃপা কটাক্ষে অমূল্য বস্তু পাওয়া যায়, সেখানে তুচ্ছ বস্তুর প্রার্থনা সুবুদ্ধির কার্য্য নহে।

অভাব বিদূরিত করাই উন্নতির লক্ষ্য। বাণিজ্যের অভাব, ধনের অভাব, যশের অভাব, জ্ঞানের অভাব, কত অসংখ্য অভাব বিদূরিত করিবার জন্যই প্রতিনিয়ত জীব জীবনে চেষ্টা চলিতেছে। অভাবকে তাড়াইবার জন্যই মনুষ্য ঘোর জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অভাবকে পরাস্ত করিবার জন্য কত চিন্তাশীলের চিন্তা ব্যয়িত হইয়াছে, কত শাস্ত্রই রচিত হইয়াছে, সভ্য জগতে কত গুহ্য তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সীমা নাই। কিন্তু যে অভাবের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য প্রতি পদে পদে চেষ্টা, সেই অভাবই সহস্র মূর্ত্তিতেই আসিয়া জীবকে ছাঁকিয়া ধরিতেছে। আমাদের অভাব অনন্ত ধারায় প্রবাহিত। একটি অভাব যখন মিটিয়া যায়, তখন আবার আর একটি অভাব মর্ম্মদেশে জাগিয়া উঠে, আবার সে অভাবটি মিটিয়া গেলে অতর্কিতরূপে আর একটি অভাব কোথা হইতে ভাসিয়া উঠে। এইরূপে একটি একটি করিয়া অভাব বিদূরিত করিতে গিয়া শত সহস্র অভাবের মরু মাঝারে ডুবিতে হয়। একটি একটি করিয়া অভাব মিটাইতে গেলে অনন্ত জীবন কাটিয়া যাইবে। সুতরাং জগতে যে ভাবে অভাব নিবারণের চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে অভাব কমা দূরে থাকুক, আরও বাড়িয়া উঠে। অভাবের শত সহস্র শাখা। প্রত্যেক শাখা

কাটিয়া অভাব মারিবার চেষ্টা বৃথা। আগাছার শাখা প্রশাখা কাটিয়া দাও, কিন্তু সে তাহাতে মরিবে না। আরও সমুজ্জ্বল মূর্ত্তিতে তাহার শত সহস্র শাখা প্রশাখা গজাইয়া উঠিবে। আগাছাকে যদি মারিতে হয় ত তাহার মূল শিকড়টি উঠাইয়া দিতে হইবে, অভাবকে যদি মারিতে হয় ত তাহার মূলদেশে আঘাত করিতে হইবে। ঝরণার জল শত ধারায় প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে, যদি তাহাকে বন্ধ করিতে চাও, ত বাহির হইতে তাহার মুখ বন্ধ করিলে জল বন্ধ হইবে না, যে অন্তস্তল হইতে জল ভুর ভুর করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, সেই মূলদেশ উৎখাত করিলে—ধ্বস্ত বিধ্বস্ত করিয়া দিলে জলনির্গম বন্ধ হইতে পারে। অভাবের ধারা প্রবাহ অবিদ্যার মর্ম্মতল হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। সেই জাগতিক অভাবরাশির মূল স্বরূপ মোহময়ী মায়াকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে পারিলে জীবের অভাব রাশি সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। আর অভাবের পুনরুত্থান হইবে না। যখন কোন ব্যক্তি জ্বররোগে আক্রান্ত হয়, তখন জ্বরজনিত নানাবিধ উপসর্গ তাহার শরীরে প্রকাশ পায়। মাথা ধরা, শরীর গরম, নাড়ির চাঞ্চল্য, অবিরত বমন ইত্যাদি নানাবিধ জ্বরের চিহ্ন তাহার শরীরটিকে ঘিরিয়া ফেলে। বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক এই এক একটি উপসর্গকে তাড়াইবার জন্য পৃথক্ পৃথক্ চিকিৎসা করেন না। কেননা তিনি জানেন, এই সমস্ত উপসর্গের মূল কারণ জ্বরকে তাড়াইতে পারিলেই সমস্ত উপসর্গই চলিয়া যাইবে। তাই তিনি মূলীভূত কারণ জ্বরকে বিদূরিত করিবার জন্যই মনোনিবেশ করেন। আমাদের অন্তরাত্মাকে অবিদ্যারূপ জ্বর সর্ব্বদাই আবরণ করিয়া

রহিয়াছে। তাই তাহার নানাবিধ অভাবরূপ উপসর্গ আমাদিগকে ব্যথিত করিতেছে। প্রকৃত সুচিকিৎসকের সাহায্যে ঐ জ্বর তাড়াইতে পারিলেই সমস্ত উপসর্গ পলায়ন করিবে, আত্মা স্বাস্থ্য লাভ করিবেন, প্রস্ফুটিত কদম্ব-কুসুমের ন্যায় আমাদের জীবাত্মা প্রফুল্ল হইয়া উঠিবেন। অভাব অতৃপ্তির জ্বালা যন্ত্রণা দূরে চলিয়া যাইবে। আনন্দের গুপ্ত সরোবরে আত্মহংস বিচরণ করিতে থাকিবেন।

বুঝিলাম, সমূলে অভাবকে উৎপাটিত করাই উন্নতির আদর্শ। অভাবের শিকড়কে উপড়াইয়া ফেলিতে পারিলে সকল বিভ্রাট মিটিয়া যাইবে, সকল জঞ্জাল পরিষ্কার হইয়া যাইবে। যাঁহারা সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া মনে করেন, একটি একটি করিয়া অভাব মিটাইয়া সমস্ত অভাব যখন ফুরাইয়া যাইবে, তখনই দুঃখের পর পারে পৌঁছিব, এইরূপ নীতি অবলম্বন করিয়া যাঁহারা জগতে চলেন, তাঁহাদের ব্যাপার দেখিয়া এক মাতালের গল্প মনে হয়। মাতাল এক নদীর ধারে গিয়া উপস্থিত হইল, নদীর তরঙ্গরাশি দুকুল হানিয়া ভীষণ বেগে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে, মাতাল এক দৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া ধীর গম্ভীর ভাবে চুপটি করিয়া দাড়াইয়া রহিল। তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া একজন ভদ্রলোক বলিল মহাশয়! আর দাঁড়াইয়া থাকিবেন না, শীঘ্র আসুন, ঐ দেখুন পার করিবার নৌকা প্রস্তুত হইয়াছে। এখনই ছাড়িয়া দিবে, চলুন চলুন। মাতাল বলিল একটু অপেক্ষা করুন না মশায়! কেন নৌকাওয়ালাকে মিছামিছি পয়সা দিবেন। নদীর এই তরঙ্গ কয়টা ফুরাইয়া গেলেই দিব্বি চড়া পড়িয়া যাইবে। তখন অক্লেশে ওপারে হাঁটিয়া চলিয়া যাইব। ভদ্রলোকটি

ব্যাপার বুঝিয়া চলিয়া গেলেন। অভাব-নদীর তীরদেশে বসিয়া যাঁহারা মনে করেন, নদীর তরঙ্গ গুলি ফুরাইয়া গেলেই পরপারে পৌঁছিব, তাঁহাদের মতের সহিত পূর্ব্বোক্ত মাতালের মতের পার্থক্য করা কঠিন হইয়া উঠে। অভাবের অনন্ত প্রস্রবণ কি ফুরাইবার জিনিষ? অভাবের অনন্ত ধারা কি শেষ হইবার জিনিষ? ধারার পর ধারা আসিতেছে। প্রবাহের পর প্রবাহ আসিতেছে। এই প্রবাহ ফুরাইবার আশায় যদি মাতালের ন্যায় ভোগবিলাস-পরায়ণ হইয়া বসিয়া থাক, ত প্রবাহও ফুরাইবে না, তোমারও সিন্ধুর পর পারে যাওয়া ঘটিবে না। যদি প্রবাহ বাস্তবিকই ফুরাইয়া দিতে চাও, ত বীরের ন্যায় কার্য্য করিতে হইবে। জ্ঞানবীর সাজিয়া জ্ঞানখড়্গে প্রবাহের মূল দেশে গিয়া সজোরে আঘাত করিতে হইবে। প্রবাহ যেখান হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে, সেইখানে—সেই অবিদ্যার বক্ষোদেশে অধ্যাত্ম-বিদ্যার অটুট বজ্র ভীম বেগে নিপাতিত করিতে হইবে। ভীম ভৈরব নির্ঘোষে বিবেকের তুমুল অস্ত্র ঝন্‌ঝনায় মোহময়ী মায়ার ভিত্তিভূমি যখন ধসিয়া যাইবে, তখনই অভাবের অস্থিপঞ্জর খসিয়া পড়িবে, কামনা বাসনার উচ্চ চূড়া ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে। অভাবের বিরাট কলেবর চূর্ণিত চূর্ণায়মান হইয়া রেণু রেণু হইয়া কোথায় উড়িয়া যাইবে।

আইস জীব! যদি ভিক্ষা করিতেই হয়, ত এমন ভিক্ষা করিয়া লই, যাহা পাইলে চিরদিনের জন্য মনঃ প্রাণ শান্তি-সাগরে ডুবিবে। যে অভাব বৃত্তির অব্যক্ত যাতনায় মর্ম্মগ্রন্থি পুড়িয়া খাক হইতেছে, তাহাকে সমূলে তাড়াইবার জন্য আইস তাঁহার কাছে ভিক্ষা করি, যিনি ভিক্ষায় মা অন্নপূর্ণা, আইস

তাঁহার কাছে কামনা করি, যিনি কামনা-কল্প-লতিকা। সুচতুর যাচক বড় মানুষের কাছেই ভিক্ষা করিতে যায়, যেখানে গেলে মনোমত ভিক্ষা মিলিবে, বাছিয়া বাছিয়া সেই স্থানেই যায়। যিনি ভিক্ষার মূর্ত্তিমতী পরিপূর্ত্তি স্বরূপিণী হইয়া জগৎকে ডাকিতেছেন, তাঁহার কাছে না গিয়া আমরা আর কোথায় ভিক্ষা করিব? চতুর যাচক বড় মানুষের কাছে ক্ষুদ্র ভিক্ষা করে না। কাপড়, ডাল, চাল, থালা ঘটি বাটি এ সমস্ত সে তাঁহার কাছে চাহে না, সে এমন দান তাঁহার কাছে চাহে, যাহা তাঁহার বড় মানুষী মেজাজের উপযুক্ত। জগৎ প্রভুর কাছে আমরা ক্ষুদ্র ভিক্ষা করিব কেন? ধন, ধান্য, পুত্রাদি এ সমস্ত ক্ষুদ্র দান তাঁহার কাছে চাহিব কেন? অমূল্য মণি মাণিক্য যাঁহার কৃপা-কটাক্ষে পাওয়া যায়, তাঁহার কাছে দুচার কড়া কড়ির জন্য ভিখারি হইব কেন? তাঁহার কাছে এমন জিনিষ চাহিতে হইবে, যাহা আর কোথাও পাওয়া যায় না। যাহা পাইলে আমার সমস্ত অভাব মিটিয়া যাইবে, আর চাহিবার কিছু থাকিবে না, তাহাই তাঁহার কাছে ভিক্ষা করিতে হইবে।

আমাদের জ্ঞান সঙ্কীর্ণ—ক্ষুদ্র, তাই আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষাও ক্ষুদ্র। আমরা যদি ভগবানের কাছে চাহিতে যাই, তাহা হইলে আমাদের জ্ঞান বুদ্ধ্যনুসারে ক্ষুদ্র ভিক্ষাই তাঁহার কাছে করিয়া ফেলিব। সঙ্কীর্ণদৃষ্টি চাষা মুড়ি মুড়্কি ভোজন করিতে পারিলেই রাজত্বসুখ মনে করে, আমরা হয়ত ভগবানের কাছে সেইরূপ রাজত্বসুখ চাহিয়া বসিব। তাহা হইলেই ত ঠকিতে হইবে। তাই বলি, তাঁহার কাছে কৌশলে চাহিতে হইবে। চতুর যাচক বড় মানুষের কাছে "অমুক জিনিষ দিন"

এইরূপ উল্লেখ করিয়া চাহে না। "আপনার যাহা উপযুক্ত, তাহাই আমাকে দিন, আপনি যাহা ভাল মনে করিবেন, তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট", ইহাই প্রকৃত যাচকের ভাষা। জগৎ প্রভুর কাছে আমরা তাঁহার নিজোচিত দান চাহিব। মুখ ফুটিয়া কোন জিনিষ উল্লেখ করিয়া চাহিব না। মরমেরই বেদনা মর্ম্মজ্ঞ তিনি জানিতেছেন, আমার অন্তঃ প্রকৃতির মর্ম্মগাথা অন্তর্যামী তিনি ঠিক বুঝিতেছেন। বিকারের ঘোরে আমার প্রকৃতির ভাষা আমি বুঝিতে পারি না, সুতরাং তিনি আমার মর্ম্মগত অভাব বুঝিয়া যাহা দিবেন, তাহাতেই আমার সমস্ত অভাব মিটিয়া যাইবে। আমার অবিদ্যাচ্ছন্ন আত্মা মরুভূমে তৃপ্তির অমৃত কল্লোলিনী অনন্ত ধারায় প্রবাহিত হইয়া যাইবে।

আমরা প্রকৃত ভিক্ষা করিতে জানি না। কৌশলে চাহিতে পারি না। তাই আমরা চির দুঃখী। ভিক্ষার মত ভিক্ষা করিতে জানি না বলিয়াই আমাদের জীব প্রকৃতির অতৃপ্তির কান্না আর ফুরাইল না। ভগবান্ যখন প্রহ্লাদকে বর দিতে চাহিয়াছিলেন, তখন প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন, প্রভু! আমিত বণিক্ নহি, যে তপস্যার বিনিময়ে তোমার কাছে বর চাহিব? বাহিরের সুখকর কোন পদার্থই তোমার কাছে চাহি না। সিদ্ধি চাহি না, ঋদ্ধি চাহি না, কোন উত্তমলোকে বাস করিতেও চাহি না, তবে যদি নাথ! দয়া করিয়া নিতান্তই কিছু দিতে চাও তবে তোমার গুপ্ত ভাণ্ডারের যাহা অমূল্য নিধি, তাহাই দাও! এমন বস্তু দাও প্রভু! যাহাতে জীবন জুড়াইয়া যায়, এ দীন হীন কাঙ্গাল যাহা পাইলে কৃতকৃতার্থ হইয়া যায়, তাহাই বুঝিয়া দাও, আমি আর কি চাহিব? তুমি স্বহস্তে তুলিয়া যাহা দিবে,

তাহাতেই আমি চরিতার্থ হইয়া যাইব। প্রহ্লাদ চাহিতে জানি-তেন, তাই চাহিবার বস্তু নির্ব্বাচনের ভার ভগবানের উপরই সমর্পণ করিয়াছিলেন। ভগবান্ নিজ হস্তে তুলিয়া প্রহ্লাদকে যাহা দিয়াছিলেন, তাহাতেই প্রহ্লাদের জন্ম জীবন মধুময় হইয়া গিয়াছিল। আর আমাদের মত যাচককে যদিই কোন গতিকে ভগবান্ দয়া করিয়া বর দিতে আসেন, তাহা হইলে হয় ত আমরা থান কতক কাপড় চোপড়ই চাহিয়া ফেলি! কেননা আমাদের উচ্চ আকাঙ্ক্ষার দৌড় ঐ পর্য্যন্ত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মানুষের জ্ঞান যেমন যেমন বাড়িতে থাকে, মানুষের আকাঙ্ক্ষাও তেমনই তেমনই বাড়িয়া উঠে; অভিজ্ঞতা যতই বিস্তীর্ণ হয়, আকাঙ্ক্ষা ততই প্রসারিত হয়। শৈশবে একখানি রাঙ্গাকাপড় পাইলে যে আহ্লাদ হয়, যৌবনে শাল দোশালা না পাইলে তেমন আহ্লাদ হয় না। শৈশবে নিজের পেটটি ভরিলেই যথেষ্ট, যৌবনে পরিবারবর্গের পেট ভরাইতে না পারিলে জীবন জঞ্জালময় বলিয়া বোধ হয়। যৌবনে প্রবল প্রবৃত্তির তুফানে অর্থের আকাঙ্ক্ষা, মর্য্যাদার আকাঙ্ক্ষা, বিলাস ভোগের আকাঙ্ক্ষাতেই কাল কাটিয়া যায়, আবার প্রৌঢ়বয়সে একটু শাস্ত্রজ্ঞান জন্মিলে অনেকের ধর্ম্মের আকাঙ্ক্ষাতেই সময় অতিবাহিত হইয়া যায়। তখন ধনজন পুত্র পরিবার বিষয় সম্পদ্ পরিবৃত হইয়াও তাহাতে আকাঙ্ক্ষা মিটে না, তখন আবার কি জানি কি পাইবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হয়। এক সময়ে যে ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্য প্রতিদিনই আফিযে আসিয়া বড় বাবুর পদতলে তৈল দান করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই অন্য সময়ে নিজ সঞ্চিত টাকা কড়ি

ঐশ্বর্য্য পদমর্য্যাদার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া কি জানি কি প্রাণের গুপ্ত আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্য এক অসভ্য লেংটা বাবাজির চরণ সেবা করিতেছে। এক সময়ে যিনি বিষয় বিভবের উচ্চ মঞ্চে বসিয়া বিলাসের ক্রোড়ে লালিত হইয়া নিজের আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়াছেন, তিনিই আবার শ্রীবৃন্দাবন ধামে আসিয়া কি জানি কি আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্য কৌপীনধারী ভিক্ষুক হইয়া মাধুকরী ভিক্ষা করিয়া জীবনের শেষ অংশ কাটাইয়া দিয়াছেন। আবার যিনি সৎসঙ্গের পথে—সাধনার দিকে যতই অগ্রসর হন, তাঁহার অভাব আকাঙ্ক্ষাও ততই বিরাট—বিশ্বব্যাপী হইয়া উঠে। উন্নতির উচ্চ স্তরে যতই ধাবিত হইবে, অভাবের ক্ষেত্রও ততই পরিসর হইয়া আসিবে। আকাশের উচ্চ ঊর্দ্ধে যতই গতি করিবে, ততই শূন্যতার বিপুল কায়া দেখিয়া চমকিয়া উঠিবে। প্রসঙ্গাধীন একটা গল্প মনে হইতেছে। কোন ধনীর সন্তান একজন সাধুর নিকটে যাতায়াত করিতেন। ক্রমশঃ সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ করিবার জন্য তিনি সাধুর শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। অবিচলিতচিত্তে সাধুর সেবা করিতে লাগিলেন, রন্ধনের জন্য কাষ্ঠ আহরণ করিতেন, পূজার জন্য গঙ্গা জলের কলস মাথায় করিয়া লইয়া আসিতেন, গুরুকে স্বহস্তে স্নান করাইয়া কৌপীনাদি কাচিয়া লইয়া আসিতেন, বিধিমতে তাঁহার গুরুসেবা চলিতে লাগিল। এইরূপ কত দিন চলিয়া গেল, শিষ্যের মন কিন্তু ক্রমশঃ চঞ্চল হইয়া উঠিল, আকাঙ্ক্ষার বেগে তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন। তৃপ্তির পবিবর্ত্তে অতৃপ্তির অনল ক্রমশই তাঁহার মনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। উচ্চ আকাঙ্ক্ষার আবর্ত্তে পড়িয়া তিনি সৎসঙ্গের ফল কিছুই বুঝিতে

পারিলেন না। এক দিন তিনি বেলা দ্বিপ্রহরের সময় প্রচণ্ড রৌদ্রে গঙ্গাজলপূর্ণ কলস মাথায় লইয়া আসিতে আসিতে ভাবিতে লাগিলেন, এতদিন ত সাধু সেবা করিলাম, এত পরিশ্রম করিয়া সৎসঙ্গ ত করিলাম, কিন্তু কিছুই ত হইল না, কোন ফলই ত পাইলাম না। গুরু নিতান্তই ভণ্ড, ফাকি দিয়া কেবল আমাকে খাটাইয়া লইতেছে, অতএব ইহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন সাধুর আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। এই ভাবিয়া তিনি জলপূর্ণ কলসটি ভূমে রাখিয়া আশ্রম হইতে চলিয়া যাইবার জন্য উদ্যত হইলেন। গুরু একজন সিদ্ধিসম্পন্ন মহাপুরুষ ছিলেন, তিনি শিষ্যের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিয়া তাহাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য যোগবলে এক মায়িক ব্যাপারের অবতারণা করিলেন। তিনি সেই জলপূর্ণ কুম্ভে নিজ শক্তির সঞ্চার করিলেন, তখন সেই জড় কলস চেতনভাবাপন্ন হইয়া গমনোদ্যত শিষ্যকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কেন আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছ? শিষ্য বলিলেন, এত দিন এই সাধুর আশ্রমে থাকিয়া সৎসঙ্গ করিলাম, কিন্তু কোন ফলই পাইলাম না। এত পরিশ্রম-কষ্ট করিলাম, কিছুই হইল না, তাই আশ্রম ছাড়িয়া যাইতেছি। কুম্ভ বলিল, আচ্ছা একটু অপেক্ষা কর আমার গোটাকত কথা তুমি স্থিরচিত্তে শুন, আমি তোমাকে নিজ জীবনের কাহিনী বলিব, তাহা শুনিয়া তোমার যাহা কর্ত্তব্য হয় করিও, চলিয়া যাইতে হয় যাইও। শিষ্য তাহাতে সম্মত হইলেন, কুম্ভ নিজ জীবনের ইতিবৃত্ত বলিতে লাগিল। "আমি এক পুষ্করিণীর তীরে মৃত্তিকার আকারে পড়িয়াছিলাম, কাহারও অনিষ্ট করি

না, চুপ করিয়া এক জায়গায় পড়িয়া থাকি, লোক আসিয়া আমার উপর বিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া যাইত, শেয়াল কুকুরে প্রস্রাব করিত। সমস্তই সহিতাম, দুরদৃষ্ট ভাবিয়া মনের দুঃখ মনেই চাপিয়া যাইতাম। কোনরূপ শত্রুতা নাই, কোনরূপ বিবাদ বিসম্বাদ নাই, কোথা হইতে এক কুম্ভকার আসিয়া তীক্ষ্ণ অস্ত্রে আমাকে কাটিয়া—আমার শরীর ক্ষত বিক্ষত করিয়া তাহার বাড়িতে আমাকে উঠাইয়া লইয়া গেল। তথায় লইয়া গিয়া অতি নিষ্ঠুরভাবে আমাকে লগুড়াঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করিল। পদতলে মর্দ্দিত করিয়া আমার দুর্দ্দশার একশেষ করিল, পরে একটা চক্রের মধ্যে ফেলিয়া কেবল ঘুরাইতে লাগিল। ঘুরান শেষ হইলে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। ভাবিলাম বুঝি এইবার যন্ত্রণার শেষ হইল, কিন্তু তাহা হইল না, কুম্ভকার আমাকে প্রচণ্ড রৌদ্রে রাখিয়া দিল, পরে জলন্ত অগ্নিতে আমাকে দগ্ধ বিদগ্ধ করিয়া ফেলিল, অবশেষে আমাকে এক দোকানে রাখিয়া দিল, আশা হইল এইবার বুঝি নিস্তার পাইব, কিন্তু সে আশায় ছাই পড়িল, এখানে আসিয়াও পরিত্রাণ নাই। যে কেহ আমাকে লইতে আসিত, সেই একবার ঠং করিয়া বাজাইয়া দেখিত। লোকের থাপ্পড় খাইতে খাইতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল। দুঃখের নিশি কিছুতেই আর কাটে না। এইরূপ কত দিন কাটিয়া গেলে এই সাধুর আশ্রমে আমি আনীত হইয়াছি, এখানে আসিয়া পবিত্র গঙ্গাজল বক্ষে ধারণ করিয়া বিশ্বপতির সেবার জন্য ব্যবহৃত হইতেছি, এত কষ্ট এত নির্য্যাতনের পর আমি পরম প্রভুর সেবায় আসিয়াছি, আমার জীবন এত বিঘ্ন বিপত্তি রাশির ভীষণ চক্রে নিষ্পেশিত হইয়া তবে বিশ্বনাথের

চরণ সেবার উপকরণ হইয়া এত দিনে ধন্য হইয়াছে। সুতরাং উন্নতির উচ্চমঞ্চে উঠিতে হইলে, প্রথমে বাধা বিঘ্নজনিত নৈরাশ্যের প্রবল ধাক্কা অটল অচলের ন্যায় সহিতে হয়, শূন্যতার ঘোর মরুময় প্রান্তর স্থির ধীর হইয়া অতিক্রম করিতে হয়। এই অগ্নিপরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইলে সাধকের আর মার নাই। তুমি নিরাশ হইও না, যতই দুঃখ কষ্টের মুখ দেখিতে পাইবে, যতই তোমার চতুষ্পার্শ্বে নৈরাশ্য শূন্যতা অভাবের ঘোর ঘনঘটা দিগ্‌দিগন্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে, ততই সাধনার—উন্নতির উচ্চমঞ্চে অগ্রসর হইতেছ, বুঝিবে, যতই নির্য্যাতনের অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিবে, ততই শান্তিধাম নিকটবর্ত্তী হইতেছে জানিবে।” কৃষ্ণের এই জ্বলন্ত উপদেশে শিষ্য প্রবুদ্ধ হইলেন, তাঁহার মনের ধাঁদা কাটিয়া গেল, শান্তচিত্তে সেই গুরুর আশ্রমে থাকিয়া সাধন-নিরত হইলেন। পুনরায় শিষ্যকে গুরুর উপদেশ দিবার প্রয়োজন হইল। একদিন শিষ্য গুরুসমীপে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে গুরুর মায়া-কৌশলে দেখিতে পাইলেন, এক তেজঃপুঞ্জ কলেবর দিব্যপুরুষ ভীমবেগে শূন্যমার্গে চলিয়া যাইতেছেন। তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে আটটি পরমা সুন্দরী স্ত্রী তাঁহার সহিত দুচারটি কথা কহিবার জন্য কত সাধ্য সাধনা করিতেছে, কিন্তু তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিতেছেন না। শিষ্য বিস্মিত হইয়া গুরুদেবকে ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরুদেব বলিলেন, ঐ যে দিব্য পুরুষটিকে দেখিতেছ, উনি এক জন মহাযোগী পুরুষ। আর ঐ যে অষ্ট সখী দেখিতেছ, উহাঁরা অষ্টসিদ্ধি। অষ্টসিদ্ধি দাসীর ন্যায় যোগীর পরিচর্য্যা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু যোগী সিদ্ধির ভিখারি নহেন,

তাই তিনি অষ্টসিদ্ধিকে তুচ্ছ করিয়া তাহাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। শিষ্য বুঝিলেন, যোগীর আকাঙ্ক্ষা এত উচ্চস্তরে পৌঁছিয়াছে যে অষ্টসিদ্ধি আর তাহা মিটাইতে পারে না। যোগী এমন কোন বস্তুর প্রার্থী, যাহার তুলনায় অণিমা লঘিমা আদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য নিতান্তই তুচ্ছাতিতুচ্ছ। আজ কি জানি কিসের জন্য যোগীর প্রাণ লালায়িত, তাই তিনি অষ্ট সিদ্ধির মোহন সৌন্দর্য্য ঘৃণাপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। কি জানি কি অমূল্য সামগ্রীর গুপ্ত বিভা তিনি দেখিতে পাইয়াছেন, তাই সিদ্ধিকে ভস্মস্তূপ বোধে পরিহার করিয়া যাইতেছেন। তাঁহার প্রাণধন কি জানি কি গুপ্ত পথে বিরাজ করিতেছে, তাহার গুপ্ত সমাচার পাইয়া তিনি পার্থিব এবং অপার্থিব ঐশ্বর্য্য রাশিকে তুচ্ছবোধে ত্যাগ করিয়া সেইদিকে ছুটিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আকাশের (জ্ঞানোন্নতির) উচ্চ ঊর্দ্ধে যতই ধাবিত হইবে, ততই শূন্যতা (অভাব—আকাঙ্ক্ষা) বাড়িয়া উঠিবে। যোগী আকাশের উচ্চ ঊর্দ্ধে উঠিয়াছেন, তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আজ তাঁহার শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে। জগতের ঐশ্বর্য্যস্তূপের মধ্যে তিনি তন্ন তন্ন করিয়া খুজিয়া দেখিতেছেন কোথাও এমন জিনিষ পাইলেন না, যাহাতে তাঁহার অভাব মিটে, আকাঙ্ক্ষা মিটে, প্রাণের জ্বালা বিদূরিত হয়, তাই তিনি সকলই শূন্য দেখিতেছেন। সাংসারিক অবস্থায় তাঁহার যে এক ফোঁটা অভাব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক কোণে পড়িয়া থাকিত, আজ যোগী অবস্থায় উন্নতির চরমসীমায় সেই অভাব বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী হইয়া উঠিয়াছে। আকাশের এক কোণে ক্ষুদ্র মেঘটি

উঠিয়াছিল, ধীরে ধীরে আজ তাহা সমগ্র আকাশ জুড়িয়া গিয়াছে। সাংসারিক অবস্থায় তাঁহার যে আকাঙ্ক্ষা যে ভিক্ষা-বৃত্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন ক্ষুদ্র পদার্থ লইয়াই চরিতার্থ হইত, আজ যোগী অবস্থায় সেই ভিক্ষাবৃত্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া তাহার অতীত রাজ্যে পৌঁছিয়াছে! আজ ক্ষুদ্র বিন্দু বিশাল সাগর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সূক্ষ্ম ধূলিকণা আকাশভেদী সুমেরু পর্ব্বতে পরিণত হইয়াছে। সসীম অসীম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাই ত ভিক্ষার চূড়ান্ত আদর্শ।

প্রকৃত ভিখারী জগতের দ্বারে ততদিন ভিক্ষা করিবেন, যত দিন ভিক্ষার ঝুলির ভিতরে পূর্ণ স্বরূপকে না পুরিতে পারিতেছেন। ভিক্ষা করিবার জন্যই অন্তঃকরণরূপ ভিক্ষার ঝুলি আমরা পাইয়াছি। কিন্তু ভিক্ষা করিতে জানি না, তাই কেবল সংসারের ময়লামাটিমাখা কদর্য্য তণ্ডুলরাশি দিয়া ঐ ঝুলি পরিপূর্ণ করিতে যাই। যে পবিত্র তণ্ডুলের উপাদানে অমিয় রসভরা পরমান্ন প্রস্তুত হয়, তাহার এক কণিকাও সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। আইস ভিক্ষুক! একবার কল্পতরুতলে দাঁড়াইয়া প্রাণ ভরিয়া চাহিয়া লও! জনমের মত ভিক্ষা করিয়া লও! তোমার শূন্য জীবন-কমণ্ডলু অমৃতরাশিতে পূর্ণ করিয়া লও। মা মা বলিয়া, প্রাণসখা বলিয়া, জগৎপ্রভু বলিয়া জিহ্বার বলিবার সাধ ফুরাইয়া দাও! সেই ভুবনমোহন মাধুরীর ধারায় নয়নের দেখিবার সাধ মিটাইয়া দাও! তোমার মনঃ প্রাণ ইন্দ্রিয়ের প্রতি অণু পরমাণু সেই সুধাসিন্ধুক্ষরিত বিন্দুপানে বিভোর করিয়া দাও। এই মনুষ্যদেহ থাকিতে থাকিতেই ভিক্ষা করিয়া লও। কুক্কুর দেহে গিয়া যেন ভিক্ষা করিতে না

হয়, তাহা হইলে অদৃষ্টে বিষ্ঠাই ভিক্ষা মিলিবে। তাই বলি মনুষ্য! ত্বরিত হও, দিন ফুরাইয়া আসিতেছে। মানবীবৃত্তিপূর্ণ অন্তঃকরণরূপ সুবর্ণ ভাণ্ড থাকিতে থাকিতে রাজরাজেশ্বরের কাছে চিরদিনের জন্য সাধের সামগ্রী চাহিয়া লও। পুষ্পপাত্রে পবিত্র চন্দন ভরিয়া লও, স্ফটিক-পাত্রে ক্ষীর সর নবনীত পূর্ণ করিয়া লও! সুসময় উপেক্ষা করিও না, মানবজন্ম নিষ্ফল করিও না।

ভিক্ষার দিকেই, ভগবৎ-কৃপা গতিশীল হয়। হীনতাই ভগবানের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করে। অভাবই ভাবশক্তিকে আহ্বান করে। শূন্যতাই পূর্ণতার আবির্ভাব করে। সুতরাং রীতিমত ভিখারি হওয়া বহু সৌভাগ্যের কথা, দুর্দ্দশার কথা নহে। প্রকৃত ভিক্ষুক হওয়াই দুঃসাধ্য ব্যাপার। প্রকৃত ভিক্ষুক হইতে হইলে যে অভিমানকে তাড়াইতে হয়, অহঙ্কারকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে হয়। অভিমানভরা হৃদয় যাহার, সে কি প্রকৃত অভাবগ্রস্ত ভিক্ষুক হইতে পারে? অভিমানে যে হৃদয় পরিবেষ্টিত, তথায় কি ভিক্ষা—দীনতা স্থান লাভ করিতে পারে? বৈষ্ণবশাস্ত্রে লিখিত আছে—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা!"

তৃণ অপেক্ষাও অবনত হইয়া বৃক্ষ অপেক্ষাও সহিষ্ণু হইয়া ভগবানের সেবা করিতে হয়। সুতরাং সে বড় কঠিন কথা। তাই একজন কবি বলিয়াছেন—

"বৈষ্ণব হইতে বড় ছিল মনে সাধ,
তৃণাদপি শ্লোকেতে পড়ে গেল বাধ।"

বাস্তবিকই ভিখারি হওয়া—অবনত হওয়া—নিরভিমান হওয়া

যত কঠিন, ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া তত কঠিন নহে। একটী প্রকৃত ঘটনা বলিতেছি। কোন এক আধুনিক সভ্য বাবু কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া রোগ শান্তির জন্য নানাবিধ চিকিৎসা করাইলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ডাক্তারি, কবিরাজি, হোমিওপ্যাথিক হাকেমি কোন চিকিৎসা-তেই রোগ শান্তি হইল না। অবশেষে হতাশ হইয়া স্ত্রীর পরামর্শ মত দৈবকার্য্য করিতে মনস্থ করিলেন। প্রতিদিন সূর্য্যার্ঘ দেওয়াই স্থির হইল। সূর্য্যার্ঘ দিবার সময় পুরোহিত বাবুকে বলিলেন, সূর্য্যদেবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করুন। বাবু বলিলেন, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত কেমন করিয়া করিতে হয় জানি না, আপনি দেখাইয়া দিউন। পুরোহিত, ভূমিতলে গড়াগড়ি দিয়া যেরূপ যথাবিধি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিলেন। প্রণামের ঘটা দেখিয়া সভ্যতাভিমানী বাবু বিষম বিভ্রাটে পড়িলেন। কি করেন, প্রণাম করিতে উপক্রম করিলেন। বহুকষ্টে জানু অবনত করিলেন, মস্তকও কিঞ্চিৎ পরিমাণে ঝুঁকাইয়া দিলেন, কিন্তু যাই ভূমিতলে গড়াইবার কল্পনা মনে হইল, আর অমনি যমযন্ত্রণা বোধ হইতে লাগিল, তিনি উঠিয়া পড়িলেন, বলিলেন মহাশয়! ব্যারাম সারুক আর নাই সারুক, এ বিট্‌কেল প্রণাম আমার দ্বারা হইবে না! অভি-মানের বিষে যাহার দেহ মনঃপ্রাণ জর্জ্জরিত, দেবতার চরণে সে অবনত হইবে কেন? পার্থিব সম্মানের অভিমানে যে ফুলিয়া উঠিয়াছে, মহারুদ্রের সংহারশূল না দেখিলে তাহার চমক ভাঙ্গিবে না। এই অভিমানকে ত্যাগ করা যত কঠিন, ভগ-বান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া তত কঠিন নহে। যিনি অতি দূরদেশে

বাস করিতেছেন, তাঁহাকে পাওয়াই কঠিন। জগৎপ্রভু ত তোমার অতি নিকট হইতেও নিকটতম প্রদেশে বাস করিতেছেন, তিনি তোমার কাছে আসিবেন কেন? তুমি নিজেই যে প্রভু (অহং) সাজিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ। জগৎপ্রভুর জন্য তুমি যে হৃদয় আসন বিছাইয়া রাখিয়াছ, তাহা যে নিতান্তই ক্ষুদ্র। সে সঙ্কীর্ণ আসনে তিনি ও তুমি এই দুই জনের স্থান হইবে কেন? তুলসীদাস বলিয়াছেন—

> যাঁহা রাম, তাঁহা কাম হীন, যাঁহা কাম তাঁহা নহী রাম
>
> তুলসী কবহুঁ কি হো সকে রব রজনী এক ঠাম ?

রাম অর্থাৎ ভগবান্ যেখানে বাস করেন, তথায় কাম অর্থাৎ বিষয়কার্য্যপরায়ণ "অহং" থাকিতে পারে না, আবার যেখানে 'কাম", তথায় রাম বিরাজ করিতে পারেন না। রবি ও রজনী কখনও কি একত্র থাকিতে পারে?

সুতরাং তিনি ও আমি এই দুই বস্তু অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় কখনও একত্র থাকিতে পারে না "আমাকে" চেয়ার ছাড়িয়া বসিতে হইবে। তবে তিনি আসিয়া বিরাজ করিবেন। তিনি ত দুর্লভ নহেন। সাধক! মিছামিছি ভগবান্‌কে দুর্লভ বলিয়া কলঙ্ক দাও কেন? তিনি তোমার হৃদয়-অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে আসিয়া তোমার দ্বারদেশ বন্ধ দেখিয়া ফিরিয়া যান। তোমার হৃদয়-কপাট উন্মুক্ত থাকে না বলিয়াই ধ্যানকালে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি তোমার সম্মুখস্থ হইয়া দাঁড়ান। সুতরাং কলঙ্ক আমাদের, তাঁহার নহে।

ভিক্ষাই ঐশ্বর্য্য-শক্তিকে আহ্বান করে। যাঁহারা বলেন, "ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ" তাঁহাদের মত নিতান্তই ভ্রমপূর্ণ।

প্রকৃত ভিখারি হইতে পারিলে ঐশ্বর্য্য-শক্তি দৌড়িয়া আসিয়া আশ্রয় করেন। তাই মহালক্ষ্মী স্বরূপিণী রাজরাজেশ্বরী ভিক্ষুক-শ্রেষ্ঠ মহাদেবের গেহিণী হইয়াছেন। মহাপণ্ডিত মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব ভিখারি হইয়াই—কন্থা ধারণ করিয়াই—তর্কাভিমান চূর্ণ করিয়াই অমূল্য নীলকান্ত মণি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং ভিক্ষাই তাঁহার রাজ্যের ব্যবস্থা। পূর্ণ দীনতা পূর্ণ নিরভিমান না হইলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। আমাকে দীন হইতে হইলে বুঝিতে হইবে, আমার কিছু নাই, তিনিই আমার সর্ব্বস্বধন। আমি কেহই নহি, তিনিই একমাত্র বিরাজ করিতেছেন। বাস্তবিক তিনিই ত (আত্মা) সর্ব্বাগ্রে জগতে আছেন, তুমি (দেহেন্দ্রিয়াদি জড়পিণ্ড) তাঁহার পর আসিয়া তাঁহাকে তাড়াইবার কে? তোমার এত অহঙ্কার কিসের? মাটি হইতে তোমার উৎপত্তি, ভবিষ্যতে তোমাকে মাটি হইতেই হইবে, তবে এখন হইতেই একটু মাটির মানুষ হও না কেন?

"মাটি হ'তে হইয়াছ, মাটি হ'তে হবে।
মাটি হবার আগে কেন মাটি নহ তবে?"

ভগবৎসখা অর্জ্জুনও মাটি হইয়াই বলিয়াছিলেন, "শিষ্যস্তেহং সাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।" তাই ভগবান্ গীতার অমৃতময় উপদেশে অর্জ্জুনের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিয়াছিলেন। পূর্ণ দীনতার—পূর্ণ অভাবের সূক্ষ্ম সূত্র অবলম্বন করিয়াই ভাব-স্বরূপ ভগবান্ আবির্ভূত হয়েন। পাপীদের অত্যাচারে পৃথিবীতে যখন পূর্ণ দৈন্য আধিপত্য করে, পুণ্যের যখন সম্পূর্ণ অভাব হয়, তখনই ভগবানের অবতার হয়। ষষ্টি সহস্র ছাত্র লইয়া দুর্ব্বাসা

ঋষি যখন বনবাসী পাণ্ডবগণের কুটিরে অতিথি হয়েন, তখন দ্রৌপদীর সূর্য্যস্থালীতে এক কণিকাও অন্ন ছিল না। সেই পূর্ণ অভাবের সময়—পূর্ণ দীনতার সময় দ্রৌপদী পূর্ণ স্বরূপকে কাতরকণ্ঠে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, দ্বারকাধীশ! এ দুর্দ্দিনে দেখা দাও! বিপদের অকূল পাথারে দীনবন্ধু! তোমাকে দেখিয়া ভরসা পাইব! দ্রৌপদীর কাতর প্রার্থনায় জগৎপ্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ঐশ্বর্য্যশালিনী রুক্মিণী ও সত্যভামাকে পরিত্যাগ করিয়া ভিখারিণী দ্রৌপদীর নিকটে দৌড়িয়া আসিলেন। দ্বারকার অতুল ঐশ্বর্য্যাস্তম্ভ ভেদ করিয়া আজ পর্ণকুটিরে বিভূতিস্বরূপের উজ্জ্বল বিভা বিকশিত হইল। দ্রৌপদী বলিলেন, নাথ! এত বিলম্ব করিয়া কি আসিতে হয়! ভগবান্ বলিলেন, তুমি আমাকে দ্বারকাধীশ বলিয়া কেন ডাকিয়াছিলে? প্রাণেশ্বর বলিয়া কেন ডাক নাই? দ্বারকা যে এখান হইতে বহুদূরে, তাই আসিতে বিলম্ব হইয়াছে।

যিনি প্রাণের মর্ম্ম কথা বুঝিতে পারেন, বাহিরের মুখ ফুটিয়া তাঁহার কাছে ভিক্ষা করিতে হয় না। ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লইয়া ভিখারী হইয়া তাঁহার দ্বারদেশে দাঁড়াইলেই তিনি দয়া করেন। আমি নীরবে তাঁহার সেবা করিব, মুখ ফুটিয়া কিছু চাহিব না। আমি দীনহীন কাঙ্গাল, তাঁহার দুয়ারেই পড়িয়া রহিব, ইহাই আমার কর্ত্তব্য, আমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আমি করিব, তাঁহার কর্ত্তব্য যাহা, তাহা তিনি করিবেন। সেবকের দুঃখ যন্ত্রণা যদি বিদূরিত করিতে হয়, সে ভাবনা প্রভু ভাবিবেন, সে ভার তাঁহার উপর। ইহাই নিষ্কাম ভিখারির ভাষা। প্রকৃত ভিখারি তাঁহার দর্শন লাভের জন্য ব্যাকুল। তাঁহার

দর্শন পাইলে আর কি কিছু চাহিতে হয়? তাঁহার দর্শন পাইলে চাহিবার অগ্রেই সমস্ত অভাব মিটিয়া যায়। সমস্ত কামনা পুরিয়া যায়। ভিখারির ক্ষুদ্র পর্ণ কুটির অমূল্য মণিমাণিক্যে ভরিয়া যায়। সুতরাং চাহিবার অবসর থাকে কৈ? প্রসঙ্গাধীন বৈষ্ণবশাস্ত্র হইতে একটি দৃষ্টান্ত বলিতেছি।

পণ্ডিত সুদামা বাল্যকাল হইতেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সখা ছিলেন। দুই জনে একত্র অধ্যয়ন করিতেন, দুই জনে এক গুরুর কাছে বিদ্যাভ্যাস করিতেন। বিদ্যাভ্যাস সাঙ্গ হইলে দুই জনে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইলেন। বহু দিন চলিয়া গেল, দুই জনের আর পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ থাকিল না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় রাজা হইলেন, দুঃখীর সন্তান সুদামা যে দুঃখী সেই দুঃখীই চিরকাল থাকিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ টাকা কড়ি সম্বন্ধে কিছুই উন্নতি করিতে পারিলেন না। এক দিন তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, তুমি এত বিদ্যা অভ্যাস করিলে, কৈ টাকা কড়ি ত কিছুই উপার্জ্জন করিতে পারিলে না, সুতরাং লেখা পড়া শিখিয়া তুমি করিলে কি? সুদামা বলিলেন, আমার বিদ্যা এত তুচ্ছ নহে, যে তাহাকে কেবল অকিঞ্চিৎকর অর্থ উপার্জ্জনের উপায় স্বরূপ মনে করিতে হইবে? স্ত্রী বলিলেন, তুমি বিদ্যা দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিতে প্রস্তুত নহ, আচ্ছা বেশ কথা, তুমি এক কাজ কর না কেন? শুনিয়াছি তুমি নাকি শ্রীকৃষ্ণের বাল্যসখা, তিনি এক্ষণে রাজা হইয়াছেন, তাঁহার সহিত এই সময় তুমি একবার সাক্ষাৎ করিলে অনেক অর্থ পাইতে পার। সুদামা বলিলেন, তুমি ত বেশ পরামর্শ দিতেছ, ভগবানের সহিত আমার সখ্য ভাব আছে বলিয়া আমি তাঁহার

কাছে টাকা চাহিতে যাইব, ইহা ত আমার হাড়ে হইবে না। ভগবদ্ভক্তিকে আমি এত হীন মনে করি না যে তাহার বিনিময়ে টাকা কড়ি চাহিতে হইবে। তুমি পাগল হইয়াছ, তাই এমন কথা বলিতেছ। স্ত্রী বলিলেন, আমি বলিতেছি না যে তুমি তাঁহার কাছে গিয়া অর্থ ভিক্ষা কর। যিনি তোমার সহিত বাল্যকাল হইতে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ, তাঁহার সহিত এখন এক বার দেখা করিতে ক্ষতি কি? তাঁহার সহিত দেখা করিলেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, তোমাকে কিছু চাহিতে হইবে না। স্ত্রীর পরামর্শ মত সুদামা ভগবদুদ্দেশে যাত্রা করিলেন। কিঞ্চিৎ তণ্ডুল বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া লইলেন। অনেক পথ অতিক্রম করিয়া বহু কষ্টে ব্রাহ্মণ ভগবানের রাজধানীতে উপনীত হইলেন, রাজদ্বারে গিয়া প্রহরীগণকে বলিলেন, তোমাদের রাজাকে সংবাদ দাও তাঁহার একজন বাল্যবন্ধু তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে। রাজবাটীর অতুল শোভা দেখিয়া ব্রাহ্মণ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণ হয় ত আমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন। দুশ্চিন্তায় ব্রাহ্মণের মন আন্দোলিত হইতে লাগিল। কিন্তু যিনি অন্তর্যামী, তাঁহার ত কিছুই অগোচর নাই। বুঝিলেন, আজ বহুদিনের প্রাণসখা দ্বারদেশে দেখা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। ভগবান্ তখন পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়াছিলেন, রুক্মিণী সত্যভামা কাছে বসিয়া পদসেবা করিতেছিলেন, অমনি শয্যা হইতে উঠিয়া ভগবান্ দ্বারদেশে সমাগত বন্ধুকে সাদরে লইয়া আসিবার জন্য দৌড়িয়া গেলেন। সাধক! তুমি যদি তাহার দিকে এক পদ অগ্রসর হও, তিনি তিন পদ অগ্রসর

হইয়া আসেন। এমনই তাঁহার অতুল দয়া। সখাকে সঙ্গে করিয়া ভগবান্ অন্তঃপুরে লইয়া আসিলেন। রুক্মিণী ও সত্যভামা জল লইয়া সুদামার পদ ধৌত করিলেন। ভগবান্ সুদামাকে পর্য্যঙ্কে বসাইয়া চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ বলিলেন, সখে! বহুদিন বাদে সাক্ষাৎ লাভ হইল, প্রিয় বন্ধুর জন্য লোকে উপহার সঙ্গে লইয়া যায়, কৈ আমার জন্য তুমি কি আনিয়াছ দেখি। দুঃখী সুদামা বন্ধুর জন্য মূল্যবান্ উপহার কোথায় পাইবেন? বস্ত্রাঞ্চলে যে তণ্ডুল-কণাগুলি বাঁধিয়া আনিয়াছিলেন, তাহাই ভগবান্‌কে উপহার দিলেন। ভগবান্ তাহা হাত পাতিয়া লইয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। আজ রাজরাজেশ্বর দুঃখী ভিখারির প্রদত্ত তণ্ডুল-কণা অতি তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করিতে লাগিলেন। জগৎপ্রভু যে বলিয়াছেন—

"ভক্তিহীন নর সুধা দিলে পর সুধা হয়না রে।
ভক্ত জন বিষ এনে দিলে খাই"

সুতরাং ভক্তের ক্ষুদ্র উপহার তিনি উপেক্ষা করিবেন কেন? সুদামার প্রদত্ত তণ্ডুল ভগবান্ তিন গ্রাস গ্রহণ করিলেন। যাই চতুর্থ গ্রাস গ্রহণ করিবার উপক্রম করিলেন, অমি রুক্মিণী ও সত্যভামা ভগবানের হস্ত চাপিয়া ধরিলেন। বলিলেন প্রভো! প্রথম গ্রাস গ্রহণ করিয়া ভিখারিকে আপনি স্বর্গের ঐশ্বর্য্য দান করিয়াছেন, দ্বিতীয় গ্রাসে মর্ত্ত্যের ঐশ্বর্য্য, তৃতীয় গ্রাসে পাতালের ঐশ্বর্য্য এইরূপ তিন গ্রাসে ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্য প্রদান করিলেন। আর ত ভিখারিকে দিবার কোন সম্পদই বাকি রহিল না। এখন চতুর্থ গ্রাস গ্রহণ করিলে

আমাদিগকে ভিখারির সেবার জন্য যাইতে হইবে। বৈকুণ্ঠ হইতে আপনার সেবার জন্য আসিয়াছি। কোন্ অপরাধে প্রভু! এ দাসীদিগকে আপনার কাছ হইতে তাড়াইয়া দিতেছেন? ভগবান্ চতুর্থ গ্রাস গ্রহণে ক্ষান্ত হইলেন। যথাবিধি সুদামার পরিচর্য্যা চলিতে লাগিল। কিছু দিন বন্ধুর গৃহে থাকিয়া সুদামা বন্ধুর নিকট হইতে বিদায় লইলেন। রিক্তহস্তে বাড়ি ফিরিয়া চলিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, গৃহিণী বলিয়া দিয়াছিলেন, বন্ধুর নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিতে। কিন্তু তাহা ত কিছুই পারিলাম না। বন্ধুর নিকটে কেমন করিয়াই বা মুখ ফুটিয়া অর্থ ভিক্ষা করিব? তাহা ত প্রাণ থাকিতে হইবে না। এ দিকে কিছু অর্থ লইয়া না গেলেও ত গৃহিণীর হস্তে নিস্তার নাই। যাই হউক, যা অদৃষ্টে আছে তাহাই ঘটিবে। ব্রাহ্মণ এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বিমর্ষচিত্তে বাড়ি চলিলেন। বাড়ির নিকটে গিয়া দেখেন, যেখানে তাঁহার পর্ণ কুটির ছিল, তথায় এক অপূর্ব্ব অট্টালিকা দিক্ আলো করিয়া বিরাজ করিতেছে। ভগবানের অদ্ভুত কৃপা ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন কোন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা আসিয়া সেই স্থান অধিকার করিয়া তথায় এই বাড়ি প্রস্তুত করিয়াছে। ব্রাহ্মণের পর্ণ কুটির কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহার চিহ্ন মাত্র নাই। ব্রাহ্মণ পর্ণকুটিরটির জন্য নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন, মনে মনে বলিলেন, বন্ধু দর্শন করিতে গিয়া বিলক্ষণ ত ফল লাভ হইল। ঘর বাড়ি পর্য্যন্ত হারাইলাম। ব্রাহ্মণ হতাশ হইয়া এক বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলেন। এমন সময় দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রী

সেই অট্টালিকার গবাক্ষ দ্বার দিয়া উঁকি মারিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছে, ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, দুরাত্মা রাজা তাঁহার স্ত্রীকে পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছে। অতুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া আর কি গৃহিণী তাঁহাকে ভাল বাসিবেন, তাহাও কি কখনও সম্ভব? তবে ডাকিতেছে কেন? বোধ হয় কারাগারে পুরিবার জন্য। ব্রাহ্মণ ভীত হইয়া পলায়নের সঙ্কল্প করিলেন, দূর হইতে কতকগুলি লোক তাঁহাকে ধরিতে আসিতেছে, দেখিয়া তিনি উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন। বহু কষ্টে অনুচরগণ তাঁহাকে ধরিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেল। গৃহিণী সুদামাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, প্রাণেশ্বর! ভীত হইও না, শান্ত হও, এ অতুল সম্পত্তি আজ তোমারই। বন্ধুদর্শনে গিয়াছিলে, তাই এ অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছ। সুদামা বলিলেন, কৈ আমি ত তাঁহার কাছে কিছু চাহি নাই। গৃহিণী বলিলেন, তুমি যেমন তাঁহার সাক্ষাতে কিছু চাহ নাই, তিনিও তেমনই সাক্ষাতে তোমাকে কিছু দেন নাই। অন্তরের সাধ অন্তর্যামী এইরূপ পরোক্ষ ভাবেই পুরাইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণের দুটি চক্ষু দিয়া দর-বিগলিত-ধারে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল, প্রাণসখার অতুল ভালবাসা স্মরণ করিয়া ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। আজ জগৎ! ভিখারির অপূর্ব্ব সম্পত্তি দেখিয়া যাও! দেখিয়া যাও! আজ পথের কাঙ্গাল রত্নসিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন। দেখিয়া যাও, আজ পর্ণকুটির ভুবনভরা মাধুরীতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। জগৎ? যে ভিখারি তোমার কাছে উপেক্ষিত—পদদলিত, দেখিয়া যাও, আজ সেই ভিখারি দীনতার স্তূপ ভেদ করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বরণীয় হইয়া উঠিয়াছেন। ভিখারি!

জগতের টিট্‌কারি অবজ্ঞার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিও না। নানাবিধ বিপত্তির বিভীষিকায় বিকম্পিত হইও না। অবিচলিত মনে নিজ কার্য্য সাধন করিয়া যাও। বাধা বিঘ্ন নির্য্যাতন যতই বৰ্দ্ধিত হইয়া উঠিবে, জানিও তোমাকে কোলে লইবার জন্য জগন্মাতার হস্ত ততই অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। স্নেহময়ী মা ছেলেটিকে কোলে লইবার পূর্ব্বে একবার গামছা দিয়া তাহার গাত্র রগ্‌ড়াইয়া দেন, তাহার ধুলা কাদা পরিষ্কার করিয়া দেন। সাধক! সেইরূপ জগজ্জননী তোমাকে কোলে লইবার পূর্ব্বে একবার রগ্‌ড়াইয়া লইবেন। এ নিষ্পীড়নে সাধক! ভীত হইও না। জানিও এই পীড়নে তোমার যমপীড়ন বিদূরিত হইয়া গেল। এই যন্ত্রণায় তোমার সকল জ্বালা যন্ত্রণা ফুরাইয়া গেল। তাই বলি সাধক! হতাশ হইও না।

বিসর্জ্জন।*

লোকে অনেক বিষয় শুনিতে চায়--অনেক বিষয় দেখিতে চায়। যাহা দেখিবার, তাহা দেখিয়া লয়, যাহা দেখিবার নহে তাহা শুনিয়া লয়। কিন্তু যাহা অতি উপাদেয়, তাহা

---

* কাশীতল-বাহিনী ভগবতী ভাগীরথীর তটে দশাশ্বমেধ ঘাটে—ভা, অ, ধ, প্র, সভার উৎসবোপলক্ষে শত শত নরনারী পরিবেষ্টিত হইয়া জগদ্ধাত্রী পূজার বিসর্জ্জনের দিন কুমার পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন—তাহারই মর্ম্মাংশ উদ্ধৃত হইল।

লোকের দেখিবারও ইচ্ছা হয়—শুনিবারও অভিলাষ হয়। আজ আমার বক্তব্য বিষয় শুনিতে আসিয়া মহাত্মাগণ এই পুণ্য তীর্থ দশাশ্বমেধঘাটে গঙ্গার তটে দাঁড়াইয়া মা জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তির বিসর্জ্জন দেখিবেন ও আমার বক্তব্য "বিসর্জ্জন" শুনিবেন মায়ের ভুবনমোহন রূপ "দেখিয়া" মনের যে তৃপ্তি হইবে, আমার নীরস কথা শুনিয়া তত আহ্লাদ হইবার আশা নাই শ্রবণ অপেক্ষা দর্শন অধিক প্রীতিকর, তাই লোকে অদ্ভুত বিষয় শুনিবামাত্র দেখিতে চায়। দেখিলে যেমন বিষয়টি মর্ম্মে অঙ্কিত হয়, শুনিলে তত হয় না। কিন্তু অগ্রে না শুনিলে, দর্শনের সুখ হয় না, দুর্ভেদ্য তত্ত্ব বিদিত না হইলে, দর্শন করিলেও পদার্থের সার মর্ম্ম গ্রহণ করা কঠিন হয়—তাই অগ্রে শুনিতে হয় ও পশ্চাৎ দেখিতে হয়। "শ্রোতব্যং মন্তব্যং নিদিধ্যাসিতব্যং পশ্চাৎ সাক্ষাৎ কর্ত্তব্যম্।"

যাহা দেখিবার, তাহা দেখায় কে? যাহা বুঝিবার, তাহা বুঝায় কে? সপ্তর্ষিমণ্ডলী একবার ত্রিজগদ্‌গুরু কৈলাসপতির নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব শুনিবার জন্য গিয়াছিলেন। ভূতভাবন ভগবান্‌ বলিলেন, তোমরা সমাহিতচিত্তে বসিয়া তত্ত্ব বিষয় শ্রবণ কর। তাহারা সমাধিপূর্ব্বক বসিলেন, বিশ্বনাথও সমাহিত হইলেন। জগতের কাহারও কর্ণে কোন কথা প্রবেশ করিল না, কি জানি কোন্ সুরে কোন্ ভাষায় কিরূপে মহাদেব কি বুঝাইলেন, ক্ষণবিলম্বে সকলে উঠিয়া আনন্দে তাণ্ডবনৃত্য—উল্লাসে অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। আমরা জগতের ক্ষুদ্র জীব এ গুপ্ত কথার গুপ্ত প্রহেলিকা বুঝিতেও পারি না—বুঝাইতেও জানি না। সমাধিযন্ত্রের ভিতর দিয়া যাঁহারা পরমাত্মা দর্শন করিয়া থাকেন,

তাঁহারাই এ নিগূঢ় কথা ইঙ্গিতে বুঝিয়া লইবেন। আমার কথা শুনিয়া সুখী হইবার কাহারও আশা নাই।

আজ প্রথমে পূজার বাদ্য না বাজাইয়া একেবারে বিসর্জ্জনের বাদ্য বাজাইলাম কেন! পূজা না হইতেই বিসর্জ্জন একথা নূতন। আমরা কলীর জীব। পূজা অপেক্ষা বিসর্জ্জন আমরা অধিক ভালবাসি, তাই বিসর্জ্জনকালে ঘাটে এত ধূম—এতলোক সমাগম। সে দিনও তো মা দশভূজার পূজা হইয়া গেল। পূজাবাটীতে মাকে দেখিতে—মায়ের পূজা করিতে—মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে কয় জন লোক গিয়াছিল! কিন্তু প্রতিমা বিসর্জ্জনের দিন গঙ্গাব ঘাটে ঘাটে অগণ্য লোক লোকারণ্য হইয়াছিল। তাই ভাবিলাম—আজকাল আমরা পূজা অপেক্ষা বিসর্জ্জন যখন অধিক ভালবাসি, তখন পূজার কথায় আর কাজ নাই, একেবারেই বিসর্জ্জনের বাজনা বাজাইয়া দিই। মা যেন বিদায় হইলেই আমরা বাঁচি। ভক্ত যাঁহার চরণ পূজা করিবেন বলিয়া সম্বৎসর কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিয়া যত্ন করিয়া আয়োজন করেন, আমরা তাঁহার বিসর্জ্জনের দিন সুসজ্জিত হইয়া ঘাটে মাঠে তটে দাঁড়াইয়া থাকি। একেতো আমরা বিসর্জ্জন ভালবাসি—তাহাতে আবার সকলে কাশী-নিবাসী! কাশী—আনন্দ কানন হইলেও মহাশ্মশান। লোক সকল দিগ্‌দিগন্ত হইতে বিসর্জ্জনের বাজনা বাজাইয়াই কাশীতে আসে। কাশীতে শরীর বিসর্জ্জিত হইলে লোকে পুনর্ব্বিসর্জ্জনের দায় হইতে এড়াইয়া যায়। অন্য দেশে যে দেহ বিসর্জ্জন গালাগালি, এখানে তাহাই পরম মঙ্গল। সুতরাং কাশীতে পূজা অপেক্ষা বিসর্জ্জনের সম্মান অধিক। তুমি পাপ তাপের

দুর্ব্বহ ভার লইয়া জরাজীর্ণ দেহে কাশী আসিলে—বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণার পূজা করিতে পার আর নাই পার, সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে জলে স্থলে বা অন্তরীক্ষে অথবা যে কোন অবস্থায় এখানে দেহ বিসর্জ্জন করিতে পারিলেই তোমায় আর জনম মরণের বিড়ম্বনায় পড়িতে হইবে না। কীট পতঙ্গ তীর্য্যগাদি যে যোনিতে হউক এখানে একবার দেহ বিসর্জ্জন করিতে পারিলে আর তাহার বিসর্জ্জনের ভাবনা ভাবিতে হয় না, তাই বলিতেছি, এই বিশ্বনাথ-পুরীতে বিসর্জ্জনেরই মান অধিক। যেখানে বা যে কুলেই জীব জন্মগ্রহণ করুক না কেন, এইখানে মরিলেই আর জন্মিতে হয় না।

"জাতস্ত এব জগতি জন্তবঃ সাধুজীবিতাঃ।
যে পুনর্নেহ জায়ন্তে শেষা জঠরগর্দ্দভাঃ॥"

তাহারাই জগতে জন্মিয়াছে ও তাহাদের জীবনই সাধু, যাহারা আর জন্মগ্রহণ করিবে না। যাহাদিগকে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে, তাহারা গর্দ্দভী গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় ভার বহন করিতে আসে মাত্র। অতএব বিসর্জ্জন যদি এই অবিমুক্ত ধামে হয়, তবে তদপেক্ষা পূজাও শ্রেয়স্কর নহে। কেননা বহু যোগ যাগ পূজা পাঠ তপস্যাদিতেও যে "নির্ব্বাণ" সাধিত হয় না, কেবল কাশীতে দেহ বিসর্জ্জনেই তাহা অবাধে হইয়া থাকে। তাই বলি কাশীতে বিসর্জ্জনই প্রধানতম বিষয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে লিখিত আছে—

"অষ্টাঙ্গাদিভিরষ্টৈশ্চ তপো যজ্ঞ ব্রতাদিভিঃ।
সাধিতৈঃ পাক্ষিকী সিদ্ধি রবিমুক্তে নিরর্গলা।"

মা নাকি সর্ব্বত্র সর্ব্বকার্য্যের আদি অন্ত ও মধ্যে বিরাজমানা, মার নাকি যাওয়া আসা নাই—স্থিতিমাত্রই মায়ের নাকি প্রতিমা, তাই মাকে বিসর্জ্জন দিলেও আবার আমরা

বর্ষে বর্ষে তাঁহাকে দেখিতে পাই। যখন দেখি, আমাদের আঁধারময় হৃদয়াধারে মাকে আর রাখিতে পারিতেছি না, যখন দেখি হৃদয়পটে—মায়ের চিত্র আর সুস্পষ্ট লক্ষিত হয় না— তখন মনের দুঃখে শোকে অশান্তিতে অধীর হইয়া কন্যাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইবার মত বলিয়া থাকি—

"গচ্ছ গচ্ছ মহাদেবি! গচ্ছ দেবি! যদৃচ্ছয়া।
সম্বৎসরে ব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ॥"

মাকে রাখিতে না পারিলেও ছাড়িতে চাই না, তাই বর্ষে বর্ষে ডাকিতে থাকি। মায়ের বিসর্জ্জন তিরোভাব না থাকিলেও আমাদের দুর্ব্বল মনে তাঁহার আবির্ভাব তিরোভাব হইয়া থাকে। তাই তাঁহার আবাহনও বিসর্জ্জন। যতদিন ব্রহ্মাত্মবোধ দ্বারা মায়ের তৈল ধারার ন্যায় নিত্য নিরবচ্ছিন্ন একরূপ বিদ্যমানতার প্রবাহ না চলিবে, ততদিন আবাহন বিসর্জ্জন হইতে থাকিবে। যতদিন বিস্মৃতি, ভ্রান্তি, বিষয়-বুদ্ধি প্রমাদাদি থাকিবে, ততদিন আবাহন ও বিসর্জ্জন করিতেই হইবে। যাঁহারা বলেন "মন রে ভ্রান্তি তোমার—আবাহন বিসর্জ্জন কর তুমি কার।" সেই বাঙ্‌মাত্রবাদী প্রমাদীগণ কি নিত্য নিরন্তর ব্রহ্মারাধনা করিয়া থাকেন? যিনিই উপাসনা করিতে বসেন ও আবার উপাসনা করিয়া উঠিয়া গিয়া অন্য কার্য্যে লিপ্ত হয়েন, তিনিইতো বাক্যে না মানিলেও কার্য্যে আবাহন ও বিসর্জ্জন করিলেন। উপাসনার প্রারম্ভ কালই তাঁহার আবাহন, আর উপাসনা ছাড়িলেই তাঁহার বিসর্জ্জন—তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিলেই তাঁহার বিসর্জ্জন। অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেই তাঁহার বিসর্জ্জন। আমরা পূজা করি আর নাই করি,

বিসর্জ্জন করিয়া বসিয়া আছি। আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল হৃদয় হইলেই মানব বিসর্জ্জন-প্রিয় হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষীয় মহর্ষি-রাজর্ষি মুনি ও গুণীগণ সত্যযুগে বেদ-মন্ত্রে যে ভাবের উদ্বোধন করিয়াছিলেন, ত্রেতাতে কঠোর তপোযোগে যাহার প্রতিষ্ঠা ও মহাপূজা হইয়াছিল, দ্বাপরে যাহার পরিচর্য্যায় ভারতবাসী মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন, কলিযুগে আমরা অবোধ অজ্ঞানী মানবগণ তাহারই বিসর্জ্জন করিতে বসিয়াছি। ব্রহ্মচর্য্যে যাহার আয়োজন করিতে হয়, গার্হস্থ্যে যাহার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, বানপ্রস্থ্যে যাহার রসাস্বাদ করিতে হয় এবং সন্ন্যাসে যাহার পরিপাক করিতে হয়, আমরা না বুঝিয়া না বিচারিয়া তাহাই বিসর্জ্জন করিতে বসিয়াছি। মহাতেজা ব্রাহ্মণগণ যে দেবদুর্লভ মহাপূজার জ্বলন্ত জ্যোতিতে জগৎ উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন, শূরবীর প্রতাপশালী ক্ষত্রিয়বর্গ শৌর্য্যবীর্য্য সুকার্য্য দ্বারা যাহা সংরক্ষণ করিয়াছিলেন, নিজোচিত নিষ্ঠাপরায়ণ বৈশ্যবর্গ যাহার পালন-ভার স্কন্ধে লইয়াছিলেন এবং শূদ্রগণ যে মধুর হইতে সুমধুর অমৃতময়ী কল্পলতিকার সুচারু চরণের সেবা করিয়া আসিতেছিলেন, আমরা সেই কল্পলতা উৎখাত করিয়া কর্ম্মনাশার জলে বিসর্জ্জন করিতে বসিয়াছি। আর্য্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া আর্য্যদিগের প্রাণাৎ প্রিয়তর সামগ্রীকে বিসর্জ্জন করিতে আসিয়া—মায়ের বিসর্জ্জন-বাদ্য শ্রবণ করিয়া হৃদয় বড় ব্যাকুল হইয়াছে। তাই বলি, চতুর্ব্বর্ণাশ্রমিগণ! প্রাণের পুত্তলিকে—সাধের সামগ্রীকে—শাস্ত্রের বিধি বোধিত রীতিনীতি ও কর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিবেন না। আলাদীনের পুরাতন প্রদীপের ন্যায় ইহা পুরাতন

হইলেও অতি অদ্ভুত—অতি বিস্ময়জনক ও পরম সিদ্ধিদায়ক। নব্য চাক্‌চিক্যময় হাবভাব বিলাসময় যৌবন রঙ্গ-তরঙ্গ কুসঙ্গময় প্রদীপের পরিবর্ত্তে যেন সেই পুরাতন জ্বলন্ত দীপ বিসর্জ্জন করিও না। আবার ভাবি, আমরা বিসর্জ্জন না দিলেও আমাদের দুর্দ্দশাদোষে আমাদের দৌর্ব্বল্যদোষে আমরা রাখিতে পারি না বলিয়া মা বুঝি আপনিই চলিয়া যাইতেছেন।

সাধুমুখে শুনিয়াছি একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ আপনার একটি মাত্র কন্যাকে একজন সম্পত্তিশালী ক্ষিতিপাল পুত্রের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। গৃহে ব্রাহ্মণী ভিন্ন তাঁহার আর কেহ ছিল না। দরিদ্র ব্রাহ্মণ বড় ভক্তিমান্ ছিলেন; সম্বৎসর ভিক্ষা করিয়া যথা কথঞ্চিৎ দ্রব্য সংগ্রহ করিতেন ও শরদাগমে বর্ষে বর্ষে আর কিছু দিতে পারুন বা নাই পারুন, মনঃপ্রাণ ও চক্ষের প্রেমাশ্রু জল দিয়া সচন্দন বিল্বদলে মায়ের চরণ পূজা করিয়া কৃতার্থ হইতেন। স্বয়ং পূজা করিতেন ও ব্রাহ্মণী ভোগ পাক ও অন্যান্য আয়োজন করিয়া দিতেন। একবার পূজার পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণীর অতিশয় পীড়া হইল, ভোগরাগাদি প্রস্তুতির নিতান্ত নিরুপায় হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ ভাবিয়া আকুল হইলেন সম্বৎসরের বাসনা পাছে অসিদ্ধ হয় এই জন্য ব্রাহ্মণ মনে মনে বলিলেন মা! দুঃখী বলিয়া কি আমাব ঘরে আবির্ভূত হইবে না? আবার ভাবিলেন চিন্তা কি! এবার কন্যাটিকে লইয়া আসি, তবেই সমস্ত সুসম্পন্ন হইবে। বৃদ্ধ ধীরে ধীরে বৈবাহিকের ভবনে গমন করিলেন এবং কন্যাটীকে এবার পূজার সময় পাঠাইতে হইবে এই প্রার্থনা বৈবাহিকের নিকট করিলেন। ধনমদগর্ব্বিত ভূস্বামী সম্পর্ক ভুলিয়া ভক্তের মনের ঐকান্তিক

বাসনার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া বিরক্তি প্রকাশ ও তিরস্কার পূর্ব্বক বলিল; তোমার দুঃসাহস বড়! তোমার তৃণকুটীরে একটু সামান্য পূজা দেখিবার জন্য হাত পোড়াইয়া ভোগপাক করিবার জন্য পরিচারিকা-পরিসেবিতা রাজকুলবধূ রাজ গৃহের অতুল আনন্দময়ী পূজা না দেখিয়া বাটীতে কত আমোদ প্রমোদ হইবে, তাহা না দেখিয়া দীন হীনার ন্যায় তোমার বাটীতে গমন করিবেন! কখনই নহে, তুমি দ্বিতীয় বার একথা উচ্চারণ করিও না। বৈবাহিকের কথা শুনিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণের মর্ম্মে বড় আঘাত লাগিল—তথা হইতে ব্রাহ্মণ অমনি উঠিলেন, বাহিরে আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, মা! তবে কি এবার শ্রীপাদপদ্মে বিল্বদল গঙ্গাজল দিতে পাইব না। মা দাসের আশা কি পূরাইবে না, মা দীনদয়াময়ি! আমার তুমি বই আর কেউ যে নাহি মা। মা আর কি থাকিতে পারেন, ভক্ত ব্রাহ্মণকে রোরুদ্যমান দেখিয়া পথিমধ্যে একটি পুষ্করিণীর তটে দাঁড়াইয়া একটী সুসজ্জিত মেয়ে—ঠিক তাঁহারই মেয়ের রূপে তাঁহার মেয়ের কণ্ঠস্বরে বলিলেন—বাবা! তুমি কোথা গিয়াছিলে? ব্রাহ্মণ ফিরিয়া দেখিলেন, যাহার জন্য এত লাঞ্ছনা, সেই কন্যাই ডাকিতেছে। ব্রাহ্মণ দুঃখের তাবদ্বিবরণ কন্যাকে শুনাইলেন। কন্যা বলিলেন, বাবা, আপনি ভাবিবেন না। আমি চুপি চুপি তোমার বাটী যাইব ও পূজার ভোগ পাক করিয়া দিব। আপনি বাড়ী যান্। ব্রাহ্মণ বাটী গিয়া দেখেন—কন্যা পূর্ব্বেই আসিয়াছেন ও রন্ধনশালায় যথাযোগ্য সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন মা! তুমি এত শীঘ্র কেমন করিয়া আসিলে! মা বলিলেন, বাবা আমি

একটী গুপ্ত সোজাপথ (ভক্তি মার্গ) ধরিয়া আসিয়াছি। মায়ের মায়া ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারিলেন না। আজ সদ্ভক্তকল্পলতিকা মা অন্নপূর্ণা ভক্তের মেয়ে সাজিয়া ভোগ পাক করিলেন। (বুঝি সাধকের সংসারের সমস্ত ভোগ পরিপাক করিবার জন্য মার আগমন হইয়াছিল !) নিমন্ত্রিতগণ প্রসাদ পাইয়া বলিল, এমন উপাদেয় অন্ন কখনই খাই নাই। তিন দিন কাটিয়া গেল, চতুর্থ দিনে মেয়ের সাজে মা দীনদয়াময়ী বলিলেন, বাবা ! এখন তো তোমার কাজ (সাধন সিদ্ধি) হইয়া গেল, আমি চুপি চুপি চলিয়া যাই। দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কাঁদিতে কাঁদিতে মাকে বিদায় দিলেন—মনঃপ্রাণ মায়ের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিয়া গেল, ব্রাহ্মণ অচেতন হইয়া পড়িলেন, ব্রাহ্মণের চিরদিনের সাধ মিটিল—সংসার পাশ কাটিল।

অভাগ্য আমরা, তাই না শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মবিদ্যাকে জলাঞ্জলি দিতেছি—তাই না মা আজ দরিদ্রের কুটীর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন—রাখিতে কি পারিব না। মা যদি তিন দিন (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর) থাকিয়াই চতুর্থ দিনে (কলিযুগে) চলিয়া যাইবে, তবে মা ! একটি বার সম্মুখে দাঁড়াও, একবার প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লই, একবার মা বলিয়া ডাকিয়া লই—প্রাণের সাধ মিটাইয়া লই। মা ! তুমি বিসর্জ্জিত হইবার পূর্ব্বে আমরাই বিসর্জ্জিত হইব। তোমার বিসর্জ্জনের পর কি আর কাহারও অস্তিত্ব থাকে। মা ! তুমি বিদায় লইও না ; তুমি থাক, আমরাই বিদায় লই, তুমি আবার নিজ ভক্তমুখে সুমধুর স্বরে তোমার পূজা পাঠ শ্রবণ কর। সভ্যগণ ! এক্ষণে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

সাজ ও কাজ।

সমগ্র বিশ্বের জননী হইয়াও যিনি বিশ্ববিনোদিনী, স্বর্ণ যেমন কুণ্ডলাকারে পরিণত হয়, সেইরূপ যিনি আদ্যা কারণ শক্তি হইয়াও বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড রূপ কার্য্যাকারে পরিণতা, সেই মহীয়সী মূল প্রকৃতির বিস্তীর্ণ রাজ্যের অন্তরালে আমার সাজ ও কায অবগুণ্ঠিত। স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতল, চতুর্দ্দশ ভুবন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত পদার্থপুঞ্জের প্রতি রোমকূপে প্রতি অণু পরমাণুতে সাজ ও কায রক্ত মাংসের ন্যায়, অস্থি মজ্জার ন্যায় ওত প্রোত ভাবে বিজড়িত। জগতের যে দিকে তাকাই, দেখিতে পাই সর্ব্বত্র সাজ ও কায আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে। মৃত্তিকার সহিত ঘটের যেমন সম্বন্ধ, সাজ ও কাযের সেইরূপ অভেদাত্মক সম্বন্ধ বিদ্যমান। ঘট যেমন মৃত্তিকার পরিণতি, কায সেইরূপ সাজের বিস্ফুরণ বা বিকাশ। সাজ ফুল, কায তাহার ফল স্বরূপ। ফুল হইতে ফল হয়, ইহা যেমন নিত্যসত্য, সেইরূপ ফল হইতে ফুল হয়, ইহাও তেমনই অবিসম্বাদী সত্য। ফল বীজাঙ্কুরে পরিণত হইয়া বৃক্ষ হইয়া দাঁড়ায়, আবার সেই বৃক্ষই ফুল প্রসব করে। সুতরাং ফুল ও ফলের মধ্যে পরস্পর জন্য-জনক ভাব সম্বন্ধ যেমন চিরদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে,

সেইরূপ সাজ ও কাযের মধ্যে পরস্পর কার্য্য কারণ-ভাব-সম্বন্ধ অনাদি কাল হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। সাজ নহিলে কায হয় না, আবার কায নহিলেও সাজ হয় না। সুতরাং ইহার মধ্যে কে বড় কে ছোট, কে অগ্রে কে পরে হইয়াছে, তাহার নিরূপণ করিবার যো নাই।

স্থূল দৃষ্টিতে আমরা বুঝিয়া থাকি, সাজ—বেশভূষা—আভরণ কেবল বিলাস-লীলা—বাহ্যাড়ম্বর ছাড়া আর কিছুই নহে। সাংসারিক জগতে সাজ ব্যাপারটার বড়ই মলিন চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। সাজ কথাটা বলিলেই মনে হয়, যেন বিলাসরাজ্যের দারুণ পূতিগন্ধ ছাড়া আর তাহাতে কিছু নাই, অন্তঃসার-শূন্যতার প্রতিচ্ছায়া ছাড়া সাজ আর কিছুই নহে, কৃত্রিমতার আধার কেন্দ্র বলিয়া অনেকেই সাজের প্রতি ঘৃণাপূর্ণ কটাক্ষ-পাত করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাই কি ঠিক? প্রকৃতির গুপ্ত কোষের যাহা অমূল্য নিধি, তাহাকে এতটা হীনতাময় কদর্য্য চিত্রে অঙ্কিত করিতে ভরসা হয় না। প্রকৃতির অনন্ত রাজ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই, কেবলই সাজের বিচিত্র লীলা! তৃণ হইতে ব্রহ্ম লোক পর্য্যন্ত সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে প্রকৃতি কেমন স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। ঐ অনন্ত আকাশের বিস্ফারিত বক্ষোদেশে সমুজ্জ্বল নক্ষত্রমণ্ডলী প্রকৃতির ইঙ্গিতে কেমন স্তবকে স্তবকে সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। পৃথিবী পর্ব্বতাদিতে বেষ্টিত হইয়া সজ্জিত হইয়াছে, পর্ব্বত বৃক্ষ লতাদিতে বিভূষিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে, বৃক্ষ লতা ফলে ফুলে পল্লবে সুসজ্জিত হইয়া সৌন্দর্য্যের ডালি মাথায় লইয়া প্রকৃতির বিচিত্র সজ্জাপ্রিয়তার পরিচয় দিতেছে। প্রকৃতি স্বয়ং যে

সাজসজ্জাকে এত ভালবাসেন, তাহা কি অপ্রাকৃতিক—কৃত্রিম—তুচ্ছ বলিয়া উপেক্ষিত হইবার জিনিষ? মহামায়া মূল প্রকৃতি স্বহস্তে যাহা রচনা করেন, স্বয়ং যাহাকে আদর করেন, তাহা কি কেবলই বিলাসময় ব্যাপার বলিয়া তোমার আমার ঘৃণার পাত্র হইতে পারে? তিনিই প্রকৃত সাজের মূল্য বুঝেন, যিনি জগতের প্রত্যেক অণু পরমাণুকে শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে সাজাইয়াছেন। সেই অনন্ত শোভা সজ্জার সাগর হইতে উচ্ছ্বলিত বিন্দুমাত্র সজ্জা প্রাপ্ত হইয়া আমরা সজ্জিত হইয়া থাকি। প্রকৃতিই প্রকৃত সজ্জাকারিণী। আমরা জগতের ক্ষুদ্র জীব তাহারই সৌগন্ধমাত্র পাইয়া সজ্জার অভিমানে—বিলাসের গর্ব্বে ফুলিয়া উঠি। সজ্জার কমনীয় ভাস্বর দিব্য মূর্ত্তি আমাদের অধিকারের পর-পারে।

এই সংসার-নাট্যশালায় অভিনয় করিবার জন্য জীবমাত্রেই সাজিয়া আসিয়াছে। কেহ বা দেব সাজিয়া কেহ বা মানব সাজিয়া কেহ বা দানব সাজিয়া কেহ বা পশু সাজিয়া কেহ বা কীট পতঙ্গ সাজিয়া এই লীলাক্ষেত্রে লীলা করিতে আসিয়াছে। জগতের কোন সাজই মন্দ নহে। প্রয়োজনানুসারে—অবস্থানুসারে মানবকেও পশুর সাজ লইতে হয়, পশুও মানবের সাজ পরিধান করিয়া থাকে। কার্য্যানুরোধে—প্রয়োজনানুসারে সাল পাছে মলিন হয়, তজ্জন্য ছেঁড়া কাপড় দিয়া ঢাকিয়া ও বাঁধিয়া রাখিতে হয়, আবার কখনও পরিধেয় ছেঁড়া কাপড়ে পাছে নিজ মর্য্যাদার হানি হয়, তজ্জন্য লম্বা ভাল সাল দিয়া তাহা আবরণ করিতে হয়। সুতরাং কোন সাজের উপর ঘৃণা করিবার অধিকার কাহারও নাই। অবস্থাবিশেষে প্রয়োজন-

বিশেষে সকল সাজই ভাল। যাহার যে কার্য্য সাধন করিবার প্রয়োজন, তদনুযায়ী সাজ সজ্জা পরিতেই হইবে, নহিলে কার্য্যোদ্ধার হইবে কেন? প্রয়োজনানুসারে সিদ্ধ সাধুকে পশু সাজিতে হয়, আবার বানরকে মানুষ সাজাইতে হয়। একবার মহাত্মা পরমহংস শঙ্করাচার্য্যকে বর্ণাশ্রমের অতীত জানিয়া একজন যবন নিজগৃহে ভোজন করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। অভেদবুদ্ধি শঙ্করাচার্য্যও তাহাতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। পরদিন যবন মধ্যাহ্নকালে নানাবিধ পশু পক্ষীর মাংস রন্ধন করিয়া শঙ্করাচার্য্যের শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সেই সময় একটা কুক্কুর মাংস গুলা খাইবার জন্য দৌড়িয়া আসিল, গৃহস্বামী তাহাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিল। তার পর অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া যবন যখন দেখিল, শঙ্করাচার্য্য আসিলেন না তখন সে দুঃখে বড়ই ম্রিয়মাণ হইয়া শঙ্করাচার্য্যের কাছে গিয়া, না যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। শঙ্করাচার্য্য বলিলেন, আমি তো গিয়াছিলাম, তুমি যে আমাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলে। তাই ত চলিয়া আসিয়াছি। যবন বলিল কৈ আপনিত যান নাই, একটা কুক্কুর গিয়াছিল, তাহাকেই ত তাড়াইয়া দিয়াছি। শঙ্করাচার্য্য বলিলেন, আমিই সেই কুক্কুর। কুক্কুরের খাদ্য মাংসাদি কুক্কুরের পেটেই পরিপাক হইতে পারে, তাই কুক্কুর সাজিয়া গিয়াছিলাম! যবন নিরুত্তর হইয়া চলিয়া গেল। তাই বলিতেছি, সাধুকেও প্রয়োজনবিশেষে কুক্কুর সাজিতে হইল, আবার বানরকেও মানুষ সাজিতে দেখা যায়। নটদিগের নিকট নৃত্য করিবার সময় জামাজোড়া পরিয়া ছাগের উপর সোয়ার হইয়া বানর

কত মানুষের ঠাটে তামাসা করে। সুতরাং অবস্থা বিশেষে মানবে পশুভাব পশুতে মানব ভাব আবশ্যক হইয়া পড়ে। যে অবস্থার যে সাজ, তাহা না হইয়া তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলেই দূষণীয় হইয়া থাকে। যুদ্ধের সাজ পাইখানা যাইবার সময় পরিধান করিলে নিতান্তই বেমানান হয়। কেবল বেমানান নহে—ভয়ানক অসুবিধাজনক হইয়া থাকে। আবার পাইখানা যাইবার সাজ যুদ্ধের সময় পরিলে লোকে পাগল বলে। সুতরাং অবস্থা বিশেষে প্রয়োগ অনুসারে সকল সাজই কার্য্যোপযোগী হয়। কার্য্যেরও যেমন সীমা নাই সাজেরও তেমনি সীমা নাই। জগতে ভাল মন্দ বলিয়া কোন একটা জিনিষের নিরূপণ করা বড়ই কঠিন। যে দুগ্ধ সহজ শরীরে পুষ্টিজনক, যকৃৎ প্লীহায় তাহাই ভয়ানক অপকারক। যে বিষবটিকা সহজ শরীরে মৃত্যুর কারণ, বিকারে তাহাই জীবনী শক্তির বিধায়ক। সুতরাং অবস্থাই পদার্থের উপর একটা ভাল মন্দ রূপ আবরণ রচনা করে। পদার্থ স্বরূপতঃ—স্বভাবতঃ ভাল কি মন্দ, তাহা নির্ব্বাচন করিবার যো নাই। আজি যাহাকে ক্ষুদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিতেছে, অবস্থা বিশেষে তাহাই হয়ত মহান্ হইতে পারে। ঐ যে ক্ষুদ্র শিশুটি পাঠশালায় গুরু মহাশয়ের বেত্রাঘাতভয়ে থর থর কাঁপিতেছে, ঐ শিশুই হয় ত এক দিন জেলার মাজিষ্ট্রেট হইবে, তখন তাহার শাসনে সমগ্র জেলা বিকম্পিত হইবে। সুতরাং ক্ষুদ্রতা মহত্ব—ভালত্ব মন্দত্ব বস্তুর স্বরূপ-গত নহে, কিন্তু অবস্থা কর্তৃক আরোপিত হয়। বস্তুর যাহা স্বরূপ-ধর্ম্ম, তাহার কদাচ পরিবর্ত্তন হয় না; তাহা কখনও বস্তুকে ছাড়িয়া চলিয়া যায় না, সর্ব্বদা বস্তুর সহিত বিদ্যমান থাকে। সুতরাং তাহা

সত্য পদার্থ। যাহা আরোপিত ধর্ম্ম, তাহার পরিবর্ত্তন হয়, তাহা বস্তুকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়, বস্তুর সহিত সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকিতে পারে না, সুতরাং তাহা ক্ষণিক—মিথ্যা পদার্থ। স্বভাব-শুভ্র স্ফটিকের স্বচ্ছ শুভ্রতা স্বরূপধর্ম্ম, কেননা শুভ্রতা স্ফটিককে কখনও ছাড়িয়া থাকিত পারে না, কিন্তু জবাকুসুমের আভা লাগিয়া স্ফটিকে যে লৌহিত্য জন্মে সে লৌহিত্যকে আরোপিত ধর্ম্ম বলা যায়। কেননা জবাকুসুম সরাইয়া লইলেই স্ফটিকের লৌহিত্য চলিয়া যায়, স্ফটিক যে শুভ্র সেই শুভ্রই থাকে। সুতরাং স্ফটিকের লৌহিত্য মিথ্যা পদার্থ। ভালত্ব মন্দত্ব এই রূপ মিথ্যা পদার্থ অর্থাৎ স্ফটিকের শুভ্রতা যেরূপ স্বরূপগত—মর্ম্মগত সার্ব্বদিক ধর্ম্ম, ভালত্ব মন্দত্ত পদার্থের সেরূপ সত্য ধর্ম্ম নহে। সুতরাং যাহা মিথ্যা, যাহা অসৎ, সেই ভালত্বের মধুর আস্বাদ পাইবার জন্য মায়ামুগ্ধ জীব ! যদি তুমি চেষ্টা করিতে যাও, তবে আকাশের মনোহর উদ্যানে পুষ্প-রাশির সৌরভ আঘ্রাণ করিতে তোমার চেষ্টা হয় না কেন ? ভালত্বের মনোমোহন ছবি হৃদয়ে ধরিয়া যদি জীব! আশার আশ্বাসে ইতস্তত ছুটাছুটি করিতে পার তবে মরুমরীচিকায় তৃষ্ণা মিটাইবার জন্য তোমার সতত চেষ্টা হয় না কেন ? অসৎ পদার্থসম্ভোগে যদি প্রাণের পিপাসা মিটিত, তাহা হইলে স্বপ্নদৃষ্ট কামিনী সম্ভোগেও পুত্র উৎপন্ন হইত। স্বপ্নদৃষ্ট রজ্জু বাস্তবিক যেমন পুরুষকে স্পর্শ করে না, সেইরূপ মন্দত্ব পদার্থের স্বরূপকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং স্বরূপ পর্য্যালোচনা করিলে জগতের যে কোন সাজকে ঘৃণা করা কঠিন হইয়া উঠে। যে মেথরকে অতি নিকৃষ্ট জীব বলিয়া তুমি ঘৃণা করিতেছ,

স্বরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ দেখি, বাস্তবিকই সে ঘৃণার পাত্র কি না? মেথর পাঁচ টাকা মাহিনার চাকরি করে, তুমি না হয় পাঁচ হাজার টাকার মাহিনার চাক্‌রি কর, কিন্তু মেথর যেমন চাকর, তুমিও ত তেম্‌নি চাকর। কার্য্যের ত্রুটি হইলে প্রভুর কাছে মেথরকে যেমন গালাগালি খাইতে হয়, তোমাকেও ত প্রভুর কাছে তেমনি তিরস্কার লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়। বরং তাহাতে তোমার মর্ম্মান্তিক বেদনা অধিক হইয়া থাকে। সুতরাং দাসত্ব সম্বন্ধে মেথর ও তোমায় কিছু মাত্র ইতর বিশেষ আছে কি? তুমি বলিতেছ, বিষ্ঠা সাফ করা মেথরের বৃত্তিটা বড়ই জঘন্য, সুতরাং ঘৃণার পাত্র বৈ কি? আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাই, বিষ্ঠা পরিষ্কার করিলেই যদি মেথরের ন্যায় ঘৃণার পাত্র হইতে হয়, তাহা হইলে তুমি নিজেই যে ঘৃণার পাত্র হইয়া দাঁড়াও। বিষ্ঠাত্যাগের সময় তুমিও ত জল শৌচ দ্বারা মল মার্জ্জনা করিয়া থাক। জগতের প্রত্যেক নর নারীই ত মহারাজা বা মহারাণীই হউক না কেন, কিঞ্চিৎ পরিমাণে সকলেই মেথরের কার্য্য করিয়া থাকেন। তাহারা কি সকলেই ঘৃণার পাত্র! সুতরাং তোমা অপেক্ষাও উচ্চশ্রেণীর মানব যে কার্য্য সাধন করিয়া থাকে, সেই বিষ্ঠা সাফ্ করাটা যে স্বরূপতঃ মন্দ কার্য্য, তাহা ত তুমি প্রমাণিত করিতে পার না? যদি বল পরের বিষ্ঠা সাফ্ করাই ঘৃণিত কার্য্য, আমরা সকলেই নিজের বিষ্ঠা সাফ্ করিয়া থাকি, তাহাতে দোষ নাই। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে জগতের প্রত্যেক মাতা, যাঁহারা নিজ শিশুর বিষ্ঠা সাফ্ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই ত তোমার মতে মেথরের ন্যায় ঘৃণিত হওয়া উচিত। আজ স্ত্রী ছেলে পিলের

বিষ্ঠা-পরিষ্কাররূপ যে মেথরগিরি করিয়াও তোমার সোহাগের সম্ভাষণ—আদরের আলিঙ্গন পাইল, সেই বিষ্ঠা-পরিষ্কাররূপ কার্য্য করিয়াই মেথর তোমার উৎকট ঘৃণার পাত্র হইল, ইহা বড়ই বিচিত্র কথা। আজ যে হস্তে বিষ্ঠা পরিষ্কৃত হইয়া থাকে, সেই হস্তেই দেব পূজার জন্য পুষ্পসম্ভার সজ্জিত হইয়া থাকে, সেই হস্তেই ভোজনের সমস্ত সামগ্রী প্রস্তুত হইয়া থাকে, সুতরাং স্বরূপত বিষ্ঠা সাফ করা কার্য্যটা যে মন্দ, তাহা কিছুতেই প্রতিপন্ন হয় না। আবার ইহা অতি আবশ্যকীয় ও পরোপকার-জনক। কেননা, যদি ২।৪ দিন সহরের বিষ্ঠা পরিষ্কৃত ও পরিমার্জ্জিত না হয়, তবে অমনি নানা উৎকট পীড়ায় কত শত মানব পীড়িত হইয়া পড়ে ও মরিয়া যায়। যে কার্য্যটা জীবের এত মহোপকারক, তাহাকে তুমি মন্দ বলিবে কিরূপে? যে চিকিৎসক তোমার পুঁজ রক্তক্লেদভরা ফোড়াটী কাটিয়া ধোয়াইয়া পুছাইয়া পরিষ্কার করিয়া দেন, তাঁহার কার্য্যটা কি অতিহেয় না তোমার বিশেষ প্রার্থিত ও অতি উপাদেয়? তাই পূর্ব্বে বলিয়াছি, স্বরূপ পর্য্যালোচনা করিলে জগতের যে কোন সাজের প্রতি ঘৃণা করা কঠিন হইয়া উঠে। এই সংসার-অভিনয়-ক্ষেত্রে ভগবান্ প্রত্যেককেই সাজাইয়া পাঠাইয়াছেন। যে যে সাজ পরিয়া যেরূপ অভিনয়ের ভার পাইয়াছে, সে সেই সাজের উপযোগী অভিনয় করিলেই সাজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। যে যে পোষাক পরিয়া আসিয়াছে, সে তদনুযায়ী কার্য্য করিলেই প্রকৃতির ইঙ্গিত প্রতিপালন করা হয়। যে মনুষ্যের পোষাক পরিয়া আসিয়াছে, সে মনুষ্যের কার্য্য করুক, যে পশুর পোষাক পরিয়া আসিয়াছে, সে পশুর কার্য্য করুক, ইহাই প্রাকৃতিকী

উন্নতির পন্থা। যে সাত্ত্বিকী বৃত্তি লইয়া আসিয়াছে, সে সাত্ত্বিকী বৃত্তির কর্ষণ করিয়া যাউক, যে রাজসিক বৃত্তি লইয়া আসিয়াছে, সে রাজসিক বৃত্তির পরিস্ফুরণ করিয়া জগন্মাতাকে উপহার দান করুক, ইহাই প্রকৃতির নিদেশ। তামস প্রকৃতির পরিচ্ছদে যে আসিয়াছে, সে তমোগুণের উপাদানে তামস উপচারে তামস প্রকৃতির পরা কাষ্ঠায় উপহার লইয়া তিমিরনাশিনী মা'র চরণে উপনীত হউক, তামসিকী বৃত্তির পূর্ণতা রূপ সংহার রূপিণীকে যে মুহূর্ত্তে প্রাপ্ত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই রাজসিকী বৃত্তি তাহাকে আশ্রয় করিবে আবার যে মুহূর্ত্তে রাজসিকী বৃত্তির চূড়ান্ত উন্নতির ক্ষেত্রে পৌছিবে, সেই মুহূর্ত্তে সাত্ত্বিকী বৃত্তি তাহার শরণ লইবে। আবার মানব যে মুহূর্ত্তে নিজ সাত্ত্বিকী বৃত্তির পরা কাষ্ঠায় পৌছিবেন, সেই মুহূর্ত্তেই দেব ভাব তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবে। সুতরাং যে যে সাজ পরিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে সেই সাজের উপযুক্ত কার্য্য অর্থাৎ তাহার শারীরিক মানসিক প্রকৃতিগত বৃত্তির পরিচালনা করিলেই প্রকৃতি তাহার হাত ধরিয়া উন্নতির ক্রমিক সোপানে পৌছাইয়া দিবেন। কীট নিজ প্রকৃতি উন্নতি করিলে পশু হইবে, পশু বানর হইবে, বানর মানব হইবে, মানব দেবতা হইবে, দেবতা ব্রহ্মলোকবাসী হইবেন, ব্রহ্মলোকবাসী সাযুজ্য মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া এইরূপ চতুরশীতি লক্ষ যোনি ক্রমশঃ অতিক্রম করিয়া উন্নতির পরা কাষ্ঠায় পৌছিবেন। সুতরাং প্রকৃতি যে সমস্ত সাজ আমাদিগকে দিয়াছেন; তাহা আমাদের কার্য্যেরই অনুকূল সাজ নহিলে কাজ হইবার যো নাই। তাই শঙ্করাচার্য্যকে মাংস ভোজনরূপ কার্য্য করিতে কুকুরের সাজ লইতে হইয়াছিল, মা জানকীকে

লঙ্কায় লইয়া যাইবার জন্য রাক্ষস রাবণকে তপস্বী সাজিতে হইয়াছিল। আবার তপস্বী পরশুরামকে বসুন্ধরা নিঃক্ষত্রিয় করিবার জন্য রাক্ষসী প্রকৃতির সাজ লইতে হইয়াছিল। সুতরাং জগতে সকল সাজেরই প্রয়োজন আছে। তোমার সাজ ভাল আমার সাজ মন্দ, এইরূপ একটা ভালত্ব মন্দত্বের জটলা তুলিয়া বৃথা গণ্ডগোল করা উচিত নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভালত্ব মন্দত্ব অসৎপদার্থ, স্বপ্নের ন্যায় ভোজ বাজির ন্যায় অলীক পদার্থ, সুতরাং জগতে ভালও নাই মন্দও নাই। অতএব তুমি আপনাকে মন্দ বলিয়া দমিয়া যাইবার কারণ নাই, আবার তুমি ভাল বলিয়া অহঙ্কারে ফুসিয়া উঠিবার কোন কারণই নাই। তুমি পণ্ডিত সাজিয়া আসিয়াছ, আমি মূর্খ হইয়া আসিয়াছি, তুমি ধনী হইয়া আসিয়াছ, আমি দীন দরিদ্র দুঃখী হইয়া আসিয়াছি। কেহ স্ত্রী সাজিয়াছে, কেহ পুরুষ সাজিয়াছে, বিশ্ববিধাতার এ বিশাল অভিনয়ক্ষেত্রে পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র বাবু মেথর স্ত্রী পুরুষ সকল সাজেরই প্রয়োজন আছে। কীটানুকীট হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই তাঁহার কার্য্য সাধন করিতে আসিয়াছে। বিদ্যা বুদ্ধির অভিমান ছাড়িয়া দাও, ধন, মান, সম্ভ্রমের গর্ব্ব—অহঙ্কার দূরে রাখিয়া দাও? নিজ নিজ চাক্‌চিক্যময় সাজের গর্ব্ব আমাদের কাছে দেখাইলে কি হইবে? যাঁহার কাছে অভিনয় দেখাইবার জন্য সাজিয়া আসিয়াছ, তাঁহার কাছে সেই সাজের উপযোগী কাজের পরিচয় দাও। জগতের কাছে নিজ নিজ উত্তম পোষাকের বাহার দিয়া অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠিলে কি হইবে, যিনি তোমায় এ বিশ্বরঙ্গভূমে সাজাইয়া পাঠাইয়াছেন, সেই রঙ্গভূমির অধিনেতা যদি তোমার

সাজের উপযুক্ত অভিনয় দেখিয়া বাহবা দেন,—তিনি যদি তোমায় পুরস্কার দেন, তবেই জানিও, তোমার সাজ সার্থক হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাজ নহিলে কাজ হয় না। যদি কার্য্য সাধন করিতে চাও ত, অগ্রে সজ্জিত হও, ইহা চিন্তাশীলদিগের সিদ্ধান্তিত কথা। তাই লোকে চলিত কথায় বলিয়া থাকে, "যদি থাকে কাজ, তবে আগে সাজ।" অগ্রে বিদ্যার্থী হও, পরে বিদ্যা অধ্যয়ন করিও। অগ্রে শিষ্য হও, পরে গুরুগৃহে পাঠ স্বীকার করিতে ভরসা করিও। অগ্রে সাধু হও, পরে ব্রহ্মবিচারণা করিও। দেশ, কাল পাত্র অনুসারে সাজিতে হয়। যে স্থানে যেমন সাজটি মানায়, তাহা না করিলে উপহাসাস্পদ হইতে হয়। যদি কোন রমণী বুকের হার পায়ে পরিয়া, পায়ের মল দুগাছি বুকে ঝুলাইয়া দেন, তাহা হইলে লোকে তাহাকে পাগল বলে। এইরূপ সময় অনুসারেও সাজিতে হয়। সময় অনুসারে লগ্ন অনুসারে না সাজিলে নিতান্তই বেতালা হয়। প্রকৃতি সময় অনুসারে যে রাগরাগিণী সুর বাঁধিয়া দিয়াছেন, তদনুসারে সুর তালের সাজ সরঞ্জাম আয়োজন না করিয়া গান গাহিলে প্রকৃতি তাহাতে চটিয়া যান। প্রাতঃকালে যদি কেহ বেহাগের সুরে গান ধরে, তাহা হইলে আনাড়ি লোকে হয় ত তাহাতে বাহবা দিতে পারে, কিন্তু স্বরতত্ত্বজ্ঞ লোক তাহাতে বিরক্ত হয়েন। যে সময়ের যে রাগিণী, যে সুর, তদনুসারে গান গাহিলে শিশু পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়া তাহাতে ঘাড় নাড়িয়া তাল দিতে থাকে, কেননা প্রকৃতি সে গানে সন্তুষ্ট হন। আমরা জগতে আসিয়া যে জীবনগান গাহিতেছি, বাহিরের বাজে লোকে তাহাতে বাহবা দিলেও

তাহাতে সন্তুপ্ত হওয়া উচিত নহে, প্রকৃতি সে গানে সন্তুষ্ট হইতেছেন কি না তাহা দেখা উচিত। প্রকৃতি আমাদিগকে যে সাজে সাজাইয়া এ সংসারক্ষেত্রে পাঠাইয়াছেন, আমরা সেই সাজের উপযুক্ত গান গাহিতেছি কি না তাহা ভাবা উচিত। কোন নাট্যশালায় প্রহ্লাদ সাজিয়া আসিয়া যদি কেহ ঠুংরি সুরে খেম্‌টার গান গায়, তাহাতে বাহিরের বাজে লোক বাহবা দিলেও নাট্যশালার বুদ্ধিমান্ অভিনয়শিক্ষক তাহাতে চটিয়া যান। সেই প্রহ্লাদের বেশধারী অভিনেতা ব্যক্তি অভিনয় সাঙ্গ করিয়া যখন পর্দ্দার ভিতরে চলিয়া যায়, তখন শিক্ষক তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলেন, তোমাকে প্রহ্লাদ সাজাইয়া পাঠাইলাম, তুমি অভিনয় করিয়া আসিলে খেম্‌টাওয়ালির? বড়ই অন্যায় করিয়াছ, তোমাকে ইহার জন্য শাস্তি পাইতে হইবে। সেইরূপ প্রকৃতির নিকট হইতে এ সংসারক্ষেত্রে আমরা কেহ বা মানব সাজিয়া, কেহ বা দেবতা সাজিয়া, কেহ বা মাতা কেহ বা পিতা সাজিয়া কেহ বা স্বদেশপ্রেমিক সাজিয়া কেহ বা ধর্ম্মপ্রচারক সাজিয়া আসিয়াছি। আমরা মনে করিতেছি, না জানি আমরা জগতের কি গুরুতর কার্য্য সাধন করিতেছি। বাহিরের লোকে আমাদের অভিনয় দেখিয়া কতই না বাহবা দিতেছে। কিন্তু যিনি এই রঙ্গভূমির গুপ্ত অন্তরালে বিরাজ করিতেছেন, সেই ত্রিজগদ্‌গুরু আমাদিগকে হয় ত পশু মনে করিতেছেন। অভিনয় সাঙ্গ হইলে—জগতের পটক্ষেপ হইয়া গেলে যখন তাঁহার কাছে পৌঁছিব, তখন তিনি রোষকষায়িত-নেত্রে তিরস্কার করিয়া যখন বলিবেন, "তোমাদিগকে সাজাইয়া পাঠাইলাম "মানব", তোমরা করিয়া আসিলে পশুর

অভিনয়! তোমরা শাস্তির যোগ্য”, তখন উপায় কি? তাই বলি, বাহিরের লোকের প্রশংসায় ভুলিলে চলিবে না, নিজের সাজ অনুসারে কতটুকু কাজ করিতেছি, তাহা প্রত্যেকেরই চিন্তা করা উচিত।

সংসারে সেই সাজিয়াছে, যে আপনার কায বাজাইয়াছে। তাহারই সাজ সার্থক, যাহাকে আর সাজিতে হইবে না। প্রকৃতি আমাদিগকে মানব সাজাইয়া পাঠাইয়াছেন, সেই দিন আমাদের শুভদিন, সেই দিন আমাদের মানব সাজ সার্থক, যে দিন এই সাজের পর আর অন্য সাজ গ্রহণ কারয়া আর জঠর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। আর দেহান্তর জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হইবে না। হতভাগ্য আমরা এমন দিব্য সাজ পাইয়াও ইহার মূল্য বুঝিলাম না। অপব্যবহারে এই হীরক-খচিত মণিমুক্তাবিজড়িত (নানাবিধ সুবৃত্তিপূর্ণ) সাজের সমুজ্জ্বল মূর্ত্তিকে মলিন করিয়া ফেলিতেছি। সংসারে মানব সাজিয়া আসিয়া পাশব গান গাহিতেছি। সুতরাং সাজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কেন? সাজের অনুপযুক্ত গান গাহিলে নিতান্তই কদর্য্য হয়। তাহাতে বাহবা পাইলেও তাহা অকিঞ্চিৎকর। আজ কাল যাত্রার দলে এইরূপ জঘন্য অভিনয়ের আধিপত্য দেখিলে দুঃখিত হইতে হয়। মা যশোদা সাজিয়া আসিয়া বাবুদের অনুরোধে অভিনেতাকে যদি খেম্‌টা নাচ নাচিতে হয়, তাহা হইলে তাহা বড়ই বিসদৃশ। যিনি শ্রীকৃষ্ণের মাতা সাজিয়াছেন, তাঁহাকে তদুচিত গাম্ভীর্য্য হইতে স্খলিত করিয়া সামান্য বাইজির ভাব তাঁহাতে আরোপিত করিলে অভিনয়তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির প্রাণে নিতান্তই বেদনা উপস্থিত হয়। যাত্রাওয়ালার কল্যাণে ব্যাসদেব বাসদেব

ও শুকদেবকে কাশদেবের সং এবং নারদকে কেবল ঝগড়া বাধাইবার গুরু হইতে হইয়াছে। যিনি হিন্দুর পূজনীয় দেবর্ষি, তিনি আজ যাত্রাওয়ালাদের খর্পরে পড়িয়া একটা কিম্ভূত কিমাকার বিসদৃশরূপে সাধারণে পরিচিত হইলেন, এইরূপ বিকৃত অভিনয়ে বাহিরের বাজে লোকে হো হো হাঁসিয়া বাহবা দেয় বটে, কিন্তু অভিনয়তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি তাহাতে ক্ষুণ্ণ ও অপ্রসন্ন হয়েন। সেই ব্যক্তিই প্রকৃত অভিনেতা, যিনি সাজের উদ্দেশ্য রক্ষা করিয়া অভিনয় করিতে পারেন। সাজের উপযোগী কার্য্য করাই জীবের জীবনের ভিত্তিভূমি হওয়া উচিত। প্রকৃতি আমাদিগকে মানব সাজাইয়া পাঠাইয়াছেন। যে মানবজাতি এক দিন পৃথিবীকে স্বর্গরাজ্যের সহিত ঘনিষ্ঠতার বন্ধনে বাঁধিয়াছিলেন, যে মানবদিগের আহ্বানে দেবতাগণ দৌড়িয়া আসিয়া যজ্ঞ-ভাগ পুরোডাশ গ্রহণ করিতেন, যে মানবদিগের প্রবল প্রতাপে ত্রিভুবন বিকম্পিত হইত, যে মানবগণ একদিন ক্রুদ্ধ হইয়া স্বতন্ত্র ইন্দ্রপদবী সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেই মর্ত্ত্যধামনিবাসী মানব হইয়া সেই পবিত্র মানব সাজ গ্রহণ করিয়া, আমরা সেই মানবসাজের উপযুক্ত অভিনয়কে জীবনের ভিত্তিভূমি করিতে পারিলাম না, হা! দুরদৃষ্ট আমাদের! আর্য্য-কুল-শিশু সাজিয়া আসিয়া আমরা ম্লেচ্ছ ও যবনের গান গাহিয়া জীবন কাটাইতেছি, যাহা অভিনয় করিতে আসিয়াছি, তাহা হইল না, বাহিরের বাজে কাযে কেবল দিন কাটিয়া যাইতেছে! যখন অভিনয় সাঙ্গ হইবে, যখন এ জীবন-গান ফুরাইয়া যাইবে, যখন এ বিশ্বরঙ্গভূমির দৃশ্যপটের অন্তরালে অনন্ত নাট্যরস-লীলাময়ী প্রকৃতির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইব, তখন তিনি যখন

বলিবেন বৎস! তোমায় বিচিত্র অলঙ্কারে রাজবালক সাজাইয়া পাঠাইলাম, তুমি সে অলঙ্কারগুলি হারাইয়া গায়ে ধূলা কাদা মাখিয়া রাখালবালক হইয়া আসিলে কেন? তখন কোন্ মুখে তাঁহার কাছে উত্তর দিব! মা যেমন করিয়া সাজাইতে হয়, তেমনই আমাদিগকে সাজাইয়াছেন। একটু ত্রুটি নাই, একটু খুঁত নাই, এমন নিখুঁত, এমন সুন্দর মানুষে কি সাজাইতে পারে? মানুষের প্রদত্ত সাজ বস্ত্রাদি বেশী দিন টিকে না শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু মায়ের প্রদত্ত সাজ (মানব পশু আদি দেহ) যত দিন কাজ (মুক্তি) না হয়, ততদিন ফুরায় না। যদি তুমি মানব হইয়া মানবের কায না করিয়া পশুর কায কর, তবে আবার কাযের মত তোমাকে পশুর সাজ ধারণ করিতে হইবে। তোমাকে পশু হইয়া জন্মিতে হইবে। যতদিন তোমার কার্য্য সাধিত না হইবে, ততদিন তোমাকে অশীতি লক্ষ যোনিতে একটার পর আর একটা সাজ গ্রহণ করিতেই হইবে।

কার্য্যের জন্যই আমরা সাজ পাইয়াছি। সাজ না থাকিলে কায হইতে পারে না, তাই প্রকৃতির নিদেশে বিচিত্র বিচিত্র কার্য্য করিবার জন্যই আমরা বিচিত্র বিচিত্র সাজ পাইয়াছি! দয়াময়ী প্রকৃতি আমাদের কার্য্য সাধনের অনুকুলতা হইবে বলিয়াই আমাদিগকে সাজ দিয়াছেন। কিন্তু গ্রহবৈগুণ্যে সাজ আমাদের কার্য্য সাধনের প্রতিকুল হইয়া পড়িয়াছে। যে সাজ লইয়া কার্য্য সাধন করিতে হয়, তাহাই আমাদের কার্য্যে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্থলে একটা গল্প মনে হইতেছে। কোন জমীদারের বাড়িতে একজন

হিন্দুস্থানী দ্বারবান্ নিযুক্ত ছিল। দ্বারবান্টা কিছু নির্ব্বোধ ছিল। কিন্তু যাহা হউক ঢাল তলয়ার লইয়া তাহাকে সমস্ত রাত্রি জমীদার বাবুর বাড়িতে পাহারা দিতে হইত। একদিন রাত্রে বাবুর বাড়িতে চোর চুরি করিতে প্রবেশ করিল, দ্বারবান্ তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিল, চোর তাহা না শুনিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া স্বচ্ছন্দে স্বকার্য্য সাধন করিয়া চলিয়া গেল। জমীদার বাবু জাগ্রত হইয়া দ্বারবান্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেঁউ চোবেজি! রাতকো চোরি হুয়া, তুমে খবর, নহি? দ্বাববান্ বলিল, কেঁউ নহি মহারাজ! মঁয় রাত ভর ঢার তরবার লিয়ে হুয়ে টহলতা রহতা হুঁ, চোব মেরে সাম্নেহী চোরি করকে নিকল গয়া! জমীদার বলিলেন, তুম্ উস্কো কেঁউ নহীঁ পক্ড়ে হো? দ্বারবান্ বলিল, মহারাজ, মঁয় পকড়ু ক্যাসে, মেরে এক হাত মে তরবার, দুস্রে মে ঢার থা—দোনোহী হাত বন্ধ্। পকড়নে কা মৌকা নহীঁ মিলা।” জমীদার চোবেজির উত্তর শুনিয়া অবাক্ হইলেন। জমীদার বাবু চোর-ধরারূপ কার্য্য সাধন করিবার জন্য প্রহরীকে ঢাল তলয়ার আদি সাজ দিয়াছিলেন, কিন্তু প্রহরী এমনই বাহাদুর পুরুষ, যে সেই সাজই তাহার কাষের প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইল। ঢাল তলয়ারে তাহার হাত দুইটি যোড়া হওয়ায় সে আর চোর ধরিতে পারিল না। সেইরূপ প্রকৃতি নিজ নিজ কার্য্য সাধন করিবার জন্যই আমাদিগকে স্ত্রী দিয়াছেন, পুত্র দিয়াছেন, ঘরকন্না দিয়াছেন, কত দিব্য সাজে আমাদিগকে সাজাইয়া দিয়াছেন. এই মনোহর সাজ পাইয়া এ কর্ম্মক্ষেত্রে কোথায় নিজ কার্য্য সাধন করিয়া লইব, কিন্তু হায়! তাহা না হইয়া দুর্বুদ্ধিদোষে এই সাজ-

গুলিকেই নিজ কার্য্যের প্রতিবন্ধক করিয়া ফেলিয়াছি। চোবে-
জির ঢাল তলয়ার যেমন চোরধরারূপ কার্য্যের প্রতিবন্ধক
হইয়াছিল, আমাদের গৃহ পরিবার আদি সাজ অজ্ঞানরূপ চোর
ধরিবার পক্ষে সেইরূপ প্রতিবন্ধক হইয়া পড়িয়াছে। স্ত্রী বল,
পুত্র বল, মায়া মমতা আসক্তি কাম ক্রোধ লোভ আদি যাহা
কিছু বল, ভগবান্ কোন সাজই আমাদিগকে কুৎসিত দেন
নাই। যাহা সুন্দর, যাহা মধুর, যাহা ললিত ললাম, তাহাই
বাছিয়া বাছিয়া জগতের প্রভু আমাদিগকে দান করিয়াছেন।
স্ত্রীকে পাইয়াছি কেবল ভোগ-লীলা চরিতার্থ করিবার জন্য
নহে, কিন্তু প্রভুর প্রতি ভালবাসার বীজ অঙ্কুরিত করিবার
জন্য। পুত্র পাইয়াছি কেবল তাহার উপার্জ্জিত অর্থ ভোগ
করিবার জন্য নহে, কিন্তু বাৎসল্যরসের ভিতর দিয়া তাঁহাকে
পাইবার জন্য। মায়া মমতা আসক্তি পাইয়াছি বন্ধনের জন্য
নহে, কিন্তু ভগবান্‌কে আপনার ভাবিয়া তাঁহারই ভাবরসে
ডুবিবার জন্য। কামবৃত্তি পাইয়াছি, কেবল কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ
করিবাব জন্য নহে, কিন্তু শ্রীরাধিকার মত—যোগীদিগের মত
রতিশক্তি তাঁহাতেই পর্য্যবসিত করিবার জন্য। ক্রোধ বৃত্তি
পাইয়াছি, পরের প্রতি প্রয়োগ করিবার জন্য নহে, কিন্তু
কলুষদূষিত নিজের মনকে ভর্ৎসনা করিবার জন্য, লোভ পাই-
য়াছি, পরের দ্রব্যের জন্য নহে, কিন্তু ভগবদ্ গুণানুবাদে আকৃষ্ট
হইবার জন্য। সেইরূপ আসক্তি মমতা যাহা কিছু পাইয়াছি,
সমস্তই নিজের মঙ্গলের জন্য। কিন্তু দুর্বুদ্ধি দোষে আমরা
তাহার দ্বারাই ঘোর অমঙ্গলের দ্বার উদ্ঘাটন করিতেছি। যে
মমতা বা আসক্তি তোমাকে আমাকে সংসারের দাস করে,

অর্থের জন্য পিশাচ করিয়া তুলে, সেই মমতাই গভীর জ্ঞানীর হৃদয়স্থ হইয়া তাঁহাকে জ্ঞানরাজ্যের সেবক—ভগবৎ প্রেমাসক্ত করিয়া তুলে। যে মমতা বা ভালবাসা কামুককে কামিনী-সমাগমের পিপাসু করে, সেই ভালবাসাই প্রেমিক ভক্তকে ভগবৎপদপঙ্কজের পীযূষপানার্থ পাগল করিয়া দেয়। যে বৃষ্টির বারিবিন্দু নিম্ববৃক্ষে পতিত হইয়া তিক্তরসে পরিণত হয়, সেই বারিবিন্দুই পক্ক আম্রফলে সুস্বাদু রসের সৃষ্টি করে। যে প্রস্ফুটিত কুসুম বিলাসীর হাতে পড়িলে বাইজির শিরোদেশে শোভিত হয়, সেই কুসুম সাধু উপাসকের হাতে পড়িলে দেবতার চরণতলে উৎসর্গীকৃত হয়। যে গঙ্গার জল শুঁড়ির হাতে পড়িলে মদ্যে পরিণত হয়, ভগবৎ সেবকের হাতে পড়িলে সেই গঙ্গার জল দেবতার চরণামৃত হইয়া দাঁড়ায়। মায়া মমতা স্বভাবত বাস্তবিকই গঙ্গার জল, সংসার-কীটের বিলাস-ভাণ্ডারে পড়িয়া উহা মাদকতায় পরিণত হয়। সাধুর কমণ্ডলুতে পড়িয়া উহা দেবতার চরণে নিবেদিত হয়। নারিকেলজল কাংস্য-পাত্রে রাখিলে মদ হইয়া যায়, তাহার মধুরতা মিষ্টতা বিকৃত হইয়া যায়, সেইরূপ মায়া মমতা সংসারে আবদ্ধ রাখিলে মোহময়ী মদিরা হইয়া দাঁড়ায়। আবার তাহাকেই ভগবানের চরণে ঢালিয়া দিলে তাহাই অমৃত (ভক্তি) হইয়া যায়। সুতরাং প্রকৃতির কাছ হইতে আমরা যে যে সাজগুলি পাইয়াছি তাহাদের মধ্যে স্বরূপত একটিও মন্দ নহে। সমস্তই আমাদের কার্য্য সাধনের অনুকূল। কি জানি কেন, যাহা আমাদের পক্ষে অমৃত, তাহাকেই হলাহল করিয়া ফেলিয়াছি, যাহা চন্দন, তাহাকে বিষ্ঠা করিয়া ফেলিয়াছি। আমরা দিব্যধামের মাধুরী-

মাখা সামগ্রীকে নরককুণ্ডে ভাসাইয়া দিয়াছি। ব্যবহারদোষে সাগরসেঁচা মাণিককে আমরা ধূলিধূসরিত করিয়াছি, নির্ম্মল শারদীয় শশধরে গাঢ় কলঙ্ক কালিমার প্রলেপ দিয়াছি। স্বর্গীয় সৌদামিনীর জ্বলন্ত দ্যুতিকে অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার করিয়া ফেলিয়াছি। ব্যবহার করিতে জানি না বলিয়াই সাজ গোজ আমাদের বন্ধনের কারণ হইয়াছে। পুষ্পমালা আমাদের নাগ-পাশ হইয়াছে। এমনই আমাদের দুরদৃষ্ট।

সাজ নহিলে কায হয় না, আবার কায নহিলেও সাজ হয় না, সুতরাং সাজও চাই, কাযও চাই। কলকণ্ঠী বাইজি এক-খানা কুৎসিত কদাকার ছেঁড়া কাপড় পরিয়া গান গাহিলে তাহা কাহারও ভাল লাগে না, আবার মহামূল্যবেশ-বিন্যাস-শালিনী বাইজি কটুকণ্ঠে গান গাহিলে তাহাও কাহারও ভাল লাগে না। হাব ভাব কটাক্ষাদি সহিত সুন্দর বেশ ও মিঠে গলার একত্র সমাবেশ করিতে পারিলে তবে বাইজি আসর মুগ্ধ করিতে পারেন। সাজ পদার্থের সৌন্দর্য্যের ফোয়ারা খুলিয়া দেয়। সাজ না থাকিলে পদার্থ শ্রীহীন হইয়া যায়, পদার্থের মাধুরী কোথায় চলিয়া যায়। পদার্থের গৌরব দূরে পলায়ন করে। প্রকৃতি ফলে ফুলে পল্লবে যতক্ষণ বৃক্ষটিকে সাজাইয়া রাখেন, ততক্ষণই তাহার আদর। তাহার ফুলের সৌরভে ও পল্লবের সুশীতল ছায়ায় দেহমনঃপ্রাণ সুশীতল করিবার জন্য, তাহার ফলের আস্বাদ লইবার জন্য কত লোকে দৌড়িয়া আসে, কিন্তু যখন তাহার ফল ফুল পল্লবগুলি ঝরিয়া যায়, তখন কেহই তাহার দিকে ফিরিয়াও তাকায় না। সুতরাং সাজই পদার্থের গুরুত্ব ও উপাদেয়তা জন্মাইয়া থাকে। যাহারা সাজ

গোজ—বেশভূষাকে বিলাসলীলা বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সহিত আমি একমত হইতে পারি না। সাজ জিনিষটা মন্দ—অপবিত্র হইলে দেবতারা তাহা গ্রহণ করিবেন কেন? দেব দেবীর স্তব পাঠ কালে দেখিতে পাই, তাঁহাদের কত বিচিত্র বেশ ভূষার উল্লেখ রহিয়াছে! কাহারও বা শঙ্খ চক্র কৌস্তুভ মণি আদি নানা রত্নালঙ্কার, কাহারও বা খড়্গ খট্টাঙ্গ আদি বিচিত্র সাজ সজ্জার উল্লেখ দেখিতে পাই। অমন যে মহা যোগীন্দ্র পুরুষ শ্মশানবাসী মহাদেব, তাঁহারও ত্রিশূল, নাগমালা, ধুস্তুর কুসুমাদি রহিয়াছে। যখন সজ্জাকে দেবতারাও আদর করিয়াছেন, তখন তাহা স্বরূপতঃ মন্দ পদার্থ নহে। কেবল সজ্জার ব্যতিক্রম হইলেই—সজ্জার অমর্য্যাদা হইলেই নিন্দনীয় হইয়া থাকে। বিধবার যাহা সাজ সজ্জা, তাহা বিধবার পক্ষেই সুশোভন, সধবার যাহা সাজ সজ্জা অলঙ্কারাদি, তাহা সধবার পক্ষেই রমণীয়। ব্যতিক্রম হইলেই দূষণীয় হইয়া থাকে। শিশুকে অলঙ্কারে সাজান গোজান দেখিলে তাহাকে বিলাসী মনে করা উচিত নহে। বুঝিতে হইবে তাহার ভিতর হইতে মর্য্যাদার পবিত্র সৌগন্ধ বাহির হইতেছে। শাস্ত্রে স্ত্রীদিগের সুবর্ণ ও রত্নালঙ্কার ধারণ বিহিত হইয়াছে। মনে করিও না রমণীদিগকে বিলাসিনী করিবার জন্য শাস্ত্র এইরূপ বিধান করিয়াছেন। শাস্ত্রের চক্ষে স্ত্রীজাতি বিলাসিনী নহেন, কিন্তু কুলপাবন পুত্রের প্রসূতি—"মাতা।" যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন রত্ন ও সুবর্ণে শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি বিশেষ পুষ্ট—উজ্জ্বল হইয়া থাকে। ধাতু-পুষ্টির জন্য সুবর্ণাদিঘটিত ঔষধ কবিরাজেরা ব্যবস্থা করিয়া

থাকেন। রত্ন বা স্বর্ণ ধারণ করিলে শরীরে পবিত্র তেজের সঞ্চার হয়। এই অবশেষবিধ গুণসম্পন্ন স্বর্ণ ধারণে মাতার শারীর প্রকৃতি পুষ্ট হইলে গর্ভস্থ বালকও পুষ্টি লাভ করিবে, এই উদ্দেশ্যেই সধবা স্ত্রীর পক্ষে স্বর্ণালঙ্কার ধারণ শাস্ত্র বিশেষরূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। বিধবা হইলে—সন্তানপ্রসব-সম্ভাবনা-বর্জ্জিত হইলে আর অলঙ্কার ধারণ করিতে হয় না। তোমার আমার বিকৃত চক্ষে যাহা কেবলই বিলাসলীলা, শাস্ত্রজ্ঞ হিন্দুর চক্ষে তাহাই কিন্তু উপাদেয় মহৌষধি।

প্রকৃতি যাহাকে যেরূপে সাজাইয়াছেন, সে সেই ভাবে কার্য্য করিলেই তাহার উন্নতি হইবে। প্রকৃতি যাহাকে যাহা সাজান নাই, তাহাকে জোর করিয়া সেইরূপ সাজাইতে গেলে ফল বিষময় হইয়া থাকে। দাঁড়কাককে ময়ূরের সাজে এবং ময়ূরকে দাঁড়কাকের সাজে সাজাইতে গেলে মূর্খতা প্রকাশ পায় মাত্র। প্রকৃতি যাহাকে শাক্তরূপে সাজাইয়াছেন, গুরু গিরিধারি তুমি স্বার্থলোভে তাহাকে বৈষ্ণবের সাজ মালা তিলকাদি দ্বারা সাজাইয়া যদি বৈষ্ণব করিতে যাও ত, তোমার সে চেষ্টা কখনই সফল হইবে না। আবার যে ব্যক্তি বৈষ্ণবী প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে শাক্ত বা শৈবমন্ত্র দীক্ষা দাও, কোন ফল হইবে না, প্রকৃতির মুকুলই ফুটিয়া ফল হইয়া দাঁড়ায়—প্রকৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া প্রবৃত্তি বা প্রবর্ত্তন অধিক দিন কাজ করিতে পারে না। প্রকৃতির সাজেই বা প্রকৃতির অনুকুল সাজেই কায হইয়া থাকে। একটা গল্প মনে হইতেছে। অনেকেই জানেন বঙ্গদেশের ঘোষপাড়ার দোলে অনেক বৈষ্ণব বৈষ্ণবী নেড়ানেড়ী একত্রিত হইয়া থাকে। বৈষ্ণব-গুরু এই

অবকাশে দেশ দেশান্তর হইতে সমাগত নিজ নিজ শিষ্যগণের কাছ হইতে নিয়মিত প্রণামী আদায় করিয়া থাকে। গৌর-দাস বাবাজি এই দোল উপলক্ষে গুরুদর্শনার্থ আসিয়াছেন। কিন্তু গুরুকে যে নিয়মিত, প্রণামী পয়সা দিতে হয়, গরীব গৌরদাসের তাহা সম্বল ছিল না। যাই হউক, যৎকিঞ্চিৎ যাহা সম্বল ছিল, সে তাহাই দিয়া গুরুকে প্রণাম করিল, নিয়মিত পয়সা না পাইয়া গুরু ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বলিলেন, তুমি নিয়মিত পয়সা না দিলে আমি প্রণামী গ্রহণ করিব না। গৌরদাস বলিল প্রভু! যাহা কিছু আমার নিকটে ছিল, তৎসমস্তই প্রণামী দিলাম। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আর একটি পয়সাও আমার কাছে নাই। কিন্তু গৌরদাসের কথা গুরু শুনিলেন না। গৌরদাসকে মিথ্যাবাদী মনে করিয়া শাস্তি দিবার জন্য গুরু অন্যান্য চেলাদিগকে আজ্ঞা করিলেন। তখন চেলারা গৌরদাসকে প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে দাঁড় করাইয়া তাহার চারিদিকে গৌর গৌর লিখিয়া একটা গণ্ডী দিল। এ গৌর-গণ্ডী বৈষ্ণবদের পক্ষে অনুল্লঙ্ঘনীয়। যতক্ষণ না গুরু গণ্ডী মুছিয়া দিবেন, ততক্ষণ সেই গণ্ডীর মধ্যে থাকিতে হইবে। সেই প্রচণ্ড রৌদ্রে মুণ্ডিতমস্তক গৌরদাসের ব্রহ্মতালু জ্বলিয়া যাইতে লাগিল, গৌরদাস অনেক কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল, বলিল, বারান্তরে আসিয়া গুরুর প্রণামীর পয়সা মিটাইয়া দিব, কিন্তু কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না। গুরু ভাবি-লেন, বেটা আর কিছু ক্ষণ গণ্ডীর মধ্যে থাকিলেই পয়সা বাহির করিবে। বৈষ্ণব হইয়া ত গণ্ডী আর ডিঙ্গাইতে পারিবে না। গৌরদাস যখন নিরুপায় হইল, আশা ভরসা সমস্তই

যখন চলিয়া গেল, তখন বলিয়া উঠিল, তবে কি গণ্ডী কাটিব? লোকে বলিল, কেমন করিয়া কাটিবে? গৌর বলিল, এই লও তোমার মালা—বলিয়া কণ্ঠী ছিঁড়িল, এই রাখ তোমার তিলক—বলিয়া গোপীচন্দন মুছিল, চক্ষু আরক্ত করিয়া "জয় মা তারা" বলিয়া গৌর-গণ্ডী লঙ্ঘন করিয়া বাহির হইল এবং বলিল আজ হইতে বৈরাগীর ভেকে ইস্তফা দিলাম। গৌরদাস সেই অবধি বৈষ্ণবধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শাক্ত হইলেন। বৈষ্ণবত্ব যদি গৌরদাসের প্রকৃতিনিহিত—মর্ম্মগত হইত, তাহা হইলে কখনই সে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শাক্ত হইতে পারিত না। প্রকৃতি যদি তাহাকে বৈষ্ণব করিয়া সাজাইতেন, তাহা হইলে সে কখনই গণ্ডী কাটিতে পারিত না। বৈষ্ণবত্ব, শৈবত্ব, শাক্তত্ব, আদি সাজ মহামায়া যাহাকে যাহা দিয়াছেন, প্রকৃতিতত্ত্বানভিজ্ঞ স্বার্থপর গুরু সম্প্রদায় তাহার উলট পালট করিয়া ধর্ম্মরাজ্য প্রলয় কাণ্ড করিতেছেন। ইহাঁদের অদূরদর্শিতায় ধর্ম্মরাজ্য বিষম উপদ্রুত হইয়া উঠিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সাজ নহিলে কায হয় না। সাজ মূল, কায তাহার ফল স্বরূপ। সাজই কায আনিয়া দেয়। বৈষ্ণবের সাজ বিষ্ণুভক্তি আনিয়া দেয়। শৈবের সাজ শিবসাধনায় উগ্র তপস্তেজের অনুকূলতা করিয়া থাকে। শৈব রুদ্রাক্ষ মালা, বৈষ্ণব তুলসী মালা ধারণ করেন শোভার জন্য নহে, সকের জন্য নহে, বাহ্যাড়ম্বর দেখাইবার জন্য নহে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রত্যেক সাজের গুরু গভীর উদ্দেশ্য আছে। যাঁহারা আয়ু-র্ব্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, বায়ু, পিত্ত, কফ এই ত্রিবিধ ধাতুর বৈষম্য অর্থাৎ একের

আধিক্য অপরের ন্যূনতা হইলেই ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে। ত্রিবিধ ধাতুকে সাম্যাবস্থাপন্ন করিতে প্যারিলেই ব্যাধির শান্তি হয়। শারীরিক চিকিৎসা আধিভৌতিক চিকিৎসা, এই চিকিৎসায় ধাতুর সাম্যাবস্থাই লক্ষ্যস্থল। সেইরূপ ভগবদুপাসনা" আধ্যাত্মিক চিকিৎসা। ইহাতেও ধাতুর সাম্যাবস্থা সাধকের লক্ষ্যস্থল। উপাসনার দুইটি পৃষ্ঠ, একটি বাহিরের, অপরটি ভিতরের, একটি শারীরিক, অপরটি আভ্যন্তরিক। যাহাতে দুইটি পৃষ্ঠই উজ্জ্বল হয়, শরীর ও মন উভয়ই যাহাতে স্বাস্থ্যলাভ করে, উপাসককে সেই পথে যাত্রা করিতে হইবে। যে প্রক্রিয়ায় মানসিক ধাতু সত্ত্ব রজ তমের পরস্পর বৈগুণ্য ভাব বিনষ্ট হইয়া মন শান্তিলাভ করে এবং শারীরিক ধাতু বায়ু পিত্ত কফ বৈষম্যাবস্থা পরিহার করিয়া সাম্যাবস্থায় স্থিত হইয়া শরীরটিকে নীরোগ রাখে, তাহাই ভগবদুপাসনা। সুতরাং উপাসককে নিজের শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ প্রকৃতির দিকেই দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যাঁহার শারীর প্রকৃতি কফাধিক্যময়ী, তাঁহাকে মহাদেবের চরণে শরণ লইতে হইবে। মহাদেব তমোমূর্ত্তি, কফ তমোগুণময়, কফকে অবলম্বন করিয়াই মহাদেবের সংহার মূর্ত্তির বিকাশ হয়। মৃত্যুকালে জীবের শ্লেষ্মায় কণ্ঠনালী আবদ্ধ হইয়াই মৃত্যু হয়। সুতরাং শ্লেষ্মা মহাদেবের অনুচর। যে যাহার অনুচর, সে তৎকর্ত্তৃক দমিত হয়। অতএব শ্লেষ্মাধিক্যকে দমন করিয়া ধাতুকে সাম্যাবস্থায় রাখিতে হইলে শিবোপাসনা আবশ্যক। রুদ্রাক্ষ উগ্রতা শক্তিকে বৃদ্ধি করে, শীতলতার বিনাশ করে, বায়ু বৃদ্ধি করে, শ্লেষ্মাকে বিদূরিত করে, সুতরাং রুদ্রাক্ষ ধারণ শৈবের নিতান্ত

আবশ্যক। কেননা রুদ্রাক্ষ উগ্রতা শক্তির বৃদ্ধি করিয়া শৈবের সাধনাপথের অনুকূলতা করিয়া থাকে। কেবল শারীরিক উপকারের জন্যই রুদ্রাক্ষ ধারণ নহে, রুদ্রাক্ষ বৈরাগ্যশক্তির বিকাশ করিয়া দেয়। শারীরিক মানসিক উভয়বিধ উন্নতিই যে উপাসনার লক্ষ্য। রুদ্রাক্ষমালা বায়ু বৃদ্ধি করে, তুলসীমালা বায়ু বৃদ্ধিজনিত উগ্রতার বিনাশ করে। যাহার প্রকৃতিতে বায়ুাধিক্যজনিত উগ্রতা আছে, তুলসীমালা তাহার সে উগ্রতা বিনষ্ট করিয়া তাহার প্রকৃতিতে বৈষ্ণবী সাধনার অনুকূল করিয়া দেয়। রুদ্রাক্ষধারী শৈবের প্রকৃতি তেজঃপ্রভাবযুক্ত, তুলসীমালাধারী বৈষ্ণবের প্রকৃতি শান্ত ও কোমল। যাহার যেমন সাজ, তাহার প্রকৃতি তদনুসারে গঠিত হইয়া থাকে। বৈষ্ণবের সাজ বৈষ্ণবী সাধনার অনুকূল, শৈবের সাজ শৈবী সাধনার অনুকূল। পিত্তাধিক্যযুক্ত পুরুষের শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া চাই। সুতরাং সাজ কায আনিয়া দেয়। সাজই কার্য্যের জন্মদাতা। যাহার যেমন সাজ সে তদনুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য হয়। তুমি একজন সম্ভ্রান্ত ধনী, সুন্দর পোষাক পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া যাই তুমি বাবু সাজিলে, অমনি সদর রাস্তা দিয়া জুড়ি হাঁকাইয়া তোমার যাইতে ইচ্ছা হয়, যদি কেহ তোমার সেই সাজ গোজ কাড়িয়া তোমাকে একটি ছিন্ন কৌপীন পরাইয়া ছাড়িয়া দেয়, তখন সহরের গুপ্ত গলি পথ দিয়া পালাইতে তোমার প্রবল বাসনা তখন জাগিয়া উঠে। স্কুলের ক্ষুদ্র বালকটি বাড়িতে যখন খেলা ধুলা করে, তখন তাহাতে সোজাসুজি বাঙ্গালি হাব ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, যাই কোট পেণ্টুলন কসিয়া স্কুলে বাহির হয়, অমনই দুই পাশে

পকেটে হাত দিয়া বুক ফুলাইয়া রাস্তা চলিতে আরম্ভ করে। সাজই তখন তাহার প্রকৃতির অণু পরমাণুতে সাহেবি আনা প্রবেশ করাইয়া দেয়। অনেক দিন হইল একবার প্রেসিডেন্সি কলেজের কতকগুলি ছাত্র ইংরাজি ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করিয়া শিক্ষককে দেখিতে দেয়। সাহেব শিক্ষক বাঙ্গালি যুবকের নেটিবি ধরণের ইংরাজি লেখায় সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি ঠিক ইংরাজি ইডিয়ম অনুসারে ইংরাজি প্রবন্ধ লিখিবার জন্য যুবকদিগকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, তোমরা ইংরাজি-ভাবে চিন্তা করিতে শেখো। তাই শুনিয়া এক দিন একটি ছাত্র প্রবন্ধ লিখিবার সময় টেবিলের উপরে বাম হাতের কুনুইটি রাখিয়া কলমটি বদনে সংযুক্ত করিয়া বক্রশিরে আকাশের দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। অন্যান্য সকল ছাত্রই নিবিষ্ট মনে প্রবন্ধ লিখিতেছে, সকলের মধ্যে সাহেব তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, What are you doing ? (তুমি ও কি করিতেছ ?) ছাত্র উত্তর করিল, I am trying to think in English. (আজ্ঞে আমি ইংরাজি ধরণে চিন্তা করিতেছি।) ক্ল্যাসের মধ্যে একটা বিষম হাঁসির হর্রোড় বহিয়া গেল। সাহেব বলিলেন কেবল বাহিরে সাহেব সাজিলে চলিবে না, ভিতরেও সাহেব সাজিতে হইবে, তবে ইংরাজি ভাষা আসিবে। বাস্তবিকই যাঁহারা সাহেবি আনার পিপাসু, তাঁহাদিগকে ভিতরে বাহিরে সাহেব সাজিতে হইবে। সাহেবি ধরণে কাঁদিতে হাঁসিতে অভ্যাস করিতে হইবে, মায় সাহেবি ধরণে স্বপ্ন দেখিতে পর্য্যন্ত শিখিতে হইবে, তবে সাহেবিত্ব কিঞ্চিৎ পরিমাণে আসিতে পারে।

আমরা পার্থিব জীব সাজের মাহাত্ম্য জানি না। যে সাজ আশ্রয় করিয়া যে কার্য্য করিতে হয়, আমরা তাহা করি না। তাই এমন মানবদেহ পাইয়া ইহার মূল্য বুঝিলাম না। দিন দিন সাজ ও কাযের ব্যতিক্রম করিয়া অধঃপাতের সাগরে ডুবিতেছি। সাজ ও কাযের মর্ম্মদেশেই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠিত। সাজের অনুকূল কাযই ধর্ম্ম। সাজের প্রতিকূল কাযই অধর্ম্ম। ব্যাঘ্র সাজে আসিয়া জীব জন্তুর হিংসা করিলে ব্যাঘ্র ধর্ম্মেরই যাজনা করা হয়, আবার মানব সাজে আসিয়া হিংসাবৃত্তির নিয়ত পরিচালনা করিলে মানবধর্ম্মের বিরুদ্ধে কার্য্য করা হয়। শঙ্করাচার্য্য কুকুর সাজ পরিয়া যে মাংস ভোজন করিতে গিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে অধর্ম্ম স্পর্শে নাই, কিন্তু সাত্বিক পূত শরীরে মাংস ভোজন করিলে অধর্ম্মী হইতে হইবে। যখনকার যাহা সাজ, তখনকার যাহা কায, তাহা মধু। তাহার ব্যতিক্রম হইলেই বিষ হইয়া দাঁড়ায়। শিশুর সাজ লইয়া যে আসিয়াছে, কোলের ছেলে হইয়া যে আসিয়াছে, যুবতীর অঙ্কশয্যায় তাহার শয়ন পবিত্র বাৎসল্য রসের অমিয় চিত্র—স্বর্গের মনোমোহন ছবি, কিন্তু যুবকের সাজে যে আসিয়াছে, তাহার পক্ষে তাহাই আবার অপবিত্রতার বিকট চিত্র। উপাসকের সাজ পরিয়া যে সন্ধ্যাহ্নিক করিতে বসিয়াছে, তাহার পক্ষে তখন বিষয়ের কথা, রসালাপ যেমন বিসদৃশ, তেমনই বাসরঘরে বর সাজিয়া যদি কেহ গান গায়, "ভাই বন্ধু দারা সুত কেহ কারও নয়" ত তাহাও তেমনই হাস্যাস্পদ। সুতরাং প্রাকৃতিক জগতে সাজ ও কাযের যথাযথ ব্যবস্থা যেমন আবশ্যক, ব্যবহারিক জগতেও তেমনি আবশ্যক।

সাজ ও কাযের অব্যবস্থা হইলেই, সমাজে নিন্দার দুন্দুভি বাজিয়া যায়, ব্যবস্থা করিতে পারিলে পুরস্কারের পুষ্পবৃষ্টি বর্ষিয়া যায়। প্রসঙ্গাধীন একটা গল্প মনে হইতেছে। একজন বহুরূপী নিত্য নানাবিধ সাজ সাজিয়া এক রাজার দরবারে আসিত। যদিও সে বেমালুম সাজিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু বুদ্ধিমান্ রাজা তাহাকে চিনিয়া ফেলিতেন। রাজা একদিন বলিলেন, বহুরূপী! এমন সাজ সাজিয়া আইস যেন তোমায় চিনিতে না পারি। তাহা হইলেই পুরস্কার পাইবে। বহুরূপী যে আজ্ঞা বলিয়া চলিয়া গেল। পর দিন সে সাজিয়া আসিল, রাজা প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলেন না, কথা বার্ত্তাতেও বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু যখন চলিয়া যায়, তখন চিনিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, আজ তোমায় প্রথমে চিনিতে পারি নাই বটে কিন্তু এখন যাইবার সময় তোমায় চিনিয়া ফেলিলাম। আমি ইহাতে কিঞ্চিৎ সন্তোষ লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু পূর্ণ সন্তোষ লাভ করিতে পারি নাই। তুমি এমন সাজ সাজিয়া আইস যে, আসিবার সময়, বসিয়া থাকিবার সময় ও যাইবার সময় এই ত্রিকালেও তোমাকে যেন চিনিতে না পারি। তাহা হইলেই আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইব। বহুরূপী তাহাতেই সম্মত হইয়া চলিয়া গেল। কিছু দিন চলিয়া যায়, সেই রাজার রাজধানীর নিকটবর্ত্তী এক পর্ব্বতে এক মৌনী বাবা আসিয়া আসন করিলেন। সন্ন্যাসী দেখিবার জন্য দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। সন্ন্যাসীর কাহারও দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি মহাযোগে নিমগ্ন। কত লোকে কত জিনিস উপহার দিল, কত ভোজন সামগ্রী দিল, সন্ন্যাসী তাহার একটিও স্পর্শ

করিলেন না। মহাক্রুদ্ধ হইয়া ইঙ্গিত করিতেন, এ সমস্ত এখান হইতে এখনই উঠাইয়া লও। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় যখন কেহই সন্ন্যাসীর নিকটে থাকিত না সেই সময় সন্ন্যাসীর স্ত্রী আসিয়া সন্ন্যাসীকে খাওয়াইয়া যাইত, কেহই তাহা দেখিতে পাইত না। লোকে বুঝিল সন্ন্যাসী দিন রাত্রির মধ্যে জল স্পর্শ করেন না। লোকে শতমুখে সন্ন্যাসীর প্রশংসা করিতে লাগিল, ক্রমে ক্রমে রাজদরবারে সন্ন্যাসীর কথা পৌছিল। সন্ন্যাসীর আশ্চর্য্য প্রশংসা শুনিয়া মহারাজার সন্ন্যাসী দেখিতে ইচ্ছা হইল। সদলবলে তিনি একদিন সেই পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন, এক হাজার টাকার তোড়া সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে উপহার দিয়া, অনুমতির প্রার্থী হইয়া করযোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সন্ন্যাসীর ধ্যানভঙ্গ হইল। চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন সম্মুখে রাজা ও টাকার তোড়া। অমনি যেন মহা অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন, ইঙ্গিতে টাকার তোড়াটি উঠাইয়া লইতে বলিলেন। রাজা সন্ন্যাসীর অদ্ভুত বৈরাগ্য দেখিয়া চমকিত হইলেন, অনেক কাকুতি মিনতির পর যখন দেখিলেন সন্ন্যাসী টাকার তোড়াটি কিছুতেই লইলেন না, তখন কি করেন অগত্যা অনুচরকে তাহা উঠাইয়া লইতে আদেশ করিলেন। মহারাজা সন্ন্যাসীর আশ্চর্য্য বৈরাগ্যের কথা ভাবিতে ভাবিতে বাড়ি চলিয়া গেলেন, মহরাণীকে গিয়া সন্ন্যাসীর কথা বলিলেন, তিনিও সন্ন্যাসী দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। অনেক পরামর্শের পর রাজদরবারে স্থির হইল, যে সন্ন্যাসীকে অন্তঃপুরে আনাইয়া মহারাণীকে দেখাইতে হইবে। মহারাজার প্রেরিত লোক সন্ন্যাসীর কাছে গিয়া সেই প্রস্তাব করিলেন।

সন্ন্যাসী প্রথমে কিছুতেই সম্মত হইলেন না, কিন্তু সম্মত না হইলে সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কেন, তাই সন্ন্যাসী প্রথমে অসম্মতির ভাব দেখাইয়া শেষে অনেক কষ্টে সম্মত হইলেন। সন্ন্যাসী রাজ-অন্তঃপুরে নীত হইলেন। মহারাজা ও মহারাণী ভক্তিগদ্গদচিত্তে দুই হাজার স্বর্ণ মুদ্রা উপঢৌকন দিয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী বিষম ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়াই যেন আরক্ত লোচনে অত্যন্ত অসন্তোষের ভাব দেখাইলেন। রাজা করযোড়ে বলিলেন, জানি আপনি সন্ন্যাসী, ধনরত্নে আপনার স্পৃহা নাই। কিন্তু আপনাকে কিছু উপহার না দিলে আমাদের ন্যায় গৃহস্থের মন যে পরিতৃপ্ত হয় না, আপনি কিছু গ্রহণ না করিলে আমরা বড়ই মর্ম্মাহত হইব। আমাদিগকে চরিতার্থ করিবার জন্য ইহা আপনাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। সন্ন্যাসী তোড়াটি উঠাইয়া লইয়া সম্মুখবর্ত্তী কূপে ফেলিয়া দিলেন এবং তথা হইতে সবেগে প্রস্থান করিলেন। বাহিরে রাষ্ট্র হইল, মহারাজার অত্যাচারে সন্ন্যাসী পলাইয়া গেল। সকলেই সন্ন্যাসীর জন্য ক্ষুণ্ণ হইল, মহারাজের প্রতি অনেকেই বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। মহারাজা ও মহারাণীও সন্ন্যাসীর জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। সন্ন্যাসীকে অন্বেষণ করিবার জন্য রাজসরকার হইতে লোক প্রেরিত হইল, কিন্তু সন্ন্যাসীর কোন খোঁজ খবরই পাওয়া গেল না। কিছু দিন পরে সেই বহুরূপী রাজদরবারে আসিয়া উপস্থিত হইল, মহারাজকে বন্দেগী করিয়া দাঁড়াইল, বলিল, রাজন্! এখন পুরস্কার দিন।

রাজা। কিসের পুরস্কার!

বহুরূপী। আমার সাজের পুরস্কার। আপনি বলিয়াছিলেন, এমন সাজ সাজিয়া আইস, যেন আসিবার সময়, বসিবার সময় ও যাইবার সময় এই ত্রিকালেও তোমায় চিনিতে না পারি, তাই আমি সন্ন্যাসী সাজিয়া আসিয়াছিলাম। আপনি আমায় কিছুতেই চিনিতে পারেন নাই।

রাজা। বল কি? তুমিই সেই সন্ন্যাসী সাজিয়া আসিয়াছিলে! আশ্চর্য্য বাহাদুরি দেখাইয়াছ, কিন্তু তোমার মত মহাপুরুষও কেহ নাই, আবার নির্ব্বোধও কেহ নাই। মহাপুরুষ এই জন্য বলিতেছি, তুমি ততগুলি স্বুবর্ণ মোহরের লোভ ছাড়িতে পারিয়াছিলে বলিয়া। আবার নির্ব্বোধ বলিতেছি এই জন্য, তুমি সেই মহামূল্য স্বুবর্ণ রাশি হাতে পাইয়াও ছাড়িয়া দিয়া এখন সামান্য পুরস্কারের প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছ। এখন তুমি কত টাকাই আর আমার কাছ হইতে পুরস্কার পাইবে? তখন তোমার সন্ন্যাস-শক্তির আশ্চর্য্য প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া যাহা উপঢৌকন দিয়াছিলাম, এখন তোমার বহুরূপীর সাজে খুসি হইয়া কিছু আর তত টাকা দেওয়া সম্ভব নহে।

বহুরূপী। এখন আপনি আমায় পাঁচ টাকা পুরস্কার যদি দেন, তাহা হাত পাতিয়া লইব। তখন পাঁচ কোটি টাকা দিলেও লইতে পারিতাম না। কেন না তখন যে আমি সন্ন্যাসী সাজিয়াছিলাম। আমি তো জুয়াচোর সাজি নাই। সন্ন্যাসী সাজিয়া যাহা করিতে হয়, তাহা আমি দেখাইয়াছি। সন্ন্যাস-সাজের যে মর্য্যাদা, তাহা নষ্ট করিব কেন? এখন আপনি যাহা পুরস্কার দিবেন, তাহাই আমি আহ্লাদপূর্ব্বক লইব।

রাজা তাহার বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কূপের মধ্য হইতে সেই

মোহরের তোড়া উঠাইতে আদেশ করিলেন এবং তাহাই বহু-রূপীকে বক্সিস প্রদান করিলেন। আইস জীব! ঐ বহুরূপীর পদতলে দাঁড়াইয়া আমরা শিক্ষা করি, কেমন করিয়া সাজের মর্য্যাদা রাখিতে হয়। আমরা বহুরূপীর ন্যায় কখনও শিশু, কখনও যুবা, কখনও বৃদ্ধ, কখনও জ্ঞানী, কখনও পণ্ডিত, কখনও ধর্ম্মপ্রচারক, কখনও সমাজসংস্কারক এইরূপ কত কি সাজ মুহুর্মুহুঃ সাজিতে যাই, কিন্তু কোন সাজেরই মর্য্যাদা রাখিতে পারি না। বহুরূপী পৃথিবীর রাজার কাছে নিজ সাজের অভিনয় দেখাইয়াছিল, আর আমরা রাজরাজেশ্বরের কাছে নিজ নিজ সাজে সাজিয়া অভিনয় দেখাইতে আসিয়াছি। সুতরাং আমাদের দায়িত্ব গুরুতর। কিন্তু আমরা পদে পদে এই দায়িত্ব কলঙ্কিত করিতেছি। সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও যে সাজের মাহাত্ম্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন, আমরা পৃথিবীর অহঙ্কারী জীব, সেই সাজের মহিমাকে পদতলে বিমর্দ্দিত করি-তেছি। পুরাণের একটী গল্প দৃষ্টান্তস্থলে এখানে বলা আবশ্যক হইতেছে। একবার নরনারায়ণ ঘোর তপস্যায় রত হইয়া-ছিলেন। ইন্দ্র তাঁহাদের তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য রম্ভাকে প্রেরণ করেন। স্বভাবসুন্দরী রম্ভা মোহনবেশে তপস্যাক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন রম্ভার কুটিল কটাক্ষে তাহার কু অভিপ্রায় বুঝিয়া ক্রোধে জ্বলন্ত হইয়া ভগবান্‌কে বলিলেন, আপনি বলেন ত এই পাপীয়সীকে তপস্তেজে এখনই ভস্ম করিয়া ফেলি, নহিলে এই কুলটা আমাদের মনোবিকার উৎ-পাদন করিয়া তপস্যা ভঙ্গ করিবে। নারায়ণ বলিলেন, উহাকে ভস্ম করিয়া আর লাভ কি? তোমার ত মনোবিকার বিলক্ষণ

জন্মাইয়া দিয়াছে, কাম-বিকারের পরিবর্ত্তে তোমার না হয় ক্রোধ-বিকার উপস্থিত হইয়াছে। তাহা হইলেই রম্ভার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। কাম ক্রোধ উভয়ই ত তপস্যার রিপু। সুতরাং উহাকে ভস্ম করিয়া আর স্বয়ং তপস্যাভঙ্গের হেতু হইও না। আমি নিজেই ইহার সদ্ব্যবস্থা করিতেছি। এই বলিয়া ভগবান্ নিজ অলৌকিকী শক্তিপুঞ্জ দ্বারা সঙ্কল্পমাত্র সেই মুহূর্ত্ত মধ্যে শত শত অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যশালিনী কামিনী সৃষ্টি করিলেন। তাহারা করযোড়ে আজ্ঞা প্রার্থনা করিলে ভগবান্ তাহাদিগকে বলিলেন, আশ্রমে আজ স্ত্রী অতিথি আসিয়াছেন, তোমরা সকলে গিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা কর—অভ্যাগতোচিত সৎকার কর। রমণীগণ ভগবানের আদেশমত কার্য্য করিতে তৎপর হইল। রম্ভা সেই বিচিত্র রূপযৌবনশালিনী রমণীগণকে তপোবনের পরিচারিকা জানিয়া লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইলেন; এবং নিজ রূপকে ধিক্কার দিতে দিতে পলায়ন করিলেন। অনন্তর সেই সমস্ত রমণী নারায়ণের কাছে গিয়া করযোড়ে বলিল, প্রভো! আপনার ত অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, এক্ষণে আমাদের অভীষ্ট আপনি পূরণ করুন। স্ত্রী মূর্ত্তি ত একাকিনী থাকিতে পারে না, আপনি ভিন্নই বা কে আমাদের পতি হইতে পারে। আমাদিগকে স্ত্রীত্বে গ্রহণ করুন। তখন ভগবান্ উত্তর করিলেন, সুন্দরীগণ! এখন আমার তপস্বিবেশ, এ তপস্বিসাজে তোমাদের মনোবাঞ্ছা পুরাইতে আমি অক্ষম। বৃন্দাবনে শ্যাম নটবর সাজে আমি তোমাদের মনোরথ চরিতার্থ করিব। রমণীগণ নারায়ণের আশ্বাস-বাণীতে সন্তুষ্ট হইয়া অন্তর্হিত হইয়া গেল। ভগবান্ বসুদেবগৃহে জন্মিয়া মোহনমুরলীধরবেশে রাসরসিক রসেশ্বর-

সাজে সজ্জিত হইয়া গোপিকাদের মনোরথ পুরাইয়াছিলেন। যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, যিনি আত্মারাম, তিনি ত ইচ্ছা করিলেই তখনই রমণীগণের মনোরথ চরিতার্থ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা তিনি করিলেন না কেন? তিনি যে তখন তপস্বী। তপস্বীর সাজে যাহা করিতে হয়, তাহার ব্যতিক্রম তিনি করিবেন কেন? তপস্বী-সাজের যাহা মর্য্যাদা, তাহা তিনি উল্লঙ্ঘন করিবেন কেন? সাক্ষাৎ ভগবান্ একদিন যে সাজের মূল্য বুঝিয়া তাহার মাহাত্ম্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন, আমরা পৃথিবীর জীব অভিমানে পদে পদে সেই সাজের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিতেছি। যদি সাজ ও কাযের যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া সংসারে চলিতে পারিতাম, তাহা হইলে জগতে এত মর্ম্মযাতনার বিকট চীৎকার শুনিতে পাওয়া যাইত না। এত যে অতৃপ্তি, এত যে বিষাদের মর্ম্মভেরী চারিদিকে বাজিতেছে, হতাশার উষ্ণ নিশ্বাস নির্য্যাতনার হাহুতাশ এত যে জগৎকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, এ সমস্তই বিলীন হইয়া যাইত, যদি জীব সাজ ও কাযের সমন্বয় সাধন করিতে পারিত।

বাহিরের সাজ ভিতরের সহিত মিশিলে মণিকাঞ্চনের সংযোগ হয়। সন্ন্যাসীর গেরুয়াবসন সন্ন্যাসীর অন্তঃপ্রকৃতিতে সন্ন্যাস ভাব যদি জাগাইয়া দেয়, তাহা হইলে সাজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। বাহিরের অনুষ্ঠান যদি ভিতরের তরঙ্গে গিয়া আঘাত করিতে পারে, তবেই অনুষ্ঠাতার অনুষ্ঠান চূড়ান্ত সফল হয়। স্তরে স্তরে সজ্জিত তিন তক্তা কাগজের উপরে পেন্‌সিল দাগ দিলে তাহার নীচের কাগজেও যেমন রেখা অঙ্কিত হয়, সেইরূপ বাহিরের অনুষ্ঠান—বাহিরের সাজ সজ্জা স্থূল শরীরে অঙ্কিত

হইলে, সেই স্থূল শরীরের নিম্ন স্তর সূক্ষ্মশরীর ও কারণ শরীরে গিয়া যখন সংস্কার-রেখা অঙ্কিত করিয়া দিবে, তখনই সজ্জার মুখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। কিন্তু সজ্জার মুখ্য উদ্দেশ্য ছাড়া তাহার গৌণ উদ্দেশ্যও আছে। যেখানে সজ্জা বাহ্য ঠাট মাত্র, সেখানে সজ্জার মুখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হউক, গৌণ উদ্দেশ্যও ত সিদ্ধ হইতে পারে। তাই একজন ভক্ত বৈষ্ণব আব্দার করিয়া বলিয়াছেন—

> সেবে সদৈব বিষয়ান্ পুরুষক্রমেণ
> দাস স্তবেতি জগতি প্রতিপাদয়ামি।
> হে কৃষ্ণ! বঞ্চয়িতুমন্তকদূতগোষ্ঠীং
> ঘট্টীং তরন্তি ন শঠা মহদাখ্যয়া কিং।

"হে কৃষ্ণ! বিষয়ের দাসত্ব করিয়াই আমি জীবন কাটাইতেছি। তোমার দাসত্ব অণুমাত্রও করিতে পারি না, ইহা ঠিক। কেবল যমদূতগণকে ফাকি দিবার জন্যই তিলককণ্ঠীধারী বৈষ্ণব সাজিয়া আমি তোমার দাস বলিয়া আপনাকে জগতে প্রতিপন্ন করিতেছি। প্রভু! তোমার দাস হওয়াত সহজ কথা নহে। তোমার দাস হইতে পারি আর না পারি, আমি যে তোমার দাস সাজিয়াছি, ইহাতেই আমার ভরসা আছে, আমি ভবসিন্ধু পার হইব। কেন না আমি জানি, কোন কোন প্রবঞ্চক খেয়াঘাটে পার হইবার জন্য বড় লোকের চাপরাসী সাজিয়া যখন উপস্থিত হয়, তখন তাহার পার হইবার একটি পয়সা সম্বল না থাকিলেও নৌকাওয়ালা তাহার চাপরাসী সাজে ভীত হইয়া তাহাকে বিনা বাক্যব্যয়ে তৎক্ষণাৎ পার করিয়া দেয়, তাই বলি নাথ! তোমার দাসত্বের সাজ যে

আমি লইতে পারিয়াছি ইহাতেই আমি ধন্য। এই পবিত্র সাজ দেখিয়াই তোমার দাসবোধে যমদূতগণ আমাকে পরিত্যাগ করিবে।" ভিতরে বাহিরে সাজিতে পারিলে ত কথাই নাই, কিন্তু যেখানে কাজ করিবার ইচ্ছায় কেবল মাত্র বাহিরের সাজ, সেখানেও সাজের স্বভাব-শক্তির গুণে কিছু উপকার লাভ হয় বৈ কি। ভক্তের সাজ, ধার্ম্মিকের সাজ, সন্ন্যাসীর সাজ ভগবৎসেবকের সাজ লইয়াও অনেকের জীবন কৃতার্থ হইয়া গিয়াছে। কবি রামায়ণের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, যখন ভগবান্ রামচন্দ্র সাগর কূলে সেনানিবেশ করিলেন, তখন বিপক্ষের বলাবল পরীক্ষা করিবার জন্য রাবণ একদিন দরবার করিলেন। রামচন্দ্রের সৈন্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে এক জন রাক্ষস নিযুক্ত হইল। রাক্ষস বানর-বেশ ধারণ করিয়া বানর সেনার মধ্যে প্রবেশ করিল। রাক্ষসের মায়া রাক্ষস বিভীষণ বুঝিতে পারিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধরিবার জন্য তিনি বানরগণকে ইঙ্গিত করিলেন। বানরগণ তাহাকে ধরিয়া রামচন্দ্রের নিকটে লইয়া গেল। বলিল, প্রভো! এই দুরাত্মা মায়াবী রাক্ষস রাবণের চর। আপনি অনুমতি করিলে এই দুরাত্মাকে এখনই শমনসদনে প্রেরণ করি। রামচন্দ্র বলিলেন, দূতহত্যা করিতে নাই, ইহাকে ছাড়িয়া দাও। বানরগণ বলিল, এ ব্যক্তি যদি রাক্ষসী মূর্ত্তিতে আসিত, তাহা হইলে আমরা কিছু বলিতাম না, কিন্তু কাপট্য পূর্ব্বক বানর সাজিয়া আসিয়াছে, অতএব এ প্রতারকের শাস্তি আবশ্যক। রামচন্দ্র বলিলেন, ইহাকে ছাড়িয়া দাও। যদিও এ কপট, তথাচ যে আমার সেবকের সাজ পরিয়া আসিয়াছে, সে আমার অভয় পাইবার যোগ্য।

তাই বলিতেছি সাজ প্রভুর কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আনে। তাঁহার সেবক হইতে পারিলে ত কথাই নাই, তাঁহার সেবকের সাজ লইতে পারিলেও জীবন ধন্য হয়। যে সাজ প্রভুর এত প্রিয় পদার্থ, সেই সাজের মূল্য আমরা বুঝিলাম না। একবার প্রাণ ভরিয়া এক দিনের তরেও প্রভুর সেবক সাজিয়া জীবন কৃতার্থ করিতে পারিলাম না!

হায়! এ সংসার-নাট্যশালায় এমন মনুষ্য-সাজ পাইয়া এক-দিনের তরেও মানুষের অভিনয় করিতে পারিলাম না। প্রকৃতির এ বিচিত্র শিল্পসুশোভিত বিস্তীর্ণ মণ্ডপে কেবল পাশবিক চিত্র দেখাইয়া কলঙ্কের বোঝা মাথায় লইয়া পটান্তরালে মুখ লুকাইবার জন্য ধাবিত হইতেছি। পৃথিবীর আবর্জ্জনা বহন করিতে করিতেই আমাদের পরমায়ু ফুরাইয়া গেল। মনুষ্যদেহ-সাজে সাজিয়া কি কাজ করিতে আসিয়াছি, তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। বাজার করিবার জন্য বাজারের সাজ ধামা আদি লইয়া আসিয়াছি, কিন্তু যাহা কিনিতে হইবে, তাহার ফর্দ্দ হারাইয়া ফেলিয়াছি। কি কিনিলে আমার প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, অভাব মিটিবে প্রাণের জ্বালা নিবিয়া যাইবে, তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। কিসের অভাবে প্রাণ জ্বলিতেছে, কি পাইলে আমি জুড়াইয়া যাইব, তাহা ত ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না, কিন্তু দেহ মনঃপ্রাণ অবিরতই অতৃপ্তির অনলে বিদগ্ধ হইতেছে, দিগ্দাহী চিতানল অবিরতই মর্ম্মদেশে জ্বলিতেছে। জনৈক মহাত্মা বলিয়াছেন, "মুট্‌টি বাধকে আয়ো বন্দা হাত পসারে জাওয়েগা।" "মনুষ্য! তুমি জগতে আসিবার সময় হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া আসিয়াছ, যেন কিছু হাতে করিয়া আনিয়া

ছিলে, কিন্তু জগৎ হইতে যাইবার সময় তুমি হস্তমুষ্টি খুলিয়া চলিয়া যাইতেছ, যাহা লইয়া আসিয়াছিলে, তাহা যেন জগতে হারাইয়া গেলে। যাইবার সময় কিছুই লইয়া যাইতে পারিলে না।” যাহা লইয়া আসিয়াছিলাম, তাহা জগতে হারাইয়া ফেলিয়াছি। কি হারাইয়াছি, তাহা জানি না। কি পাইলে এ নীরস প্রাণ সরস হইবে, এ অতৃপ্তি বিষ-বিদগ্ধ জীবন তৃপ্তির ফোয়ারায় অবগাহন করিবে দীনদয়াময়ি মা! তাহা বলিয়া দাও! মা! আমার মত দাবদহনদগ্ধ জীব যদি তোমার অনন্ত প্রসাদ ভাণ্ডারের কণিকামাত্র পাইয়া শান্তি লাভ করে ত, তাহাতে তোমার মহিমার হানি কি! মা শত সহস্র যন্ত্রণায় আমাকে নির্য্যাতিত কর, তাহাতে দুঃখ নাই, ঘোর নরকার্ণবে ডুবাইয়া দাও তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু মা! তোমার দীন-দয়াময়ী এই নামে যদি কলঙ্ক পড়ে, তাহা হইলে প্রাণে বড় আঘাত লাগিবে। মা! যদি সাজ দিয়াছ, তবে কায করিবার শক্তি দাও, তোমার যন্ত্রে তোমার মন্ত্রে কৃতার্থ হই। চক্ষু দিয়াছ, তবু তোমাকে দেখিতে পাইলাম না, কর্ণ দিয়াছ মা! তোমার কথা শুনিতে পাইলাম না, ঘ্রাণশক্তি দিয়াছ, তোমার দিব্য গন্ধ আঘ্রাণ করিতে পাইলাম না। রসনা দিয়াছ, তোমার মধুর হইতেও সুমধুর নামরস আস্বাদন করিতে পারিলাম না। মা! মানব জন্ম—সাধের জীবন বুঝি বিফল হইয়া গেল, মনঃ প্রাণ আত্মা উষরভূমি হইয়া গেল, সমস্তই মরুভূমি হইয়া গেল, একবার করুণার কটাক্ষে চাহ মা! চিরদিনের জন্য জুড়াইয়া যাই। মা! তুমিই কেবল আমাদের ন্যায় অবোধ শিশুর ভরসা। শিশুকে ভাল সাজ পরাইলেও সে

খুলিয়া ফেলে—ছিঁড়িয়া ফেলে, মা আবার সাজাইয়া দেন। মা কতবার সাজাইয়া দিলে, আমরাও কতবার তাহা খুলিয়া ফেলিলাম, কতবার ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। মা! শুনিয়াছি নাকি মানবসাজই তোমার মর্ত্ত-রঙ্গশালার শেষ সাজ। এ সাজের মর্য্যাদা বুঝিতে পারিতেছি না, যদি দয়া করিয়া সাজাইলে, তবে একবার মা! সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াও! কে সাজালে, একবার নয়ন ভরিয়া দেখিয়া লই, কেমন সাজাইলে, একবার তাহার মর্ম্ম বুঝিয়া লই। মা যোগমায়ে! যোগেশ্বরি! বুঝিয়াছি, তুমি আপনার মায়ায় আপনার ছায়া রচনা করিয়া জগৎ মুগ্ধ করিয়াছ, মা আমার সাজ খুলিয়া দাও, বড় গরম (১) বোধ হইতেছে। একবার কোলে করিয়া লও, একবার তোমার মুখখানি দেখিতে দেখিতে সংসার ভুলিয়া যাই; তোমারই অঙ্গে (২) অঙ্গ (৩) মিশাইয়া চিরদিনের জন্য যোগনিদ্রায় অভি-ভূত হইয়া যাই। মা! কর্ম্ম বুঝি না, জ্ঞানযোগ বুঝি না, ভক্তি-উপাসনা জানি না। জানি মা! তুমি আমার সব। মা! তোমাকে যখন মা বলিয়াছি, তখন দেখো মা! আর যেন কখন কাহাকেও মা বলিতে না হয়। মা! আমাকে সাজাইলে, আবার আপনিও কখন মা, কখন শিশু, কখন মানুষ (৪) কখন পশু (৫) কখনও পুরুষ (৬) কখন নারী (৭) কখন হর, কখন হরি সাজিয়া জগৎ জীবের মন ভুলাইলে। মা! আমার সব সাজ একবার খুলিয়া দাও, আর তোমারও সকল সাজ ছাড়িয়া

---

(১) ত্রিতাপ। (২) প্রকৃতি। (৩) দেহাভিমান। (৪) রাম কৃষ্ণাদি। (৫) বরাহ, নৃসিংহাদি। (৬) বিষ্ণু শিবাদি। (৭) অম্বিকা, কালী, তারাদি।

ফেল। একবার আমি যাহা তাহাই স্বরূপতঃ হই, আর তুমি যাহা তাহাই স্বরূপতঃ প্রকাশিত হও। একবার দেখিয়া লই, তুমিই বা কেমন, আমিই বা কি, একবার বুঝিয়া লই, তুমিই বা কে, আমিই বা কার, আর একবার তোমাতে আমাকে মিশাইয়া তোমার সত্তায় আমার অস্তিত্ব লুকাইয়া জানিয়া লই, জন্ম জীবনের চরিতার্থতা কি? মা! আমার বলিতে যাহা কিছু আছে, সব কাড়িয়া লও। তোমার সাজে তোমার কাযে তোমার পদপঙ্কজে নিযুক্ত করিয়া রাখ, তাহা হইলেই আমার সব সাজ ও সব কায সার্থক হইবে।

মা আমার মাতা কি পিতা?

মহাশক্তি-সাগরে নিমগ্ন হইয়া যিনি রত্ন উদ্ধার করিতে চাহেন, তাঁহার চেষ্টা ও যত্ন সংসারে বাহিরে পৌঁছিয়াছে। অনন্ত অম্বুধির অতল তলে ডুবিতে ডুবিতে যিনি তলাইয়া যান, তাঁহার সংবাদ কিছুই পাওয়া যায় না। বুদ্ধি, জ্ঞান, চেষ্টা ও যত্নের সীমা যিনি অতিক্রম করেন, তাঁহার সমাচার জগতে পৌঁছে না। ব্রহ্মলোক হইতে সংবাদ পাওয়া যায়, বৈকুণ্ঠ-লোক হইতেও সংবাদ পাওয়া যায়, কিন্তু সেই মূলাশক্তির গভীর গর্ভে যিনি ডুবিয়া যান, তাঁহার সংবাদ পাওয়া যায় না। শ্রুতি সকল কথা বলেন বটে কিন্তু সে স্থানের তত্ত্ব-বার্ত্তা ভাল করিয়া বলিতে পারেন না। সে স্থানের তারের সংবাদ জগতে

কেহ আনিয়া দিতে পারে না। যোগী ঋষি সে স্থান সম্বন্ধে নির্ব্বাক্। হাঁসিতে ইঙ্গিতে শ্রুতি সেই ঈপ্সিত কথার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেন বটে, কিন্তু পূর্ণ পরিচয় দিতে পারেন কৈ? শ্রুতি তাঁহাকে ধরি ধরি করিয়া ধরিতে পারেন না, ছুঁই ছুঁই করিয়া ছুঁইতে পারেন না, যে তাঁহাকে ধরিল, সে মরিল, যে তাঁহাকে ছুঁইল, সে জ্বলিয়া গেল, তাঁহার কাছে গিয়া কেহই আর ফিরিয়া আসেন না।

জানিনা তাঁহাতে কি মধু আছে। সেই অজানা অচেনা বস্তুর জন্য জগৎ কিন্তু পাগল। যিনি বুঝিবার অগম্য পথে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে সম্মুখে পাইলে তাঁহার সহিত সম্পর্ক পাতাইতে ইচ্ছা হয়। যাঁহাকে সম্মুখে দেখিতে পাই না, মন বুদ্ধির অতীত স্থানে যাঁহার তত্ত্ববার্ত্তা লুক্কায়িত, তাঁহার সহিত ভালবাসা জন্মিবে কেমন করিয়া? যাঁহাকে আমি আমার বলিয়া আয়ত্ত করিতে পারি, যাঁহাকে পাইলে মনঃ প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া স্বত এব তৃপ্তোস্মি বলিয়া সাক্ষ্য দেয়, তাঁহাকে পাইবার জন্যই আমার অন্তরাত্মা লালায়িত। যাঁহাকে আমার জিনিষ বলিয়া আনন্দে অধিকার করিতে পারি, আমার সাজে সজ্জিত হইয়া আমার ভাবে "আমার" হইয়া যিনি আমার কাছে আসেন, তাঁহাকে লইয়াই আমি জুড়াইতে চাই। আমার হৃদয় যাঁহার মোহন মূর্ত্তি ধারণা করিতে পারে, আমার ক্ষুদ্র প্রকৃতি যাঁহাকে নিজস্ব বলিয়া অধিকার করিতে পারে, আমি তাঁহারই চারুচরণ-রশ্মির ভিখারি।

জানি আমি পাপী তাপী নরাধম, এই পাপীর দেবতা হইয়া— এই অগতির গতি হইয়া—এই অনাথের নাথ হইয়া যিনি দেখা

দেন, আমি তাঁহাকে চাই। সাধকের হৃদয়-মন্দির যিনি আলো করেন, আমি তাঁহাকে লইয়া কি করিব? সাধকের যাহা সাধের ধন, আমার মত অসাধকের হৃদয় তাঁহাকে কি ধারণা করিতে পারে? ধ্রুব প্রহ্লাদের হৃদয়ের যিনি সম্পত্তি, আমার এ ক্ষুদ্র হৃদয় তাঁহাকে কি স্পর্শ করিতে পারে? উপাদেয় রাজ-অন্ন আমার মত ব্যাধিগ্রস্তের উদরে পরিপাক পাইবে কেন? সুতরাং ধ্রুব প্রহ্লাদের ঈশ্বরকে আমি চাহি না, কেননা সে হৃদয় আমার নাই। জ্ঞানীর ঈশ্বর—যোগীর ঈশ্বর—সাধকের ঈশ্বরকে আমি চাহি না, আমি আমার ঈশ্বরকে চাই। আমার প্রিয়তম সামগ্রীকে "আমার" ভাবে অনুরঞ্জিত করিয়া লইতে চাই।

আপনার আপনার ভাবে জগতের সকলেই আপনার জিনিষকে ভালবাসে। পরের চক্ষু লইয়া কেহ আপনার জিনিষকে ভালবাসে না। পরের হৃদয় লইয়া কেহ আপনার জিনিষকে সুন্দর দেখে না। আপনার চক্ষে যাহা ভালবাসার সামগ্রী, পরের চক্ষে তাহা ঘৃণিত হউক, তুচ্ছ হউক, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। কুৎসিত কদাকার পুরুষ পরের চক্ষে ঘৃণিত হইতে পারে, কিন্তু তাহার সতী স্ত্রীর পক্ষে সে ভাল-বাসার জিনিষ—স্নেহ মায়া মমতার অনন্ত প্রস্রবণ। সতী যে হৃদয়-দর্পণ দিয়া তাহার পতিকে দেখে, সেই হৃদয়খানি লইয়া যদি তুমি দেখিতে, তাহা হইলে সেই বিকট কদাকার পুরুষে অপূর্ব্ব মাধুরী দেখিতে পাইতে। সুতরাং নিজত্ব লইয়াই ভালবাসা। মদ্ভাবভাবিত হইয়া যাহা আমার অধিকারে আসে, আমার আসক্তি কেন্দ্রাভিমুখী হইয়া সেই দিকে শতধারে ছুটিয়া থাকে। এই মদ্ভাবের সহিত যাহার সংস্রব নাই, জগতের লোক

তাহাকে এক মুখে সুন্দর—উত্তম—উপাদেয় বলিলেও আমার ভালবাসার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে না। এই "আমার" ভাবের সহিত ভগবানের যতখানি সম্বন্ধ, তিনি ততখানি আমার ঘনিষ্ঠ। "আমার" বলিয়া ভালবাসার সামগ্রীকে যদি পুরো অধিকার করিতে না পাইলাম, তবে তৃপ্তি পাইব কেন? বেদান্তের অবাঙ্মনসগোচর নিরুপাধিক ব্রহ্ম আমার অধিকারের বাহিরের বস্তু, তিনি অশব্দ অস্পর্শ, জীবের অন্তঃকরণের কোন বৃত্তিই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, সুতরাং তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা জন্মিবে কেন? অন্তঃকরণ ধ্বংস হইলে যাঁহার উদয় হয়, তিনি ত আমার হৃদয়বিহারী দেবতা নহেন। সমস্ত সাধ জ্বলিয়া গেলে—সমস্ত বাসনা আসক্তি পুড়িয়া গেলে যাঁহার অগ্নিশিখা উদ্গীরিত হয়, তিনি ত আমার মনঃপ্রাণসুশীতলকারী সাধের ঠাকুর নহেন। যিনি নির্গুণ, দয়া মায়া আদি কোন গুণই যাঁহাতে নাই, সমাধিনিষ্ঠ পুরুষের তিনি দেবতা হইতে পারেন, কিন্তু তিনিত দুঃখীর দেবতা নহেন, অনাথের বন্ধু নহেন, সুতরাং তাঁহাকে আমার প্রয়োজন কি? আমার কাতর ক্রন্দন—আমার মরমের আর্ত্তগাথা যাঁহার দরবারে পৌঁছিতে পারে, দুঃখে শোকে যন্ত্রণায় পীড়িত হইয়া বাষ্পগদ্গদ-লোচনে যাঁহার দিকে তাকাইলে যিনি দুর্গতিহরা না হইয়া দৌড়িয়া আসেন, আমি তাঁহাকে চাই। আমার ক্ষুদ্র প্রকৃতি যাঁহাকে "নিজস্ব" বলিয়া অধিকার করিতে পারে, আমি তাঁহাকে চাই। যিনি আমার ক্ষুধায় মা অন্নপূর্ণা, রোগে বাবা বৈদ্যনাথ, কামনায় যিনি কল্পতরু, আমি তাঁহাকে চাই।

জীব স্বরূপতঃ মৌলিকাবস্থাপন্ন ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না। ঈশ্বরের স্বরূপ তেজ ক্ষুদ্র জীব কি সহ্য করিতে পারে? স্বরূপতঃ অগ্নিকে আমরা স্পর্শ করিতে পারি না, কিন্তু সেই অগ্নি যখন দেশলাইয়ের বাক্সে সুষুপ্তাবস্থায়—আবৃতাবস্থায় থাকে, তখন তাহাকে পকেটে রাখিতে পারি। ব্রহ্মের যাহা নিরুপাধিক অনবগুণ্ঠিত অনাবৃত স্বরূপ, আমাদের হৃদয় তাহা স্পর্শ করিতে পারে না, কিন্তু সেই ব্রহ্ম উপাধ্যবচ্ছিন্ন হইয়া—সমষ্টি মায়া শক্তির আবরণে আবৃত হইয়া—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদিরূপে পরিণত হইয়া যখন আবির্ভূত হন, তখনই আমাদের অন্তঃকরণ তাঁহাকে ধারণা করিতে পারে। অনন্ত ব্রহ্মকে শান্ত করিয়া—অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মকে পরিচ্ছিন্ন করিয়া—ব্যাপক ব্রহ্মকে কাটিয়া ছাঁটিয়া নিজোপযোগী করিয়া লইতে হইবে। আমেরিকা হইতে আনীত আশিগজের থান কাপড়কে কাটিয়া ছাঁটিয়া যেমন নিজ নিজ প্রয়োজনানুসারে জামা, পরিধেয় বস্ত্র, উষ্ণীষ আদি প্রস্তুত হয়, সেইরূপ ব্যাপক ব্রহ্ম কাটিয়া ছাঁটিয়া শিব, শক্তি, গণপতি, বিষ্ণু আদি উপাস্য দেবতাকে নিজ নিজ হৃদয়ের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। আস্ত একটা পেয়ারা ফলকে খাইতে হইলে তাহাকে যেমন টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া খাইতে হয়, আস্ত পেয়ারাটা একবারে কোঁৎ করিয়া যেমন গিলিতে পারা যায় না, সেইরূপ একবারেই অখণ্ড ব্রহ্মকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারা যায় না, তাঁহাকে খণ্ডিত করিয়া লইতে হয়, টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া লইতে হয়। এই খণ্ডিত ব্রহ্ম অখণ্ড ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ নহেন। খণ্ড আকাশ অখণ্ড আকাশ হইতে কি ভিন্ন পদার্থ? তোমার বৈঠকখানা যতটুকু আকাশ ঘিরিয়া রহিয়াছে,

সেই বৈঠকখানাবচ্ছিন্ন খণ্ড আকাশ কি মহাকাশ হইতে পৃথক বস্তু? বৈঠকখানা ভাঙ্গিয়া গেলে সে খণ্ড আকাশ মহাকাশই হইয়া যায়। সুতরাং স্বরূপতঃ খণ্ড আকাশ ও মহাকাশে কিছু-মাত্র ভেদ নাই। ভেদ কেবল উপাধি লইয়া—বৈঠকখানা লইয়া। বৈঠকখানার আবরণটা বাদ দিয়া ধরিলে আকাশের স্বরূপগত কোন পার্থক্যই লক্ষিত হয় না। সেইরূপ খণ্ডব্রহ্ম ও অখণ্ডব্রহ্ম স্বরূপত একই পদার্থ। মৌলিক ব্রহ্ম ও শিব শক্ত্যাকরে পরিণত ব্রহ্ম একই পদার্থ। কেবল মূর্ত্তিভেদরূপ উপাধিভেদে (আবরণভেদে) বিভিন্ন বিভিন্ন দেখায় মাত্র। বস্তুতঃ বিভিন্ন বিভিন্ন মূর্ত্তি জন্য ব্রহ্মের স্বরূপের ভেদ হয় না। বৈঠকখানা, দরদালান, শয়ন-মন্দির আদি আবরণভেদে আকাশের স্বরূপগত কোনরূপ ভেদ কি লক্ষিত হয়? বৈঠক-খানার আকাশ নীল, দরদালানের আকাশ সাদা, শয়নমন্দিরের আকাশ কাল এইরূপ ভেদজনক কোনরূপ তারতম্যচিহ্ন কি উক্ত খণ্ড আকাশে লক্ষিত হয়? সুতরাং উপাধির ভেদ হইলেও উপহিতের ভেদ হয় না। তেত্রিশ কোটি দেবতার মূর্ত্তি বিভিন্ন হইলেও তদবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম ভিন্ন ভিন্ন নহেন। সুতরাং অখণ্ড ব্রহ্ম হইতে খণ্ডিত ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থ নহেন। মৌলিকাবস্থাপন্ন অগ্নি হইতে দেশলাইরূপ উপাধ্যবচ্ছিন্ন অগ্নি ভিন্ন পদার্থ নহে। মৌলিকাবস্থাপন্ন অগ্নির যে তেজ, যে প্রকাশ-শক্তি দেশলাই-য়ের অগ্নিতেও সেই তেজ সেই প্রকাশ-শক্তি পাওয়া যায়। অখণ্ড ব্রহ্মে যে তেজ, যে প্রকাশ-শক্তি, খণ্ড ব্রহ্মেও তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি নাই। বরং সুবিধা এই, জ্বলন্ত অগ্নিকে আমরা পকেটে রাখিতে পারি না, তাই তাহাকে দেশলাই করিয়া

নিজের ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইয়াছি। জ্বলন্ত ব্রহ্মকে আমরা ছুঁইতে পারি না, তাই উপাসনার সুবিধার জন্য সে তীব্র তেজোময়ী প্রবাহধারাকে উপাধির আবরণে শান্ত করিয়া নিজ কার্য্যোপযোগী করিয়া লইয়াছি। সাধক নিজ নিজ সাধের মত তাঁহাকে নিজ নিজ ইষ্ট-দেবতা করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং খণ্ড ব্রহ্মের পূজা করিলে অখণ্ড ব্রহ্মেরই পূজা করা হয়। কেননা খণ্ড ও অখণ্ড ব্রহ্ম অভিন্ন পদার্থ। অখণ্ড ব্রহ্মের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপাসনা হইতেই পারে না। অখণ্ড ব্রহ্মকে যখন আমি বুঝিব, তখন ত "আমি" থাকিব না, মরিয়া যাইব, সুতরাং উপাসনা করিবে কে?

জগতের কোন প্রিয়তম পদার্থকে যেমন ভাল বাসি, সেই-রূপ ভগবান্‌কেও ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়। সাংসারিক ভাল-বাসার আদর্শে আমরা তাঁহাকে ভাল বাসিতে চাই। সংসারে যে ভাবে প্রেমকে ব্যবহার করিতে শিখিয়াছি, সেই ভাবে তাঁহার সম্বন্ধেও প্রেমের প্রয়োগ করিতে চাই। আমরা যে ভাবে অভ্যস্ত, সেই ভাবই সম্বল করিয়া তাঁহার রাজ্যে যাইতে চাই। সংসারেই আমাদের ভালবাসার ভিত্তিভূমি রচিত হইয়াছে। মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু, স্ত্রী পুত্র ইহাদিগকেই আমরা ভাল বাসিতে শিখিয়াছি। ইহাদিগকে লইয়াই আমাদের ভালবাসার আদর্শ গঠিত হইয়াছে। সুতরাং মাতৃত্ব, পিতৃত্ব, বন্ধুত্ব আদি সম্বন্ধই আমাদের ভালবাসার অবলম্বন। মাতা, ভাই, ভগিনী, বন্ধু ছাড়া ভালবাসা চরিতার্থ করিবার আশ্রয় আর আমরা জানি না। এই সম্বন্ধ ছাড়া আর কোনরূপে আমাদের ভালবাসা অভ্যস্ত হয় নাই। বন্ধুকে ভাল বাসি বন্ধুত্ব

সম্বন্ধের ভিতর দিয়া, স্ত্রীকে ভাল বাসি স্ত্রীত্ব সম্বন্ধের ভিতর দিয়া। বন্ধুত্ব স্ত্রীত্বাদিসম্বন্ধ-বর্জ্জিত হইয়া কেমন করিয়া ভাল বাসিতে হয়, তাহা আমরা জানি না। যিনি জগতের অতীত, তাঁহাকে জগৎ ছাড়া সম্বন্ধের দ্বার দিয়া কেমন করিয়া ভাল বাসিতে হয় তাহা জানি না। তাই পরিচিত চিরাভ্যস্ত সম্বন্ধ লইয়াই ভগবান্‌কে ভাল বাসিতে চাই। তাঁহার সহিত মাতা, পিতা, সখা, প্রভু আদি সম্পর্ক পাতাইতে চাই।

তাঁহার সহিত কোন্ সম্পর্ক পাতাইব? তাঁহার সহিত আমাদের সর্ব্ববাদিসম্মত কোন্ সম্পর্ক হইতে পারে? তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব সম্বন্ধই কি ঠিক? তাহাই বা কেমন করিয়া হইতে পারে। যে জীবনে বন্ধুভাব কখনও অনুভব করে নাই, তাহার পক্ষে তিনি বন্ধু কেমন করিয়া? বন্ধু কি জিনিষ তাহা সে বুঝিল না, বন্ধুত্বের মর্ম্ম কি তাহা অনুভব করিবার অবকাশ জীবনে যাহার হইল না, বন্ধুত্বের দ্বার দিয়া সে কেমন করিয়া ভগবান্‌কে ভালবাসিতে পারে? যে নিতান্ত শিশু, ভগবান্‌কে ভালবাসিবার তাহারও অধিকার আছে। শিশু সৌহার্দ্দের আস্বাদ বুঝিতে না বুঝিতেই জীবনলীলা সম্বরণ করিল, তাহার সেই ক্ষুদ্র জীবন গণ্ডীর ভিতরে বন্ধুভাবে ভগবান্‌কে ভালবাসা অসম্ভব। তাহার যে বৃত্তি ফুটিতেই পাইল না, সেই অপ্রস্ফুটিত বৃত্তির সাহচর্য্যে কোন কার্য্য করা তাহার পক্ষে আকাশকুসুম। তবে কি তাঁহার সহিত পিতৃত্ব সম্পর্কই সর্ব্বসম্মত? তাহাই বা কেমন করিয়া হইতে পারে? শিশু মাতৃগর্ভে যখন বাস করিতেছে, সেই অবস্থাতেই তাহার পিতার মৃত্যু হইল, শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতার যত্নেই লালিত পালিত হইতে লাগিল,

পিতা কি তাহা সে বুঝিল না, পিতৃত্বের মর্ম্ম কি, তাহাতে সে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইল, এই পিতৃত্বরসানভিজ্ঞ পুরুষ পিতৃরূপে ভগবান্‌কে ভালবাসিতে পারে কেমন করিয়া ? যে কখনও দাস হইয়া প্রভু ভাবের মর্ম্ম অবগত হয় নাই, সে প্রভুরূপে তাঁহাকে ভালবাসিতে পারে কেমন করিয়া ? সুতরাং ভগবানের সহিত পিতা, সখা, প্রভু, আদি সম্পর্ক সর্ব্বজনসম্মত বলিয়া স্থিরীকৃত হইতে পারে না। যে সম্পর্ক জন্মিতে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, শিক্ষার প্রয়োজন, সে ত কৃত্রিম, যাহা কৃত্রিম, যাহা মনুষ্য-রচনার ময়লামাটি-মাখা, তাহা কি মূল প্রকৃতির সন্নিধি স্পর্শ করিতে পারে ?

ভগবানের সহিত আমাদের মাতৃসম্পর্কই অকৃত্রিম। মাতাই জগতে আমাদের সর্ব্বপ্রথমে ভালবাসার অবলম্বন। জগতের কাহারই সহিত যখন আমাদের পরিচয় হয় নাই, তেমন অবস্থায় কেবলমাত্র মাকেই "আপনার" বলিয়া বুঝিয়াছি। জগতের শিক্ষা দীক্ষা উপদেশ অভিজ্ঞতা আদি জঞ্জাল বিন্দুমাত্র যখন আমাদের হৃদয়কে অধিকার করে নাই, তেমন অবস্থায় প্রকৃতি একমাত্র মাকেই আমাদের অভিভাবক বলিয়া পরিচিত করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং মার সহিত সম্পর্কই আমাদের স্বাভাবিক। প্রকৃতি স্বয়ং ভাল বলিয়া আমাদিগকে যাহা দেন, তাহা যত মধুর, যত উপাদেয়, এমন আর কিছুই নহে। যাহা স্বাভাবিক, তাহাকে বিকশিত করা, সমুন্নত করা, আমাদের পক্ষে যত সহজ, এমন আর কিছুই নহে। মাতৃভাবের পরিপুষ্টি আমাদের পক্ষে যেমন সহজসাধ্য, এমন আর কিছুই নহে। সর্ব্বপ্রথমে সম্পূর্ণ নিঃসহায়াবস্থায় যাঁহার কোলে

লালিত হইয়াছি, সর্ব্বপ্রথমে জীবন-কুসুমের মুকুলাবস্থায় যিনি আমার হৃৎপটে স্নেহ মায়া মমতার মূর্ত্তিমতী দেবতারূপে অঙ্কিত আছেন, সর্ব্বশেষে তাঁহারই কোলে মাথা রাখিয়া চিরদিনের জন্য জুড়াইয়া যাইব এ ভাব যেমন মধুর, যেমন সুন্দর যেমন প্রাকৃতিক, যেমন সহজে আয়ত্ত হইতে পারে, এমন আর কিছুই নহে।

শৈশব-অবস্থায় যে সংস্কার-রেখা হৃৎপটে অঙ্কিত হয়, তাহা মরমে বদ্ধমূল হইয়া যায়, তাহার বজ্রলেখ কিছুতেই মুছিয়া যায় না, তাহার অন্তর হইতেও অন্তরতম প্রদেশে সূক্ষ্ম ভাবে জাগরুক থাকে। কোন সামান্য উদ্বোধক কারণ জুটিলেই সেই সংস্কার সকল প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। আমাদের প্রাণে প্রাণে শৈশবের কোমলতা স্তূপের ভিতর দিয়া মাতার যে স্নেহময়ী সংস্কার-রেখা বজ্রতেজে বসিয়া গিয়াছে, সেই সুষুপ্ত সংস্কার-রেখা ভগবৎপ্রেমশক্তির আকর্ষণে সহজেই উদ্‌বুদ্ধ হইতে পারে। প্রাকৃতিক সূত্রের ভিতর দিয়া যে চেষ্টার প্রবাহ হয়, তাহা জগতে কখনই পরাজিত হয় না। সুতরাং মাতৃভাবই আমাদের সহজসাধ্য সাধনা। মা'র মত অভিভাবক জগতে আর কেহ নাই। আজ পুত্রের জন্ম দিয়া পিতা মরিয়া গেলেও মাতা বাঁচিয়া থাকিলে গর্ভস্থ শিশুর কোন অমঙ্গলই হইতে পারে না। কিন্তু মাতা যদি মরিয়া যান, তাহা হইলে পিতা বন্ধু আদি সহস্র আত্মীয় জীবিত থাকিলেও শিশুর রক্ষা কিছুতেই হইতে পারে না। মার মত আপনার জিনিষ জগতে আর কেহ নাই। গর্ভস্থ শিশুর কল্যাণ কামনায় মা কি না করিয়া থাকেন। শিশুর রোগ শান্তির জন্য ব্রত, নিয়ম,

উপবাসাদির কষ্টকে মাতা পরমাহ্লাদে সহিয়া থাকেন? পিতা পুত্রের জন্য বন্ধু, বন্ধুর জন্য সে কষ্ট কি সহিয়া থাকেন? জগতের কোন বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে মার মত ভালবাসা কি পাওয়া যাইতে পারে? আমি যখন ভূমিষ্ঠ হই নাই, বাহ্যজগতের কোন সম্বন্ধই যখন আমাকে স্পর্শ করে নাই, সেই সর্ব্বপ্রথমে মাতৃশক্তি আমার অন্তর্নিবিষ্ট। আজ গর্ভস্থ শিশুর কোন ব্যাধি হইলে মা যদি ঔষধ খান, তাহা হইলে তাহাতেই শিশুর রোগ সারিয়া যায়, কেননা মাতৃশক্তি শিশুতে সঞ্চারিত হয়। মার সহিত শিশুর এমনই অভেদাত্মক ভালবাসার সম্বন্ধ। জগতের অন্য কোন সম্পর্ক কি এতটা অভেদাত্মক ভালবাসা আনিতে পারে? পিতা ঔষধ খাইলে কি গর্ভস্থ শিশুর কখনও রোগ আরাম হয়? বন্ধুর হইয়া বন্ধু ঔষধ খাইলে কি রোগ বিদূরিত হয়? সুতরাং জগতের সর্ব্বপ্রথমে যিনি আমাকে চূড়ান্ত ভালবাসিয়াছেন ও ভালবাসিতে শিখাইয়াছেন, সেই ভালবাসার কেন্দ্রস্থলকে ছাড়িয়া আমার প্রীতিশক্তি আর কাহার কাছে গিয়া চরিতার্থ হইতে পারে? যিনি জগতের সর্ব্বপ্রথমে আমাকে কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছেন, জগতের লোক ঘৃণাপূর্ব্বক একটা রক্তমাংসময় পিণ্ড বলিয়া আমাকে স্পর্শ পর্য্যন্ত না করিলেও যিনি আমাকে সে দুর্দ্দিনে বুকে করিয়া রক্ষা করিয়াছেন, সেই স্নেহকল্পলতিকাকে ভালবাসার আদর্শ করিয়া তাঁহার চরণতলে যদি প্রীতিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ না করিলাম, তবে করিলাম কি? জগতের কোন সাহায্য যখন আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তেমন অবস্থায় শত দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া যিনি আমাকে উদরে ধারণ করিয়াছেন,

খাইতে, শুইতে, বসিতে, পাছে আমার কোন অমঙ্গল হয় এই-রূপ দুশ্চিন্তায় অবিরত যিনি জ্বলিয়াছেন, ভোজনের সময় হয় ত আমাকে কোলে করিয়া খাইতে বসিয়া আমার বিষ্ঠাত্যাগ জন্য অর্দ্ধভুক্ত অন্ন পরিত্যাগ করিয়া যিনি আমায় লইয়া বিব্রত হইয়াছেন, সেই স্নেহ মায়ার নির্ঝরিণীকে ভালবাসার পূর্ণ প্রতি-কৃতি না ভাবিয়া আর কাহাকে ভাবিব? মার বিচিত্র ভাল-বাসার কথা মনে হইলে ত্রিভুবনের সমস্ত ভালবাসা পুঞ্জীকৃত করিয়া তুলাদণ্ডে পরিমাণ করিলে মাতৃস্নেহের এক কণিকাও গুরুভার হইয়া উঠে। যে মাতৃভাব আমাদের অস্তিত্বের আদি হইতে আমাদের মনঃপ্রাণ অন্তরাত্মায় ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত, ভাব স্বরূপ ভগবান্‌কে পাইবার জন্য সেই ভাবই আমাদের সহজসাধ্য সাধনা। কেননা উহাই প্রাকৃতিক পন্থা।

শাস্ত্রেও দেখিতে পাই, পিতা অপেক্ষা মার সম্মানই অধিক। গার্হস্থ্যাশ্রমপরিত্যাগী সন্ন্যাসী পুত্র মার চরণে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইবেন। মাতা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। কিন্তু সন্ন্যাসী পুত্র পিতাকে প্রণাম করিতে পারেন না। পিতাই তাদৃশ পুত্রকে অগ্রে প্রণাম করিতে বাধ্য। তৎপরে পুত্র "নমো নারায়ণায়" বলিয়া তাঁহার আশ্রমপ্রচলিত নিয়মানুসারে যেমন সর্ব্বসাধারণকে প্রণাম করিয়া থাকেন, সেইরূপ পিতাকেও প্রণাম করিবেন। শ্রুতি বলিয়াছেন, "মাতা পিতুরপি গৌরবেণ সহস্রেণাতিরিচ্যতে" সুতরাং শাস্ত্রও মাতাকে সর্ব্বোচ্চ অধিকার দান করিয়াছেন। মা পিতা অপেক্ষাও বড়। শিশু সর্ব্বাগ্রে "মা" "মা" বলিতে শিখে, পরে বাবা আদি অন্যান্য শব্দ উচ্চারণ করে। প্রাকৃতিক নিয়মকৌশলে শিশুর

"মা" বলিবার বৃত্তি সর্ব্বাগ্রে ফুটিয়া উঠে। সুতরাং প্রকৃতিও মাকে বড় করিয়াছেন। স্নেহ, ভক্তি, ভালবাসার ক্ষীরভাণ্ড মথিত করিয়া নবনীত স্বরূপ মা এই কথাটী উৎপন্ন হইয়াছে। যে ভাষায় "মা" নাই, সে ত পশুর ভাষা। যে পরিবারে মা বলিয়া আব্দার নাই, সে ত মরুভূমি। যে হৃদয়ে মা বলিতে উচ্ছ্বাসের অমিয় ধারা বহিয়া না যায়, সে ত প্রেতভূমি। এ প্রৌঢ়বয়সে মার ভালবাসার কথা মনে হইলে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। মনে হয়, আবার শিশু হইয়া মার কোলে তেম্নি করিয়া নাচিয়া কুঁদিয়া বেড়াই। ক্ষুধার সময় তেম্নি করিয়া মার অঞ্চল ধরিয়া আব্দার করি। সারাটি দিন খেলা ধুলা করিয়া আসিয়া পরিশ্রান্ত কলেবরে মার মিষ্ট কথা শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া যাই। হায়! কেন মার কোল-ছাড়া হইলাম। মার অঞ্চল যে দিন হইতে ছাড়িয়াছি, সেই দিন হইতেই ত জগতের জালা যন্ত্রণাময় স্তূপে ডুবিয়াছি। যে দিন হইতে মার সাহায্য ছাড়িয়া জগতের সাহায্য লইতে শিখিয়াছি, সেই দিন হইতেই সংসারের বজ্রনিস্পেশনে নিষ্পিষ্ট হইয়া যাইতেছি। প্রকৃতির পবিত্র গর্ভ উদ্ভিন্ন করিয়া যে ফুল ফুটিয়া উঠে, তাহার সৌগন্ধে ভুবন ভরিয়া যায়, তাহার মাধুরীতে জগৎ পুলকিত হইয়া যায়। তাই জগৎ মাতৃস্নেহের জন্য পাগল। রোগের নিদারুণ যন্ত্রণায় যখন ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকি, তখন স্ত্রী ভাল লাগে না, পুত্র, দৌহিত্র, ভাল লাগে না, বন্ধু বান্ধব কাহারও সেবায় শান্তি পাই না, তখন মা আসিয়া পাশে বসিয়া একবার যদি গায়ে হাত বুলাইয়া দেন, অন্ততঃ মুহূর্ত্তের জন্য মনঃ প্রাণ সুস্থির হইয়া উঠে। মা যে আমার প্রকৃতি প্রদত্ত বন্ধু, আর স্ত্রী